সী রা তু ন্ন বী সাঃ '০৪ হিজরী ১৪২৫

সাহিত্য সংস্কৃতি

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ২০০৪

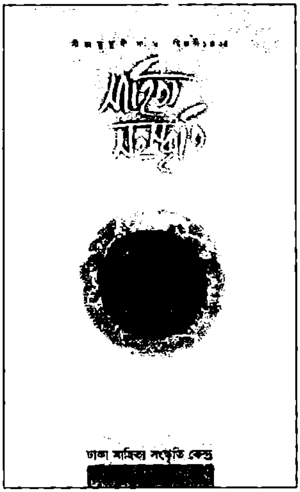

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ২০০৪

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

প্রকাশকাল
রবিউসসানী ১৪২৫
জৈষ্ঠ্য ১৪১১
জুন ২০০৪

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশনায়
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১ বড় মগবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সদস্য
আসাদ বিন হাফিজ
হাসান আলীম
নাসির হেলাল
মহিউদ্দিন আকবর
শরীফ আবদুল গোফরান
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
আলতাফ হোসাইন রানা

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিচালনা পরিষদ ২০০৪

উপদেষ্টা	:	ডাঃ রিদওয়ান উল্লাহ্ শাহিদী
সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ্ আলম নূর
প্রচার সম্পাদক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
দাওয়া সম্পাদক	:	আবদুর রহীম খান
অফিস ও পাঠাগার	:	মোঃ বিল্লাল হোসেন

জোনাল দায়িত্বশীল

জোন-এক :

সভাপতি	:	হাসান আবদুল কাইয়ূম সেলিম
সেক্রেটারী	:	নাসির হেলাল

জোন-দুই :

সভাপতি	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	মোঃ আবেদুর রহমান

জোন-তিন :

সভাপতি	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী	:	আবদুর রহীম খান

বিভাগীয় সম্পাদক

শিল্পকলা	:	ইব্রাহীম মণ্ডল
সাহিত্য	:	শরীফ আবদুল গোফরান
তথ্য ও যোগাযোগ	:	শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

সীরাতুন্নবী (সা) ২০০৪ উদযাপন কমিটি

আহ্বায়ক : সাইফুল্লাহ মানছুর
সচিব : আসাদ বিন হাফিজ
সদস্য : হাসান আবদুল কাইয়ূম সেলিম
মাহবুবুল হক
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
শাহ আলম নূর
নাসির হেলাল
মোঃ আবেদুর রহমান
আবদুর রহীম খান
মোঃ বিল্লাল হোসেন

বিভাগীয় কমিটি

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

উপদেষ্টা : মোঃ আবেদুর রহমান
আহ্বায়ক : ইব্রাহীম মণ্ডল
সচিব : মুবাশ্বির মজুমদার
যুগ্ম সচিব : মোঃ আবদুর রহীম
সদস্য : হাসান আলীম
শরীফ আবদুল গোফরান
মাহফুজুর রহমান কচি
শাহীন হাসনাত
রফিকুল্লাহ গাজালী
নিজাম সিদ্দিকী
জাকির আবু জাফর
আহসান হাবীব খান

সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনী

আহ্বায়ক : হাসান আবদুল কাইয়ূম সেলিম
সচিব : নাসির হেলাল
সদস্য : মাহবুবুল হক

www.pathagar.com

সদস্য		মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
		ইকবাল কবীর মোহন
		মহিউদ্দিন আকবর
		মোঃ বিল্লাল হোসেন
		নিজাম সিদ্দিকী
		মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
		জাকারিয়া খান সৌরভ

স্মারক বিভাগ

উপদেষ্টা	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
আহ্বায়ক		মোশাররফ হোসেন খান
সচিব		কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
সদস্য		আসাদ বিন হাফিজ
		হাসান আলীম
		নাসির হেলাল
		মহিউদ্দিন আকবর
		শরীফ আবদুল গোফরান
		জাকির আবু জাফর
		আলতাফ হোসাইন রানা
		মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

অর্থ বিভাগ

উপদেষ্টা	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
আহ্বায়ক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সচিব	:	আবদুর রহীম খান
সদস্য	:	আবুল কাশেম
		হাসান আখতার
		ইয়াকুব বিশ্বাস
		তৌহিদুর রহমান
		মশিউর রহমান
		মোঃ আমিনুল ইসলাম
		এইচ এম বরকতুল্লাহ
		মোঃ শহীদুল্লাহ
		আবদুর রব
		এস এম শামীমুল হক

www.pathagar.com

প্রচার বিভাগ

আহ্বায়ক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সচিব	:	শরীফ আবদুল গোফরান
সদস্য	:	সরদার ফরিদ
		ওমর বিশ্বাস
		মুহাম্মদ আল আমিন
		মোঃ মমিনুর রহমান

অভ্যর্থনা ও শৃংখলা

আহ্বায়ক	:	হাসান মুর্তজা
সচিব	:	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সদস্য	:	মহিউদ্দিন আকবর
		হাসান আখতার
		তৌহিদুর রহমান

www.pathagar.com

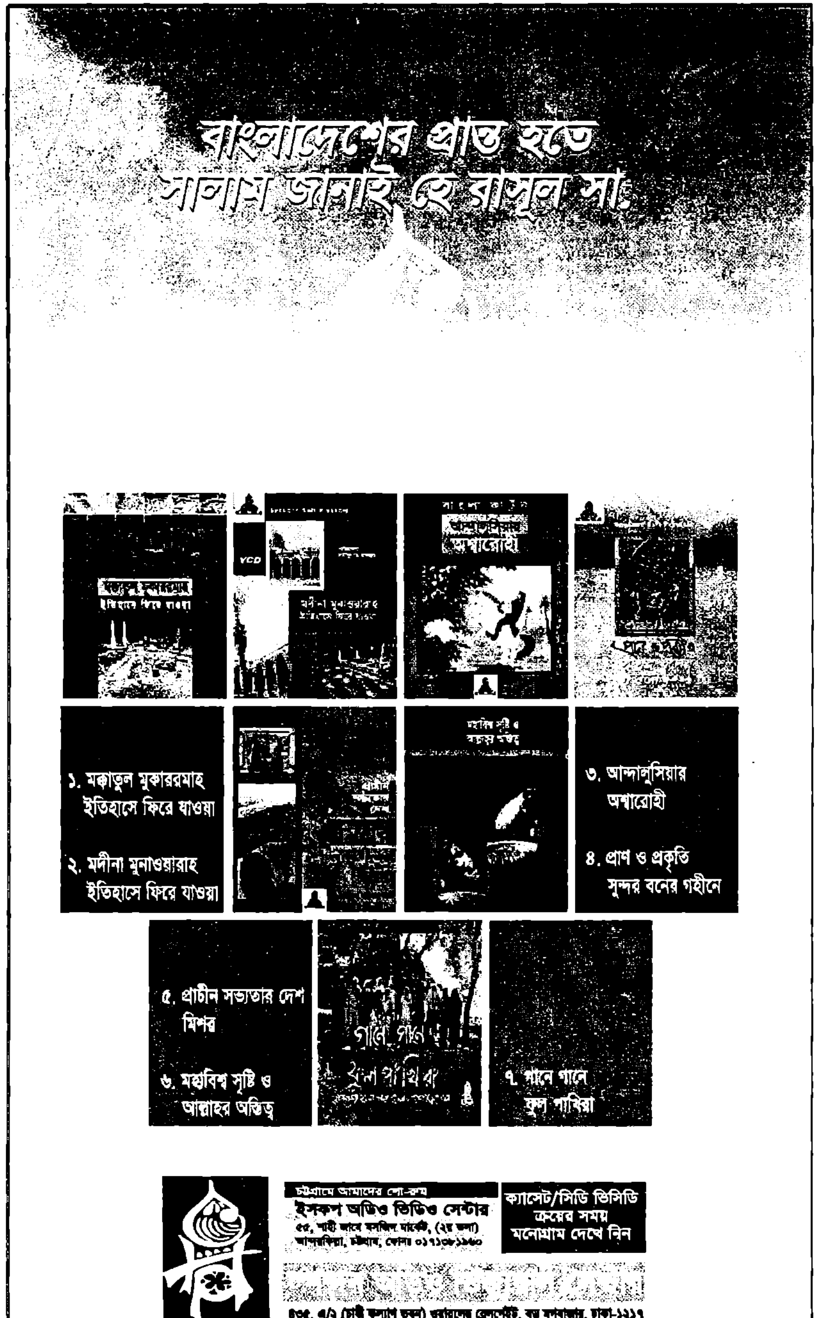

www.pathagar.com

স ম্পা দ কী য়

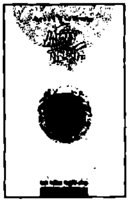

রাসূলের (সা) সাহিত্যপ্রেম

এক.

কবিতা, সর্বকালের জন্য একটি মহোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় হিসাবে সমাদৃত। এর লক্ষ্যাভিসারী কার্যকারিতা ব্যাপক-বিশাল। এজন্য বহুদর্শী রাসূল (সা) নিজে কবি ছিলেন না সন্দেহাতীতভাবে সত্য বটে, কিন্তু তিনি কবিতাকে লালন করেছেন, অগ্রগামী করেছেন, সাহাবীদেরকে (রা) কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং কবিতাকে অস্ত্রের চেয়েও তীক্ষ্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। আর কবিতাকেন্দ্রিক রাসূলের (সা) যে বিশাল পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস– সেতো সীমাহীন।

রাসূল (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। এরপরই শুরু হয়ে গেল তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম। মক্কার কুরাইশ বংশ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার যাদের কানায়-কানায়, সেই গর্বিত গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন নবী (সা)। সুতরাং তাঁর এই দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল পরোক্ষভাবে হলেও, সাহিত্য। কারণ তাদের উপযোগী ভাষা ছাড়া ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো সেখানে সম্ভবপর ছিল না। আরবী ভাষা ও এর স্বচ্ছ ও সুন্দর ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন রাসূল (সা)। ফলে তাঁর জন্য এ কাজ অব্যাহত রাখা সহজতর হলো।

রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য রাব্বুল আলামীনের একান্ত অনুগ্রহমূলক নির্দেশে মক্কার বৈরী পরিবেশ থেকে হিজরত করলেন মদিনায়। রাসূলের (সা) হিজরতের সাথে সাথে মক্কা থেকে মদিনার আকাশ ছুঁয়ে গেল সাহিত্য। রাসূলের (সা) সাথী হয়ে গেল সেটা। ইসলামী দাওয়াত যত সম্প্রসারণ হয়েছে, ইসলামী সাহিত্য ততোই বিস্তার লাভ করেছে। এক সময় মদিনার সীমানা ছাড়িয়ে এটা আছড়ে পড়লো পারস্য ও স্পেনের বন্দরে। এই সময়কালে সাহিত্য প্রতিরোধব্যূহ রচনা করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে এবং অসীম সাহস যুগিয়েছে মুমিনের হৃদয়ে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) মদিনায় অবস্থান করছেন। এ সময়ে তিনি অনুভব করলেন, কবিরাও হতে পারে ইসলামের একনিষ্ঠ দায়ী। তিনি মদিনার কবিদেরকে আহ্বান জানালেন। বললেন তাদের কবি প্রতিভা ইসলামের দাওয়াতী কাজে ব্যবহারের জন্য। রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিলেন সেখানকার প্রথম শ্রেণীর মেধাবী কবিবৃন্দ। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তখনকার নামকরা এবং বিখ্যাত কবি হাসসান ইবন ছাবিত। তারা সমবেতভাবে মক্কার যে সকল কবি রাসূল (সা) ও তাঁর দীন সম্পর্কে কুৎসা রচনা করছিল, তাদের সমুচিত জবাব দিলেন। মক্কার কবিদের বিরুদ্ধে তারা গড়ে তুললেন প্রবল প্রতিরোধ। বিশ্বাসী কবিদের মধ্যে তখন ছিলেন হাসসান ইবন ছাবিত, কবি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কবি কা'ব ইবন মালিক, আলী ইবন আবু তালিব, সুওয়ায়েদ ইবনে আস-সামিত, সারমা ইবন আনাস, আবু সারমা ইবন কায়স, খুবায়ছ ইবন আদী ইবন আবদুল্লাহ, আমর ইবন আল-জামুহ, আল-হুবাব ইবন আল মুনযির, নাবিসা আল-জাদী, আন-নামির ইবন তাওলাব, খানসাসহ অনেকেই। ইসলামের পক্ষে, রাসূলের (সা) নির্দেশ ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিন তারা যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা এক বিরল ইতিহাস।

ইসলাম যখন যেখানেই প্রবেশ করেছে, তার সাথে ইসলামী সাহিত্যও প্রবেশ করেছে। এভাবেই ইসলামী সাহিত্য একদা আন্তর্জাতিকতার আকাশ ছুঁয়েছিল। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ইসলামী সাহিত্যের ধারা ক্রমাগত বেগবান হয়েছিল। এটা কেবলমাত্র রাসূলের (সা) পরিচর্যা ও আনুকূল্যের কারণেই।

দুই.

রাসূলের (সা) প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে এবং প্রেরণায় তাঁর সাহাবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে আবর্তিত ছিলেন। রাসূলের কাছ থেকে তারা পেতেন প্রয়োজনীয় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও দিকনির্দেশনা। মসজিদে নববীতে বসতো কবিতার আসর।

হযরত আবুবকরের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হলো রিদ্দার যুদ্ধ। সশস্ত্র মুজাহিদদের পাশাপাশি এই যুদ্ধে কবিতার অস্ত্র দিয়ে সমানে যুদ্ধ করলেন সত্যাশ্রয়ী সাহসী কবিরা। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর নিজেই ছিলেন একজন সাহিত্য বোদ্ধা এবং কাব্যরসিক। তিনি সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সমালোচকও ছিলেন। সাহিত্য সমালোচনার সর্বত্রই তাঁর প্রজ্ঞা ও বিভার বিচ্ছুরণ ঘটতো। এ ব্যাপারে রাসূলের (সা) কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা)। তাঁর খিলাফাতকালে, কোনো প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জানতে চাইতেন। বসরার শাসনকর্তা আবু মূসা আশআরীকে হযরত উমার নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, 'আপনি আপনার শাসনাধীন এলাকার মানুষকে কবিতা শেখার নির্দেশ দেবেন। কারণ কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।' খলিফা উমার (রা) বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীরন্দাযী শেখাও। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে শুনাও।' কবিতা সম্পর্কে উমার (রা) বলতেন, 'কবিতা আরবদের সবচেয়ে ভালো ও বিশুদ্ধ কথা। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, উত্তেজনা দমিত হয়, কোনো সম্প্রদায় তাদের মজলিশ-মাহফিলে যথাযথ আসন করে নিতে পারে এবং কোনো প্রার্থী কিছু পেতে পারে।' হযরত উমারের (রা) বিবেচনায় 'কবিতা হলো কোনো জাতির এমনই এক জ্ঞানভাণ্ডার যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান নেই।' হযরত উমার (রা) ছিলেন তাঁর সময়কালে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি বলতেন, 'মানুষের উত্তম শিল্প হলো কবিতা।'

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীকে (রা) বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি নিজে কবিতা লিখেছেন। 'দীওয়ানে আলী' গ্রন্থটি আজো তাঁর কবিসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব জানান দিয়ে যায়। রাসূলের (সা) একান্ত সান্নিধ্যে শিক্ষালাভে ধন্য ছিলেন হযরত আলী। রাসূল থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও নির্দেশনায় তিনি বিভিন্নমুখী জ্ঞানে ও যোগ্যতায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে তিনি সাহিত্যের বিপুল বিকাশে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। হযরত আলীর কাছে আজও বিশ্বসাহিত্য ঢের বেশী ঋণী। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের মূল সূত্র উদ্ভাবন করেন এবং আরবী শব্দসমষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি তাঁর সময়কালে একজন বিজ্ঞ সাহিত্য সামলোচক হিসাবেও খ্যাতিমান ছিলেন।

হযরত আলী (রা) বলতেন, কবিতা হলো একটি দাঁড়িপাল্লা। অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেমন জিনিসপত্রের পরিমাপ করা হয়, তেমনি কোনো জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৈতিকতা ও আদর্শের পরিমাপ করা যায় তাদের কবিতার মাধ্যমে।

হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) কাছ থেকেই শিখেছিলেন কিভাবে কবিদেরকে সম্মানিত করতে হয়। তিনি কবিদের যথার্থ মূল্যায়ন করতেন। একবার এক বেদুঈন হযরত আলীর (রা) কাছে এসে সাহায্য চাইলেন। হযরত আলী (রা) তাকে একটি চাদর দান করলেন। লোকটি যাবার সময় হযরত আলীকে (রা)

www.pathagar.com

একটি কবিতা শুনালেন। এবার আলী (রা) তাকে আরও পঞ্চাশটি দিনার দিলেন। বললেন, 'চাদরটি আপনাকে দান করেছি। আর কবিতা শুনানোর জন্য আপনাকে পঞ্চাশটি দিনার সম্মাননা হিসাবে দিলাম। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, তোমরা প্রত্যেক মানুষকে তার যোগ্য আসনে সমাসীন করবে।'

তিন.

উল্লেখের বিশেষ অবকাশ রাখে না বটে, তবুও আমাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই কেবল তুলে ধরা। রাসূল (সা) নিজেই সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন কবিদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদের জন্য। সুতরাং সাহিত্য সেখানে আর শুধু সাহিত্য থাকতে পারে না, বরং সেটা রূপান্তরিত হয়ে যায় একটি বড় ইবাদাতে। জিহাদকে কোনো মুমিনই হালকা চোখে দেখতে পারেন না, অস্বীকার কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই জিহাদের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাতে রাসূলের (সা) সাহাবীরা (রা) সাহিত্যের মাধ্যমে কিভাবে মশগুল ছিলেন এবং কতটা আন্তরিকতা ও মহব্বতে নিজেদের তরবারি ও কলমের হক আদায় করেছেন, বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে অবাক হতে হয়।

অনেকেই এখনো বিভ্রান্তির আবর্তে ঘূর্ণেয়মান। তাদের প্রজ্ঞা এবং প্রত্যয় এখনো টালমাটাল যে, সাহিত্য আবার কেমন করে ইবাদাতের মতো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? তাদের আপাতত এই বিশ্বাসে কোনো দোষ নেই। কারণ, যে ধরনের সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে মলাটবন্দি হচ্ছে এবং যে ধরনের সাহিত্য আজ বিশ্বব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, মূলত এই সাহিত্য ভোগবাদী বা পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কিছু অবদান রাখলেও রাখতে পারে– কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষের জন্য সেই সাহিত্যের অধিকাংশই কোন প্রয়োজনে আসে বলে মনে হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অবশ্য সাহিত্যের ক্ষতটি দগদগ করতে থাকে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী এবং সমাজবিপ্লবী সাহিত্যিক যা লিখবেন, তা যদি হয় ইসলাম ও ইসলামী তাহজিব-তমুদ্দুন-উৎসারিত, তা যদি হয় বৈপ্লবিক ও মানবিক, তা যদি হয় রাসূলের (সা) আদর্শে জারিত, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগামী– তাহলে সেটা কেনইবা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে না? এ ধরনের সাহিত্যের জন্য স্বয়ং রাসূল (সা) যেখানে উৎসাহিত ও প্রেরণার ভূমিকা রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেখানে কেন আজকের আবহাওয়া বিশ্বাসী লেখকের অনুকূলে থাকবে না? বলা প্রয়োজন, থাকাটাই বরং মিল্লাতের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর।

www.pathagar.com

চার.

মানবতাবাদী, তাওহিদী ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগৃতির তামান্নায় স্নাত আজকের লেখকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাসূলের (সা) যুগের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বপ্রান্তর কোথাও যেখানে স্থিতি ও সুস্থিরতা নেই, যেখানে বিশ্বায়নের রঙিন ফ্রেমের অন্তরালে কেবল মানবতা ডুকরে কাঁদে, যেখানে অপ-রাজনীতির ছোবলে গোটা বিশ্বই কম্পমান– বুঝা তো যায়, সেখানে সকল তন্ত্র-মন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এখন কেবল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রই মানবতার এই করুণ মৃত্যু থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামের এই জাগরণ ও জাগৃতির সহায়ক যে কোনো উদ্যোগই ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যার যে যোগ্যতা আছে, তিনি যদি তার সেই যোগ্যতার হক আদায় করেন আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে, তাহলে সেটাই হবে অসামান্য ইবাদাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং রাসূল (সা) এই ধরনের ত্যাগকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। সেই ধারাক্রমে বলা যায়, আজকের বিশ্বাসী লেখকদের কলমের, আত্মিক ও আর্থিক জিহাদ ও কুরবানীও রাসূলের (সা) মঞ্জুরকৃত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষে মহিমান্বিত হবে।

আল্লাহর রাসূল (সা) বিশ্বাসী লেখক-কবিদেরকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও অনুমোদনে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আজকের মুসলিম নেতৃবৃন্দও যদি রাসূলের (সা) সেই সুন্নাত পালনে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসেন, তাহলে হয়তোবা কলম সৈনিকদের মাধ্যমেও ইসলামী বিপ্লব আরও ত্বরান্বিত হতে পারে। কারণ একজন বিশ্বাসী কবি জিহাদের শপথেও উজ্জীবিত। কেননা আল্লাহর কালামই চূড়ান্ত যে, "নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাত প্রদানের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর মারে এবং মরে।"

সঙ্গত কারণে রাসূলের (সা) সাহাবী-কবিগণ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধিত হয়েছিলেন। আজকের দিনেও বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিকদের জন্য সেটাই বাঞ্ছিত মনজিলে মাকছুদ।

পাঁচ.

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র তার দায়িত্ব ও ঐতিহ্য অনুসারে এবারও সীরাতুন্নবীকে (সা) সামনে নিয়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতার ফসল এই সংকলন। আল্লাহর বহু রাসূলপ্রেমী নানাভাবে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেকের ত্যাগ, কুরবানী ও আন্তরিকতা রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আল্লাহ হাফিজ। ◆

www.pathagar.com

সূচীপত্র

চয়ন

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ১৭ ● গোলাম মোস্তফার কবিতা ২০ ● জসীম উদ্‌দীনের কবিতা ২২

অনুবাদ

এক অনন্য রাজনীতির প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সা) ॥ মাওলানা আমীন আহ্‌সান ইসলাহী ॥ তরজমা : মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ২৪

প্রবন্ধ

রাসূল (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য ॥ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৩০ ● মহানবী (সা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও 'আল-কাউসার' ॥ কাজী দীন মুহম্মদ ৩২ ● ইয়াসরিবে হিজরাত ॥ এ.কে.এম. নাজির আহমদ ৪৬ ● মিরাজুন্নবী (সা) ॥ ডঃ এম. শমশের আলী ৫৪

চয়ন

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা ৫৮ ● ফররুখ আহমদের কবিতা ৬০ ● বে-নজীর আহমদের কবিতা ৬২ ● তালিম হোসেনের কবিতা ৬৩ ● আবদুস সাত্তারের কবিতা ৬৪ ● আফজাল চৌধুরীর কবিতা ৬৫

প্রবন্ধ

বাংলা-কাব্যে রাসূল (সা) ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ৬৬ ● মুহাম্মাদ (সা) : এক অনন্য নবী ॥ ডঃ সদরুদ্দিন আহমেদ ৭৪ ● মহানবীর উসওয়াতুন হাসানাহ ॥ আবদুল মান্নান তালিব ৭৯ ● মুহাম্মাদ (সা) : নবী ও বিশ্বনবী ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৮৩

কবিতা

কে. জি মোস্তফা ৮৮ ● সুজাউদ্দিন কায়সার ৮৮ ● হোসেন মাহমুদ ৮৯ ● গাজী রফিক ৯০ ● মাহফুজ পারভেজ ৯১ ● নূর-ই আউয়াল ৯৩ ● আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ৯৩ ● এ. কে. এম সামসুল ইসলাম ৯৪ ● তমসুর হোসেন ৯৪ ● মুর্শিদ-উল-আলম ৯৫ ● মানসুর মুজাম্মিল ৯৫ ● শহীদুল্লাহ আনসারী ৯৬ ● মোহসেনা খাতুন ৯৭ ● শাহীনুর ইসলাম ৯৭ ● পারুল আহমেদ ৯৭ ● এস. এম জাহাঙ্গীর কবির ৯৮ ● আখতারউজ্জামান নূরী ৯৮

প্রবন্ধ

ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি ॥ শাহ্ আবদুল হান্নান ৯৯ ● দু'আ কি, কেন ও কিভাবে ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন ১০৩ ● রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ বা সুন্নাতে রাসূল ॥ আবদুস শহীদ নাসিম ১২৩

www.pathagar.com

ক বি তা

মতিউর রহমান মল্লিক ১২৭ • সোলায়মান আহসান ১২৭ • মহিউদ্দিন আকবর ১২৮ • হারুন ইবনে শাহাদাত ১২৯ • নিজাম সিদ্দিকী ১৩০ • মৃধা আলাউদ্দিন ১৩০ • গোলাম নবী পান্না ১৩১ • নাসিরুদ্দীন তুসী ১৩১ • হেলাল আনওয়ার ১৩২ • কামাল হোসাইন ১৩৩ • ইয়াকুব বিশ্বাস ১৩৪ • মামুন সারওয়ার ১৩৫ • মুহাম্মদ ওমর আল ফারুকী ১৩৫ • মাসউদুল কাদির ১৩৬ • আবদুল্লাহ যুবাইর হীরা ১৩৬ • মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন মৃধা ১৩৭

গ ল্প

মহানবী আসছেন ॥ আতা সরকার ১৩৮

প্র ব ন্ধ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ১৫৪ • মহানবীর (সা) চরিত্র গঠন পদ্ধতি ॥ আবদুল কাদের মোল্লা ১৬২ • বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণে মুসলিম অবদান ॥ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৬৯

ক বি তা

শাহাদাত বুলবুল ১৭৭ • আহমেদ কায়সার ১৭৭ • আসাদ বিন হাফিজ ১৭৮ • আবদুল হালীম খাঁ ১৭৯ • আনোয়ারুল ইসলাম ১৮০ • তমিজ উদ্‌দীন লোদী ১৮১ • গোলাম মোহাম্মদ ১৮১ • কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ১৮২ • আতিক হেলাল ১৮৩ • জাকির আবু জাফর ১৮৪ • ওমর বিশ্বাস ১৮৫ • আল হাফিজ ১৮৬ মনসুর আজিজ ১৮৬ • পথিক মোস্তফা ১৮৭ • খাতুনে জান্নাত কনা ১৮৮ • শাহনাজ পারভীন ১৮৯ • আমিন আল আসাদ ১৯০

গ ল্প

অপূর্ব উপহার ॥ নয়ন রহমান ১৯১ • পড়শি ॥ দিলারা মেসবাহ ১৯৬

স্মৃ তি

মক্কা ও মদিনায় ভিডিওগ্রাফি ॥ সাইফুল্লাহ মানছুর ২০০

অ নু বা দ

তিনটি প্রশ্ন ॥ মার্টিন লিঙস্ ॥ তরজমা : জিয়াউল আহসান ২০৬

প্র ব ন্ধ

বর্তমান সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মহানবীর (সা) আদর্শ ॥ ইকবাল কবীর মোহন ২১২ • আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে মহানবী (সা) ॥ অধ্যাপক তাসনীম আলম ২১৯

ক বি তা

আবদুল মুকীত চৌধুরী ২২৬ • নয়ন আহমেদ ২২৭ • ইব্রাহীম মণ্ডল ২২৮ • মাহফুজুর রহমান কচি ২২৮ • হাশিম মিলন ২৩০ • শফিকুর রহমান রঞ্জু ২৩০ • ফজলুল হক তুহিন ২৩১ • আহমদ বাসির ২৩২ • সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব ২৩৩

www.pathagar.com

• আফসার নিজাম ২৩৩ • রেদওয়ানুল হক ২৩৪ • মোহাম্মদ আবদুর রহীম ২৩৫ • মোহাম্মদ সোলায়মান আকন্দ ২৩৫ • মুহাম্মদ ইসমাঈল ২৩৬ • মাহবুবুল আলম সেলিম ২৩৭ • নাজমুল হুদা মজনু ২৩৭ • মোহাম্মদ মোমেন মিয়া ২৩৮ • শাহিন আল মামুন ২৩৯ • সুলতানা রিজিয়া ২৩৯

গ ল্প

হনন অন্যরকম অতঃপর ॥ হাসান আলীম ২৪০ • নিজের কাজে ভালবাসা ॥ লুৎফুল খবীর ২৪৩

প্র ব ন্ধ

অপসংস্কৃতি রোধে বিশ্বনবী (সা) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ॥ ডঃ আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম ২৪৫ • বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা ॥ মুকুল চৌধুরী ২৫১

গ ল্প

কেরামতী ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ২৬৩

প্র ব ন্ধ

শিশু-কিশোর ও রাসূল (সা) ॥ নাসির হেলাল ২৭১ • মিলাদুন্নবী'র নামে শির্‌কী ও বিদয়াতী ষড়যন্ত্র ॥ মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান ২৮৭

গ ল্প

যত ভালোবাসা রাসূলের জন্য ॥ আলতাফ হোসাইন রানা ২৯৩ • প্রথম বিজয়ী বীর ॥ নাসিমুল বারী ২৯৫

প্র ব ন্ধ

যিনি চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ॥ মোঃ আবেদুর রহমান ২৯৯ • হাদীসে রাসূলে উপমার প্রয়োগ ॥ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ৩০৯ • বদর : ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ ॥ ডঃ আবদুল ওয়াহিদ ৩১৪ • নবী মুহাম্মাদের (সা) ব্যক্তিজীবন ও আমরা ॥ ইবরাহীম বাহারী ৩১৯ • সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ ॥ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ৩২২ • শিশু মুহাম্মাদ ॥ মোহাম্মদ সফিউদ্দিন ৩২৬ • ছোটদের মহানবী (সা) ॥ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার ৩৩০ • আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা) ॥ জাকারিয়া খান সৌরভ ৩৩৪

আ লো ক পা ত

৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৪ ॥ অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ৩৩৭

বা র্ষি ক প্র তি বে দ ন

কেন্দ্রের কার্যক্রম : মে ২০০৩-এপ্রিল ২০০৪ ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩৪৩

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [আবির্ভাব]

নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!
করে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ!
উরজ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান– স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম"।
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফেরদৌসের হাম্মাম্!
টলে কাঁখের কলসে কওসর, ভর, হাতে 'আব্-জম-জম্-জাম্'।
শোন্ দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্"।

২

মস্ তান!
ব্যস্ থাম্!
দেখ্ মশগুল্ আজি শিস্তান্ বোস্তান,
তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্।
বাজে কাহার্‌বা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান্
গুল্‌ফাম!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশিতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতের খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!

ফর্মা – ২

www.pathagar.com

নুরে কুর্শির
পুরে 'তূর'-শির,
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হূরী ফুর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দুরানি তুর্কির!
আজ বেদুইন তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুড়ে' ফেলে' বল্লম্
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্"।

৩

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দীন!"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত'-এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে "ওয়্যা-হোবল্' ইবলিস্ খারেজিন,-
কাঁপে জীন্!
জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘরে দুলে আজ হর ওক্ত্
ঘন উথলে অদূরে 'জম্-জম্' শরবৎ!
পানি কওসর,
মণি জওহর্
আনি' জিব্‌রাইল' আজ্ হরদম দানে গওহর,
টানি' মালিক-উল্-মৌত্' জিঞ্জির- বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লোহর্।
হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
ঊষর আরবে ভিঙ্গা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইস্‌রাফিল'-এর শিঙ্গা!

৪

জঞ্র্ জাল্
কঙ্ কাল
ভেদি,- ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি,- মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার!
বেদী- পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার

www.pathagar.com

ওঙ্কার!

শঙ্খারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা- নন্দে রে সব টুটেচে অহংকার!
মর- মর্মরে
নর- ধর্ম রে
বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর বর্ম রে,
ভর্ দিল্ জান্- পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে!
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ-
"ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয়্ সর্‌ওয়ারে কায়েনাত!"

৫

শর্- ওয়ান
দর্- ওয়ান
আজি বান্দা যে ফের্‌উন শাদ্দাদ্ নমরুদ মারোয়ান;
তাজি বোর্‌রাক্ হাঁকে আস্‌মানে পরওয়ান,-
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান-
'কোর্-আন্'!
"কোন্ যাদুমণি এলি ওরে"- বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই!
দূরে আবদুল্লার রুহ্ কাঁদে, "ওরে আমিনারে গমি নাই-
দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"
"এয়্ ফর্ জন্দ"-
হায় হর্‌দম্
ধায় দাদা মোত্‌লেব্ কাঁদি,'- গায়ে ধুলা কর্দম!
"ভাই কোথা তুই?" বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা দুর্দম!
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হতে জোর-শোর আসে,
ভাসে 'কা'লাম-
"এয় শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম!"

(অগ্নিবীণা)

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফার কবিতা

হযরত মোহাম্মদ

অন্ধ-তিমিরে ঘেরা গম্ভীরা রাত্রি,
বন্ধুর পন্থায় কোন্ দূর-যাত্রী!
অম্বরে হুঙ্কারে ঘন-মেঘ-মন্দ্র,
লুপ্ত গগন-কোলে তারকা ও চন্দ্র!

ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে গর্জিছে সিন্ধু,
পুণ্য ও প্রেম-প্রীতি নাহি একবিন্দু,
অজ্ঞান কুহেলীতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব,
বিম্বিত ধরাধামে দোযখের দৃশ্য!

অন্যায় অবিচারে ধরাবাসী লিপ্ত,
রক্তের লালসায় তনু-মন দীপ্ত,
ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই– হয় না মীমাংসা
মারামারি কাটাকাটি ঈর্ষা-জিঘাংসা।

এই ঘোর দুর্দিনে এলো কে গো বিশ্বে,
উজলিয়া দশদিশি, তরাইতে নিঃস্বে!
মুখে তার প্রেমবাণী, করুণা ও সাম্য,
বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য।

হাতে তার দুর্জয় শক্তির যন্ত্র,
জালিমের ক্ষমা নাই– এই তার মন্ত্র,
ত্যাগ, সেবা, সদাচার, মুখে তার স্ফুর্তি,
মহিমায় আলোকিত সৌম্য সে মূর্তি।
দুর্বলে করে না সে নিপীড়ন হস্তে,
আর্তেরে তুলে দেয়া শুভাশিস্ মস্তে,
ভ্রান্তেরে বলে দেয় মঙ্গল-পন্থা,
রক্ষক, বীর,– নহে ভক্ষক, হন্তা।

www.pathagar.com

ভিক্ষুকে টেনে নেয় আপনার বক্ষে,
ছোট-বড় ভেদ-জ্ঞান নাহি তার চোক্ষে,
মানুষের আত্মারে করে না সে ক্ষুদ্র,
হোক্ না সে বেদুঈন– হোক্ না সে শূদ্র।

আজি ফের দুনিয়ায় আসিয়াছে রাত্রি,
শঙ্কিত-শিহরিত ধর্মের যাত্রী,
অবিচার, ব্যভিচার চলিয়াছে নিত্য,
মিথ্যার গর্জনে কম্পিত চিত্ত!

'তৌহীদ'– বাণী আজি নিভে যায় কণ্ঠে,
শয়তান মৃত্যুর হলাহল বণ্টে,
ডুবে যায় আজি হায় ইসলাম-সূর্য,
থেমে যায় আজি, তার বিক্রম-তূর্য!

বলে দাও ধরা মাঝে কোরানের বাক্য–
চন্দ্র ও সূর্যেরে করো তার সাক্ষ্য–
"মিথ্যারে ভজিও না সত্যেরে ভিন্ন,
শির তাতে রয় রোক, হয় হোক ছিন্ন।"

ঘুচে যাক মানুষের অপমান দৈন্য
মিথ্যার হুঙ্কার, শঙ্কার সৈন্য,
আততায়ী ঘাতকেরা হোক তব শিষ্য,–
পুণ্যের মহিমায় ভরে' যাক বিশ্ব।

[সংক্ষেপিত]

www.pathagar.com

জসীম উদ্‌দীনের কবিতা

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে রাসূল-প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনার সূত্রপাত। কোম্পানী আমলে সূচিত বাংলা সাহিত্যের নব-গতিধারায় তার পরিণতি যাই হোক আমাদের সাহিত্যে নবীপ্রেমের ফল্গুধারায় যতি পড়েনি কখনও। আমাদের লোকসাহিত্যিক বিশেষত পুঁথিকারেরা বিপুল আবেগ সহযোগে জনমনে সঞ্চার করেছেন হুব্বে রাসূলের (সা) অমিয়ধারা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাসূল প্রসঙ্গ কেন অনুপস্থিত এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। এ সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ শিবনারায়ণ রায়ের একটি অভিমত উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্যেটে প্রসঙ্গে এক নিবন্ধে তিনি বলেন, 'এখনও গ্যোয়েটের "মহম্মদ-সঙ্গীত" পড়বার সময় আমার কিছুটা রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর কথা স্মরণে আসে।... এখন অবশ্য জানি রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোয়েটের কাবিতা দুটির ভেতরে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ মহম্মদকে নিয়ে কখনোই এমন কবিতা লিখতে পারতেন না– ইসলামের প্রবর্তকপুরুষকে মহাসমুদ্র অভিসারী নির্ঝররূপে কল্পনা করবার মানসিক প্রস্তুতি তিনি তখন পাবেন কোথা থেকে? [দ্র: "গ্যোয়েটে" (২০০০), পৃষ্ঠা ১১২-১১৩]

মননশীলতার এই দীনতাকে উপেক্ষা করে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম রাসূল প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন বিশাল প্রেক্ষিতে। সৃষ্টি করেছেন এক বেগবান ধারার। বলতে গেলে নজরুল পরবর্তী কোন প্রধান বাঙ্গালি মুসলমান কবির কবিতায় রাসূল প্রসঙ্গের অনুল্লেখ দুর্ভাগ্যজনক বৈ কিছু নয়। বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ প্রতিভা কবি জসীমউদ্দীনের কবিতাতেও প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর প্রসঙ্গের উল্লেখ কেন জানি এতকাল দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। আর তাই বিষয়টিকে সামনে রেখে কবির "মাটির কান্না" কাব্যগ্রন্থের 'তারাবি' শিরোনামের কবিতা থেকে সংশ্লিষ্ট পংক্তিমালা উদ্ধৃত হলো। –আহমদ আখতার

তারাবি নামাজ পড়িতে যাইব মোল্লা বাড়িতে আজ,
মেনাজদ্দীন, কলিমদ্দীন, আয় তোরা করি সাজ।

....

মাহে রমজান আসিয়াছে বাঁকা রোজার চাঁদের ন্যায়,
কাইজা ফেসাদ সব ভুলে যাব আজি তার মহিমায়।
ভুমুরদি কোথা, কাছা ছাল্লাম আম্বিয়া পুঁথি খুলে,
মোর রসূলের কাহিনী তাহার কণ্ঠে উঠুক দুলে।

....

মেরহাজে সেই চলেছেন নবী, জুমজুমে করি স্নান,
অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিরহান।
নহু আলায়হুছালামের টুপী পরেছেন নবী শিরে,
ইবরাহিমের জরির পাগড়ী রহিয়াছে তাহা ঘিরে।

www.pathagar.com

হাতে বাঁধা তার কোরান-তাবিজ জৈতুন হার গলে,
শত রবিশশী একত্র হয়ে উঠিয়াছে যেন জ্বলে।
বুরহাকে চড়ে চলেছেন নবী কণ্ঠে কলেমা পড়ি,
দুগ্ধধবল দূর আকাশের ছায়াপথ-রেখা ধরি।
আদম ছুরাত বামধারে ফেলি চলে নবী দূরপানে,
গ্রহ-তারকার লেখারেখাহীন ছায়া-মায়া আসমানে।

তারপর সেই চৌঠা আকাশ, সেইখানে খাড়া হয়ে,
মোনাজাত করে আখেরী নবীজী দুহাত ঊর্ধ্বে লয়ে।
এই সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে মোল্লা বাড়ির ঘরে,
মহিমায় ঘেরা অতীত দিনেরে টানিয়া আনিব ধরে।

বচন মোল্লা কোথায় আজিকে সরু সুরে পুঁথি পড়ি,
মোর রসূলের ওফাত কাহিনী দিক সে বয়ান করি।
বিমারের ঘোরে অস্থির নবী, তাঁহার বুকের পরে,
আজরাল এসে আসন লভিল জান কবজের তরে।
আধ অচেতন হজরত কহে, এসেছ দোস্ত মোর,
বুঝিলাম আজ মোর জীবনের নিশি হয়ে গেছে ভোর।
একটু খানিক তবুও বিমল করিবারে হবে ভাই!
এ জীবনে কোন ঋণ যদি থাকে শোধ করে তাহা যাই।

* * * *

মাটির ধরায় লুটায় নবীজী, ঘিরিয়া তাহার লাশ,
মদিনার লোক থাপড়িয়া বুক করে সবে হাহুতাশ।
আব্বাগো বলি, কাঁদে মা ফাতিমা লুটায়ে মাটির পরে,
আকাশ ধরণী গলাগলি তার সঙ্গে রোদন করে।
এক ক্রন্দন দেখেছি আমরা বেহেস্ত হতে হায়,
হাওয়া ও আদম নির্বাসিত যে হয়েছিল ধরাছায়;
যিশু-জননীর কাঁদন দেখেছি ভেস্তের পায়া ধরে,
ক্রুশ বিদ্ধ সে ক্ষতবিক্ষত বেটার বেদন স্মরে।
আরেক কাঁদন দেখেছি আমরা নির্বাসী হাজেরার,
জমিনের পরে শেওলা জমেছে অশ্রু ধারায় তার;
সবার কাঁদন একত্রে কেউ পারে যদি মিশাবার,
ফাতিমা মায়ের কাঁদনের সাথে তুলনা মেলে না তার।

www.pathagar.com

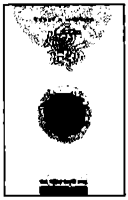

এক অনন্য রাজনীতির প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সা)

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

তরজমা : মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

বিশ্বনবীর মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠানো জীবন ব্যবস্থা যেমন আমাদের ব্যক্তি জীবনের বিধান তেমনি তা সামষ্টিক জীবনের বিধানও। এটা যেমন ইবাদতের পদ্ধতি বাতলে দেয় তেমনি রাজনীতির বিধানও শিখায়। এর সম্পর্ক মসজিদের সাথে যতখানি ঠিক ততখানি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথেও। এই জীবন বিধান মহানবী (সা) একদিকে মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্য দিকে এক বিরাট ভূখণ্ডে তা বাস্তবে কায়েম করেছেন। এ কারণেই বিশ্বনবীর (সা) জীবন আমাদের কাছে আমাদের নৈতিক শিক্ষক ও ব্যক্তি জীবনের সংগঠক হিসেবে যেমন আদর্শ তেমনি বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও যোগ্য প্রশাসক হিসেবেও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এটা সবাই জানেন যে মহানবীর (সা) আবির্ভাবের আগে আরবরা রাজনৈতিক দিক থেকে একটা বিশৃঙ্খল জাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাদেরকে চরিত্রগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক জাতি আখ্যা দিয়েছেন। হতে পারে অনেকে এর সাথে একমত হবেন না, তবে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আরবরা ইসলামের আগে তাদের গোটা ইতিহাসে কখনই ঐক্য ও সংহতির সাথে পরিচিত ছিল না। বরং নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের রাজত্বে গোটা জাতি পরস্পর বিবদমান গোত্রসমূহের সমষ্টিমাত্র ছিল, যাদের পুরো শক্তি ও যোগ্যতা গৃহযুদ্ধ ও নিজেদের মধ্যে লুটতরাজে ব্যয় হয়ে যেত। ঐক্য, সংগঠন, জাতীয়তাবোধ, নির্দেশ ও আনুগত্য প্রভৃতি গুণ যেগুলোর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের মাঝে আদৌ ছিল না। যুগ যুগ ধরে বিশেষ ধরনের যাযাবরের মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই জনগোষ্ঠীর জীবনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যপ্রিয়তা এমন ভিত্ গেড়ে বসেছিল যে, ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির ব্যাপারটা দুঃসাধ্যই হয়ে পড়েছিল। খোদ কুরআনে তাদের ঝগড়াটে জাতি বলা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

"যদি তোমরা এ পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করে ফেলো তবুও তাদের মনকে পরস্পরের সাথে জুড়তে পারবে না।" (আনফাল : ৬৩)

কিন্তু বিশ্বনবী মাত্র তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে নিজের শিক্ষা ও আহ্বানে এ জাতির বিভিন্ন অংশকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করেন যে, গোটা জাতি এক অখণ্ড ইস্পাতপ্রাচীরে পরিণত হয়। তারা শুধু ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিতই হলো না বরং তাদের মধ্যকার শত বছরের সযত্নে লালিত বিরোধ ও সংঘাতের কারণগুলোও একে একে দূর হয়ে গেল। তাদের ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা চিন্তা ও বিশ্বাসের জগতেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। তারা নিজেরাই সংগঠিত হয়নি, গোটা মানবজাতিকে ঐক্য ও সংহতির পয়গাম এনে দেয়, আর তাদের চরিত্রে 'নির্দেশ ও আনুগত্যের' এমন উচ্চ যোগ্যতা বিকশিত হয় যে, আরবের সেই উটচালক জনগোষ্ঠী সারা পৃথিবীর চালক হিসেবে আবির্ভূত হয়। বলা বাহুল্য তারাই পৃথিবীর সকল জাতিকে রাজনীতি ও বিশ্ব-নেতৃত্বের ছবক দিয়েছে।

এই ঐক্য আর মিলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে আদর্শিক ও মানবীয় সংগঠন ছিল। এটা গড়তে গিয়ে বিশ্বনবী (সা) জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, ভৌগোলিক চেতনা ভিত্তিক আঞ্চলিকতাকে কাজে লাগাননি। তিনি না কোন জাতীয় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, না কোন বৈষয়িক লাভের লোভ দেখিয়েছেন, না কোন শত্রুর ভয় দেখিয়েছেন। অতীত দুনিয়ার নামকরা ছোট বড় সব রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ সব সময়েই তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে এসব উপাদান কাজে লাগিয়েছেন। বিশ্বনবীও (সা) যদি এসব কাজে লাগাতেন তাহলে এগুলো নিজ জাতির মেজাজের অনুকূলেই পেতেন। কিন্তু তিনি এসব থেকে কোন ফায়দা নেওয়া দূরে থাক বরং এধরনের সবকিছুকে ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি নিজে এসব ফেতনার মূল উৎপাটিত করেছেন। নিজের জাতিকে তিনি (সা) শুধু আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সার্বিক ন্যায় নীতি, আল্লাহর নির্দেশের অগ্রগণ্যতা ও আখেরাতের ভয়ের অনুভূতি দিয়ে জাগিয়েছেন। এসব উন্নত অনুভূতি ও ধারণা এমনই ছিল যে, নবীর (সা) প্রচেষ্টায় পৃথিবীর জাতি ও গোষ্ঠীর কাতারে আর একটি জাতির সংযোজনই শুধু হয়নি বরং একটি সর্বোৎকৃষ্ট উম্মাতের আবির্ভাব ঘটে যার পরিচয় পবিত্র কুরআন এভাবে দিয়েছে :

"তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি, মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (আলে-ইমরান : ১১০)

বিশ্বনবীর (সা) রাজনীতি ও দূরদর্শিতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যে, দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যদিও তা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির গোটা জীবন পরিবেষ্টন করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিক তার আওতাধীন, তবু তিনি নীতিগত কোন ব্যাপারে আপোসহীনতাকে শত্রুমিত্র কারো ব্যাপারেই প্রশ্রয় দেননি।

তাঁকে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর গোটা জীবন

www.pathagar.com

সাক্ষী, তিনি চাপের মুখে নতি স্বীকার করে নীতির ব্যাপারে আপোসকামিতাকে মেনে নেননি। তাঁর সামনে উপঢৌকন পেশ করা হয়েছে, পার্থিব ও দীনি কল্যাণ বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এর কোন কিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণকালীন সময়ে উচ্চারিত কথাও ছিল পাথরের মত স্থির ও অনড় বাণী। পৃথিবীর চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া দুষ্কর, যিনি অন্তত দু'চারটি নীতি বাস্তবায়নে এতখানি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন যে, তাকে এ ব্যাপারে আপোসহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) একটি গোটা জীবন বিধান পেশ করেছেন, যা আপন বৈশিষ্ট্যের বিচারে তদানীন্তন সমাজের ঝোঁক ও রুচির এতটা বিপরীত ছিল যে, সে কালের হর্তাকর্তারা তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহানবী (সা) এ জীবন বিধানকে সমাজে বাস্তবায়িত করে এটা প্রমাণ করে দেন যে, যারা তাঁকে পাগল ভাবত তারাই আসলে পাগল। তিনি ব্যক্তি স্বার্থে আদর্শ বিসর্জন দেননি– শুধু এটাই নয় বরং ব্যক্তিগত নীতি বিসর্জন দিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করেননি। আদর্শের জন্য তিনি নিজের জান-মাল বিসর্জন দিয়েছেন, সব রকম ক্ষতি স্বীকার করেছেন, কিন্তু নীতির ব্যাপারে কোন আপোস করেননি। বিশ্বনবীর জীবনে এমন কথা বলার সুযোগ কখনও আসেনি যে, আমি তো একটা নির্দিষ্ট আদর্শের দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু এখন কর্মকৌশলের দাবী হচ্ছে, সে আদর্শ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত কিছু গ্রহণ করা।

বিশ্বনবীর রাজনীতি এদিক থেকেও বিশ্বের জন্য আদর্শ যে, তিনি রাজনীতিকে 'ইবাদতের' মত সকল কদর্যতা থেকে পবিত্র রেখেছেন। রাজনীতিতে বৈধ ও প্রশংসনীয় মনে করা হয় এমন অনেক কিছুই ব্যক্তি জীবনে অবৈধ ও নিষিদ্ধ। যদি কেউ ব্যক্তি স্বার্থে মিথ্যা বলে, চালবাজি করে ওয়াদা ভংগ করে, মানুষকে ধোঁকা দেয় অথবা কারো অধিকার হরণ করে তবে আজকের দিনে নীতিবোধের পরিবর্তন সত্ত্বেও তা চরিত্রের দোষ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকের এসব কাজ যোগ্যতা ও দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন ব্যক্তি তার জীবনেও প্রশংসিত হয় আর মৃত্যুর পরেও এসব অবদানের জন্যে জাতির 'হিরো' হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনীতির জন্যে এসব গুণ ও দক্ষতা আরবের জাহিলী যুগেও জরুরী মনে করা হতো। ফলে এসব ব্যাপারে চতুর লোকেরা সহজেই নেতৃত্বের উপরের ধাপে চলে আসত।

কিন্তু বিশ্বনবী (সা) তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দুনিয়াকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, যেমন ব্যক্তি জীবনের মৌলিক নৈতিক গুণ তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এগুলো অপরিহার্য। বরং তিনি একজন সাধারণ মানুষের মিথ্যার তুলনায় একজন কর্তৃত্বশীল বাদশাহর মিথ্যাকে গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করেছেন। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন আমাদের সামনে আছে। এই রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে সেসব চড়াই উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে যা একজন রাজনীতিবিদের জীবনে আশা

www.pathagar.com

করা যায়। বিশ্বনবী একটি দীর্ঘ সময় চরম নির্যাতনের মধ্যে কাটিয়েছেন আর প্রায় ততটা সময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে কাটিয়েছেন। এ সময়ে তাঁকে শত্রুমিত্র উভয়ের সাথে অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি করতে হয়েছে ও শত্রুদের সাথে অনেকগুলো যুদ্ধ করতে হয়েছে। এছাড়া চুক্তিভংগকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে কাজ কারবার, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা, বিভিন্ন বহির্শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ প্রভৃতি সবকিছু তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়েছে। কিন্তু শত্রুমিত্র সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে, তিনি কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি, কোন বক্তব্যের বিকৃত অর্থ করার চেষ্টা করেননি, কোন কথা বলার পর তা অস্বীকার করেননি এবং কোন চুক্তির বিরোধী কোন পদক্ষেপ নেননি। কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায়ও তিনি মিত্রের সাথে ছিলেন, আর খারাপ অবস্থায়ও শত্রুর সাথে ইনসাফ করেছেন।

এখন আপনি যদি পৃথিবীর রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও পরিচালকদেরকে এই মাপকাঠিতে বিবেচনা করেন তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস বিশ্বনবী (সা) ছাড়া আর কাউকে এক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পাবেন না। এর সাথে এটাও বিবেচ্য যে, রাজনীতিতে ইবাদতের মত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা বহাল রেখেও বিশ্বনবীকে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতায় কোন ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এখন এটাকে দক্ষতা অথবা নবী জীবনের কর্মকৌশল যাই বলুন না কেন বলতে পারেন।

বিশ্বনবীর রাজনীতি ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে অনন্যতার একটি দিক এটাও যে, তিনি আরবের মত বিশাল দেশের আনাচে কানাচে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মক্কা বিজয় কালে তিনি কাফের ও মুশরিকদের এমনভাবে পরাভূত করেন যে, চিরতরে তাদের পা ভেংগে যায়। ইহুদীদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরও তিনি সমাপ্তি ঘটানোর এবং রোমানদেরকে দমনের ব্যবস্থা করেন। এতসব কাজ সমাধা করতে রক্তপাত হয়েছে খুবই কম। বিশ্বনবীর পূর্বের ইতিহাস সাক্ষী দেয়– এবং বর্তমানের ঘটনা থেকেও এর প্রমাণ মেলে যে, এ দুনিয়ার এক একটি বিপ্লবে অগণিত হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ধন সম্পদের তো হিসাবই করা কঠিন। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) যে বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন তার প্রসারতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও যারা তার পক্ষে অথবা শত্রু পক্ষে নিহত হয়েছেন তাদের সংখ্যা কয়েক শতের বেশী হবেই না।

এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পৃথিবীর সাধারণ যে কোন বিপ্লবেও হাজার হাজার নারীর শ্লীলতা বিজয়ী সৈনিকদের লালসার শিকার হয়। আজকের সভ্য যুগেও বিজয়ী দেশের সৈন্যরা পরাজিত দেশের সব অলিগলি জারজ বংশধর দিয়ে ছেয়ে ফেলে। সবচেয়ে দুঃখজনক যে, রাজনৈতিক নেতারা এতে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে এটাকে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু বিশ্বনবীর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে এতে কারো মানসম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানার মত এমন

www.pathagar.com

একটা ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সবাই জানেন যে, বাগাড়ম্বরতা রাজনীতিতে একটা অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। যারা একটা অভিশপ্ত শাসন ব্যবস্থার নাগপাশে জনগণকে বাঁধতে সচেষ্ট তারাই নিজেদের ক্ষমতা পাকা-পোখত করতে এবং ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এমনি ধরনের বড় বড় অন্তঃসারশূন্য কথামালার আয়োজন করে এবং এগুলোকে রাজনৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে নেয়। এ জাতীয় ধারণা নিয়ে যখন তারা সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন, মানুষ তাদের পিছু পিছু চলতে শুরু করে। তাদের নামে শ্লোগান হয়, তাদেরকে মানপত্র দেওয়া হয়। তারা যখন আরো উন্নতি করতে থাকেন তখন তাদের জন্য আলাদা বাসভবন, বিশেষ যানবাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় এবং তারা রাস্তায় বের হলে অন্যদের জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এসব শান-শওকাত বাদ দিয়ে একজন রাজনীতিবিদকে যেমন জনগণ কল্পনা করতে পারেনা, তেমনি রাজনীতিবিদ নিজেও এসব অপরিহার্য জিনিস বাদ দিয়ে নিজেকে ভাবতে পারেনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বনবী এসব ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যসব রাজনীতিবিদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। ছাহাবীদের সাথে যখন তিনি চলতেন, তাঁর চেষ্টা থাকত সবার পিছনে চলার। বৈঠকে বসলে সবার সাথে এমন একাকার হয়ে বসতেন যে তাঁকে চেনাই মুশকিল হতো। খাবার সময় দুই হাঁটু একত্র করে বসতেন, আর বলতেন আমি প্রভুর দাস তাই একজন দাস যেভাবে আহার করে আমিও সেভাবে আহার করছি। একবার এক বেদুইন পূর্ব ধারণার কারণে বিশ্বনবীর সামনে এসে হতবাক হয়ে যায়। নবী (সা) তাকে বুঝিয়ে বললেন, অবাক হবার কিছু নেই, আমার মাও শুকনো গোশত খেতেন। অর্থাৎ তুমি হয়তো তোমার মাকে নিজেদের ভবঘুরে জীবনে শুকনো গোশত খেতে দেখে থাকবে, আমিও তেমনি এক মায়ের সন্তান। বিশ্বনবীর কোন খাস যানবাহন, রাজপ্রাসাদ, দেহরক্ষী কিছুই ছিল না। তিনি যে পোশাক পরে দিনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপারাদি সমাধা করতেন রাতে তা নিয়েই ঘুমাতেন।

যাহোক, কোন অবস্থাতেই ভাববার অবকাশ নেই যে, সে যুগে আরবদের ভবঘুরে জীবনে রাজনীতি ততটা আড়ম্বর ও ঠাটবাটের হয়ে উঠেনি, যতটা আজকের দিনে হয়েছে। আসলে রাজনীতি আর রাজনীতিকের ধরন-ধারণ বরাবর এমনই ছিল। কিছু কিছু পার্থক্য মাঝে মধ্যে বাহ্যিক দিকেই হয়েছে মাত্র। একমাত্র বিশ্বনবীই পৃথিবীতে নতুন ধরনের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন যা পার্থিব স্বার্থচিন্তার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি এবং বাহ্যিক ঠাটবাটের পরিবর্তে সহানুভূতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এই সাদামাটা নবীর (সা) কথা ভাবতে গিয়ে সিরিয়া ও রোমের প্রতাপশালী সম্রাটরাও ভয়ে কেঁপে উঠত।

বিশ্বনবীর রাজনীতি ও দূরদর্শিতার উল্লেখযোগ্য আর একটি দিক হচ্ছে, তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি বিপুল সংখ্যক লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করে যান যারা তাঁর এই বিপ্লব সংরক্ষণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর দাবী বাস্তবায়নে পুরোপুরিভাবে

www.pathagar.com

সক্ষম ছিলেন। এ ঐতিহাসিক সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বিশ্বনবীর মৃত্যুর পর এই বিপ্লব আরবের সীমানা পেরিয়ে আশ-পাশের দেশগুলিতেও সম্প্রসারিত হয় এবং দেখতে দেখতে পৃথিবীর তিন তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এই সম্প্রসারণের ফলে নেতৃত্বের জন্য যোগ্য লোকের অভাব হয়নি। আমি যে তিন মহাদেশের কথা বললাম সেখানে কোন বন্য জাতি নয় বরং তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতিই বসবাস করত। কিন্তু আরব থেকে উত্থিত ইসলামী বিপ্লব আগাছার মত এদের মূলোৎপাটন করে ফেলে দেয় এবং তাদের শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটায়। পৃথিবীর সেরা চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের নামের তালিকা পর্যালোচনা করে এমন একজনও পাওয়া যায়নি যিনি বিশ্বনবীর সাহাবীদের মত এত বিপুল সংখ্যক বিপ্লবের প্রকৃত ধারক ও বাহক রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

সবশেষে আমি বলতে চাই, মহানবীর আসল মর্যাদা এটাই তিনি শেষনবী ও গোটা বিশ্বের নবী। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর এই মর্যাদার পার্শ্ব বিষয়মাত্র। যেমন কোন রাজাকে শুধু তৌশীলদার হিসেবে বিবেচনা করা বোকামি। তেমনি বিশ্বনবীকেও শুধু বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর এক মহা দান। এটা আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে দেন, তাঁকে দুনিয়াতে দেবার মত গুণ ও যোগ্যতার সবগুলোই দেন। আর মুহাম্মাদ (সা) তো শুধু নবীই ছিলেন না, বরং শেষ নবী ছিলেন। শুধু রাসূল ছিলেন না, রাসূলদের নেতা ছিলেন এবং শুধু আরবের জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও আহ্বান শুধু যুগবিশেষের জন্য নয়, বরং সকল যুগের জন্য ছিল। এটাও সবাই জানেন যে, তিনি বৈরাগ্যবাদী কোন ধর্মের আহ্বানকারী হিসেবে আসেননি, বরং এমন একটি দীনের আহ্বানকারী ছিলেন, যা মানুষের চিন্তা ও কাজকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সব কল্যাণকে বেষ্টন করে। এতে ইবাদতের সাথে রাজনীতি, প্রশাসনের সাথে অনাড়ম্বরতার সম্পর্ক শুধু ঘটনাক্রমেই নয় বরং এই দীনের স্বাভাবিক দাবীই এটা ছিল। এই যখন অবস্থা, তখন বিশ্বনবীর তুলনায় বড় রাজনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী আর কে হতে পারে? কিন্তু এসব গুণ তাঁর মূল মর্যাদার বিষয় নয় বরং তাঁর গুণাবলীর এক ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। ◆

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা) মর্যাদা লাভ করলেও মানবজীবন থেকে পৃথক হয়ে যাননি। তিনি যথার্থই মানুষের নবী। কেননা মানুষের সঙ্গে বাস করেই মানুষকে তিনি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ মাটি, মানুষ যাতে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে এ দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। সম্মান লাভ করেছেন আবার নানাভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। তবু তাঁর নীতি থেকে তিনি এক তিল বিচ্যুত হননি।

কুরআনুল করীম, হাদীসে কুদসী ও হাদীস শরীফ পাঠে জানা যায়– তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন পথ-নির্দেশকরূপে, কুরআনুল করীম নাযিল করেছিলেন নির্দেশিকারূপে এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন– মানব সমাজকে তাঁর গুণে গুণান্বিত করে তোলার জন্য। আল্লাহর জাতী নাম 'আল্লাহ'। তাঁর কোন উপমা নেই। যার কোন উপমা বা রূপ প্রকাশ করার কোন ভাষা নেই; তাঁকে উপলব্ধি করা ব্যতীত প্রকাশ করার কোন উপায় নেই। তবে তাঁর রয়েছে নিরানব্বই সীফাত বা গুণ। রহমান, রহীম, করীম, সাত্তার, জব্বার, রব, মালিক সে নিরানব্বই নামেরই এক একটা রূপ। এ গুণাবলী থেকেই বিশ্ব চরাচরের বিভিন্ন বিষয়াদির উৎপত্তি। মানব-জীবনের কর্তব্য হচ্ছে এ গুণাবলীকে তাদের জীবনে একীভূত করা। এভাবে মানুষ যখন এসব গুণকে তার জীবনে একীভূত করতে সমর্থ হয়, তখনই তার জীবনে দেখা দেয় প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সে হয় ইনসান-ই-কামিল। সে ইনসান-ই-কামিলদের দ্বারাই এ দুনিয়া শাসিত হবে এবং তখনই এ দুনিয়ায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আল্লাহর রাসূলের (সা) জীবনের প্রচেষ্টা ছিল মানুষকে ইনসান-ই-কামিল করে তোলা। তিনি নিজে ছিলেন ইনসান-ই-কামিল। মানব জাতিকে ইনসান-ই-কামিলের পথ নির্দেশনা এ জন্যই সম্ভব ছিল তাঁর।

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে, মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করতে হবে এবং তার জন্য মানব-জীবন থেকে নানাবিধ পংকিল দিক উৎপাটিত করে তাতে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রক্ত, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি ভেদের ফলে মানবজীবনে যে ভেদের সৃষ্টি হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে তার স্থলে প্রেম, মৈত্রী ও ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা হলেই ক্রমশ সাধনার ফলে তাতে দেখা দেবে আল্লাহর সে গুণাবলী এবং মানুষের এ মাটির দেহে দেখা দেবে ফেরেশতাদের চেয়েও উজ্জ্বল আলো। আজকের দুনিয়াতে মানুষে মানুষে ভেদের ফলে যে সংকীর্ণতা ও নানাবিধ হিংসা-দ্বেষ দেখা দিয়েছে, তার স্থলে দেখা দেবে প্রেম, মৈত্রী ও প্রীতি।

আজকের এ সংঘাত-সংকুল দুনিয়ায় হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর আদর্শ দুনিয়ার মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। একমাত্র তাঁর সে অমোঘ বাণীর দ্বারাই দুনিয়ার মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। ◆

www.pathagar.com

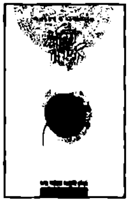

মহানবী (সা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং 'আল কাউসার'

কাজী দীন মুহম্মদ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবৎকালেই তাঁর পুত্রগণ তাইয়্যেব, তাহের, ইবরাহীম, কাসেম ইন্তিকাল করেন। এতে মুশরিক কুরাইশরা উৎফুল্ল হয়ে বলাবলি করতে লাগল যে, মুহাম্মাদ (সা) তো 'আবতার'– অপুত্রক বা লেজকাটা হয়ে গেল। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর বংশ ও তাঁর প্রচারিত ধর্মমত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা যমযম কূপের পানির অধিকারী। আমাদের সন্তান-সন্ততি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যমযমের পানি পান করিয়ে হাজীদের তৃপ্তি ও কল্যাণ সাধন করতে থাকবো। তাঁর তো সে সুযোগ রইলনা।

এসব কথায় মানুষ মুহাম্মাদ (সা)-এর অন্তর ব্যথিত হয়। এ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের তিন আয়াত সম্বলিত সূরাতুল কাউসার নাযিল করেন। এর প্রথম আয়াতে তিনি এরশাদ করেন : ইন্না আ'তায়না কাল কাউসার– আমিতো দিয়েছি তোমাকে কাউসার।

কাউসার অর্থ সকল কিছুর আধিক্য, বিশেষ অর্থে মঙ্গলের প্রাচুর্য। জান্নাতের একটি বিশেষ প্রসবণকেও কাউসার বলা হয়। এতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, তোমার শত্রু পক্ষই প্রকৃত 'আবতার'– হতভাগ্য, লেজকাটা, নামনিশানাহীন। আর যমযমতো দুনিয়ার, আখিরাতে তোমার জন্য রয়েছে। কাউসার অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য উম্মত ও অফুরন্ত প্রাচুর্য। বস্তুত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে আল্লাহর পবিত্র বাণী আল কুরআন, দেওয়া হয়েছে অনেক তত্ত্বজ্ঞান। তাঁকে দান করা হয়েছে 'আস্‌সাবউল মাছানী' বা পুনঃ পুনঃ পঠিত সাত আয়াত সম্বলিত সূরাতুল 'ফাতিহা'। তাকে দেওয়া হয়েছে 'কদর' ও মি'রাজ'। অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে থাকার এবং উম্মতের জন্য সোপারিশ করার। আর তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'কাউসার'। সর্বোপরি তাঁকে করা হয়েছে

www.pathagar.com

রাহমাতুললিল 'আলামীন'। তাঁকে করা হয়েছে বিশ্বের শেষ ও শ্রেষ্ঠনবী। এ সমস্তই তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত, যা এ বিশ্বে আর কারো ভাগ্যে জোটেনি।

মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর চরিত্রে যে সকল গুণের সমন্বয় ঘটেছিল, যে কারণে তাঁকে আল কুরআন, আস্সাবউল মাছানী, কদর, মি'রাজ, কাউসার, কিয়ামতের দিন সোপারিশ করার অনুমতি-এ সকল দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্ব সমাজ সংস্কারে ও বিশ্বের মানুষের কল্যাণ তাঁর যে সকল বিশেষ অবদান রয়েছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোক পাত করার প্রয়াসই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

১. হযরত মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী। তাঁর প্রতি অবতীর্ন গ্রন্থ আল কুরআন ও শেষ ঐশী গ্রন্থ। আগের কোন গ্রন্থই অবিকৃত নেই। তার ভাষা ও বিষয় দুইই কালের করাল গ্রাসে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন যে যে 'কথায়' অবতীর্ণ হয়েছে, হুবহু সে সে 'কথায়' আজো বিদ্যমান রয়েছে। এর কার। শুরু থেকেই এটি বহু লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে পূর্বেকার সকল গ্রন্থের সারাংশ দেওয়া হয়েছে এবং এতে রাজ্য, সমাজ, দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম-সকল বিষয়েরই বিধান রয়েছে। এখানিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং একমাত্র পূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই সমস্ত সৃষ্টির রহস্য ও বিশ্বের ইতিহাস জানা যায়। এরই মাধ্যমে মানবের কল্যাণের জন্য প্রচারিত হয়েছে ইসলামী বিধানসমূহ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ও জিহাদ সম্বন্ধেও আমরা এ গ্রন্থ থেকেই পরিপূর্ণভাবে জানতে পারি। ইহকাল ও পরকাল, দুনিয়া ও আখিরাত, কিয়ামত, শেষ বিচার জান্নাত ও জাহান্নাম-এসব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এ গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি এ শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ ওহী করে তাঁকে অশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। এ তার প্রতি বিশেষ রহমতস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন : তুমিও (হে মুহাম্মাদ) আশা করনি যে, অবতীর্ণ হবে তোমার প্রতি কিতাব। এতো তোমার প্রতি তোমার রবের তরফ থেকে রহমত। সুতরাং তুমি কখনও সহায় হয়োনা কাফিরদের।[১]

মহানবী (সা) অত্যন্ত মর্যাদাশীল, মহান। তার প্রতি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য এবং কাফির ও মুমিনের পার্থক্যকারী বিধান 'আল ফুরকান' নাযিল করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদাও মাহাত্ম্যের অধিকারী করেছেন। বিশ্বের অপর কোন নবী বা রাসূলের সে সৌভাগ্য হয়নি।

আল কুরআন বলে : কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নাযিল করেছেন ফুরকান, যাতে তিনি (বান্দা রাসূল) বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।[২]

আল্লাহ্ তাআলা আরো বললেন : আর আমি তো আপনার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া আর কেউ তা প্রত্যাখান করেনা।[৩]

www.pathagar.com

কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী। আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত। আল কুরআন শাশ্বত। এ বিধান সব কালের, সব দেশের ও সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। একটি মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা Complete Code of Life.

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন : এই সে কিতাব যার (অবতরণ) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এখানি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত কারী।(৪)

তিনি বলেন : তানযিলুম মিররাব্বিল আলামীন– এ (গ্রন্থ) ক্রমে ক্রমে নাযিল করা হয়েছে বিশ্ব জগতের রবের তরফ থেকে।(৫)

এ আল্লাহ্‌র কালাম সবার জন্য হিদায়াত এবং তাতে কোন স্ববিরোধী কথা নেই।

তিনি বলেন : ওয়ালাও কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু ফীহিখতিলাফান কাছিরান– যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে প্রেরিত হতো, তবে তার পূর্বাপর বিষয়াদির মধ্যে অনেক ইখতিলাফ পাওয়া যেত।(৬) কিন্তু তাতে কোন ইখতিলাফ নেই।

এ কুরআন কত শক্তিশালী 'এটমিক এনার্জি' পরিপূরিত তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা বলেই তাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনা। এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নিজেই বলেন : যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন কোন পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে পেতে যে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, আল্লাহর ভয়ে।(৭)

এর শক্তি কত প্রবল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা, সে-ই বহন করতে পারে এমন বোঝা যা একটি পাহাড়ের সাধ্য নেই ধারণ করার। আর মানুষের মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মহানবীই ছিলেন সে শক্তিধর যিনি এ কুরআনের অশেষ ক্ষমতার আগ্নেয়গিরি ধারণ ও বহন করতে পারেন। এ কুরআন যাতা বস্তু নয়। অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বস্তু নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন : এ বড়ই মর্যাদাশীল কুরআন, যা রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে- লাওহে মাহফুজে; যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করেনা।(৮)

এহেন মর্যাদাশীল কুরআন প্রাপ্তি এক অতি বিরল সম্মানের ব্যাপার। আর এটি ঘটেছে, হযরত রাসূলে করীম (সা) এর জীবনে। কাজেই তার মর্যাদা কতখানি সহজেই অনুমেয়।

২. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা) যেমন পেয়েছেন আল কুরআন, তেমনি পেয়েছেন আসসাব'উল মাছানী বা পুনঃ পুনঃ পঠিত সপ্ত আয়াত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন : আমিতো আপনাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় ; আরো দিয়েছি মহা কুরআন।(৯)

'সাব উল মিনাল মাছানী' সূরা ফাতিহার একটি নাম। সূরা ফাতিহা মানে উদঘাটনী সূরা। এ সূরা দিয়ে আল কুরআন শুরু হয়; অর্থাৎ এ সূরাই কুরআনের অগ্রবর্তী সূরা।

www.pathagar.com

তাই এর নাম করণ করা হয়েছে সূরা ফাতেহা। এর সূরার আর এক নাম উম্মুল কুরআন অর্থাৎ কোরআনের জননী। সমস্ত কোরআনে যা আছে, এ সূরায় তার সমান রয়েছে। তাই একে বলা হয় কোরআনের 'মা'। আর সাবউন মিনাল মাছানী মানে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত সাতটি আয়াত। এ সূরা সালাতের প্রতি রাকাতে তেলাওয়াত করা হয়। মুমিন দৈনিক অন্ততঃ বিতরসহ বিশ রাকাতে বিশবার এ সূরা আবৃত্তি করে; এ সূরা না পড়লে সালাত আদায় হয় না।

মক্কার অধিবাসী কুরাইশরা নশ্বর পার্থিব ধনসম্পদের গর্বে আত্মহারা হয়ে বিদ্বেষ বশে হযরত রাসূলে করীমের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করত। তারা গরীব দরিদ্রদের প্রতি কটাক্ষ করে ঠাট্টা করত। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : হে নবী, আমি তোমাকে যে অবিনশ্বর অমূল্য সম্পদ স্বর্গীয় ঐশ্বর্য দান করেছি, তার তুলনায় তাদের পার্থিব অস্থায়ী ধনসম্পদ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমি তোমাকে মহাগ্রন্থ কুরআন এবং এর সার সদৃশ পুনরাবৃত্ত সপ্ত আয়াত বা সূরা ফাতিহা দান করেছি।

তুমি এ স্বর্গীয় মহারত্নে ঐশ্বর্যশালী হয়েছো, কাজেই তাদের তুচ্ছ ধন সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করোনা। বরং তোমার অনুসারীদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার কর। আর অবিশ্বাসীদের বলে দাও যে, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী রূপেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। মহামূল্য আল কুরআন ও গুপ্ত ধন-ভান্ডার সদৃশ সূরা ফাতিহা দান করে রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

৩. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে আল্লাহ্ তাআলা 'লায়লাতুল কদর' বা মহা সম্মানিত রাত্রির ফযিলত দিয়েছেন। তাঁর আগে অন্য কোন নবী বা রাসূলের এমন সৌভাগ্য হয়নি। এ লায়লাতুল কদর সম্বন্ধে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা বলেন: ইন্না আনযালনাহু ফী লায়লাতুল কাদরি, ওয়ামা আদরাকা মা লায়রাতুল কাদরী, লায়লাতুল কাদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর তানাযযালুল মালায়িকাতু ওয়াররূহ ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা'য়িল ফাজর– আমি তো এটি অবতীন করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র বৎসর অপেক্ষা শ্রেয়; সে রাতে ফেরেশতারা ও 'রূহ' অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতি ক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

কদরের রাত খুবই মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত রাত। এ রাতে নাযিল হয়েছে আল কুরআন। একদিন হুজুর (সা) বনি ইসরাইলের এক দরবেশের কথা উল্লেখ করে বললেন : সামাউন নবীর আমলে এ দরবেশ প্রত্যহ দিনে সওম পালন করে রাত্রে সারা রাত ইবাদত করতেন, এভাবে তিনি এক হাযার মাস ধরে আমল করে ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি আশি বছর এরূপ করেছিলেন।

এ ঘটনার কথা শুনে সাহাবীরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন : আমাদের সময়ে

www.pathagar.com

মানুষের আয়ু এত কম যে, অত দীর্ঘ দিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই, কাজেই সেরূপ ইবাদতও করতে পারবনা। হযরত (সা) এ শুনে কিছু চিন্তিত হলেন। এ উপলক্ষে সূরা কদর নাযিল হয়। এতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনাকে কদরের রাতের খবর দিচ্ছি। এ রাতেই কুরআন নাযিল করেছি। এ রাতে রুহুল কুদ্দুস ও অন্যান্য ফেরেশতারা পৃথিবীতে এসে সকাল হওয়া পর্যন্ত সালাম-শান্তি শান্তি বলতে থাকে।

এ রাতে ইবাদত করলে, কুরআনে তিলাওয়াত, নফল সালাত, তসবীহ তাহলীল এসবে মশগুল থাকলে এক রাতেই সামাউনের আমলের কথিত দরবেশের হাজার মাস ইবাদতের চাইতেও অধিক ছওয়াব লাভ হবে। রাব্বুল আলামীন আল্লাহর রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে এটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে প্রতিটি মানুষ এবং প্রত্যেক দেশ বা জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে পরবর্তী বছরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফয়সালা করা হয়, এ ফয়সালা অনুযায়ী ফেরেশতারা কাজ করে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, পবিত্র কুরআন 'শবে কদরে' 'লওহে মাহফুজ' থেকে প্রথম আকাশের 'বায়তুল ইযযত' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয় এবং তথায় শবে বরাতে তার পার্থিব অবতারণার পরিমাণাদি নির্ধারিত হয়। আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : শাহরু রামাদানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআন– রমাদান মাস, এ মাসেই আমি কুরআন নাযিল করেছি।

সূরা দুখানে বলা হয়েছে : আমি একে এক কল্যাণময় রজনীতে নাযিল করেছি।

কুরআন তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। কাজেই যে রাতে এতবড় একটি ঘটনা ঘটল, সেটি নিঃসন্দেহে মুবারক রাত, মহিমান্বিত রাত। আল কুরআনের মত এত বড় মর্যাদাপূর্ণ জীবন বিধান দেওয়া হল, সবউল মাসালী দেওয়া হল, বরকতময় রাতও হযরত মুহাম্মাদ (সা)কেই দেওয়া হয়েছে। আর কাউকে নয়। তাঁর উম্মতের জন্য এ এক মস্ত বড় বরকতের সংবাদ যে, একরাতে হাযার মাস ইবাদতের ছওয়াব হাসিল করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মতের অর্থাৎ আমাদেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এ অতুলনীয় বরকতের জন্যও তাঁর মর্যাদা উন্নীত হয়েছে।

৪. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ইসরা বা বনি ইসরাইলের প্রথমেই বলেছেন : পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে দেখাবার জন্য আমার নিদর্শন; তিনি তো, সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।[১০]

তিনি সূরা নাজমে বলেন : এ তো ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাঁকে শিক্ষা দান করেন, শক্তিশালী, প্রজ্ঞা সম্পন্ন, তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন, তখন তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে, তার পর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটে ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের (সিনার) ব্যবধান রইল অথবা তারও কম! আল্লাহ্ তাঁর বান্দার

www.pathagar.com

(রাসূলের) প্রতি যা ওয়াহী করার তা ওয়াহী করলেন।[১০]

মি'রাজ মানে সিঁড়ি, উর্ধ্বে গমন, আরোহন। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহাম্মাদ (সা) মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দিসে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে সাত আসমান ভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার ঘটনাকে 'মিরাজ' বলে। মহানবী (সা) বলেছেন তারপর আমাকে নিয়ে নিকটতম আসমানের দিকে উঠলেন।

মিরাজ কবে কখন কিভাবে কতবার হয়েছে এতে অনেক মতভেদ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীস মুতাবিক তা একবারই ঘটেছে। মিরাজ নুবুওত প্রাপ্তির পর হিজরতের আগে মক্কায় রাত্রিকালে সংঘটিত হয়। হিজরতের বার মাস, ষোল মাস, সতের মাস কিংবা আঠার মাস আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়।

কেউ বলেন, সেদিন ছিল সতেরই রবিউল আউয়াল, আবার কেউ বলেন, সতেরই রমাদান আবার কারো কারো মতে সেদিনটি ছিল সাতাশে রজব। সাতাশে রজবই বেশীর ভাগ আলিমের গৃহিত মত।

মি'রাজ ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ : হযরত মুহাম্মাদ (সা) শুআবু আবু তালিবে উম্মি হানীর বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। জিবরাইল ও অপর দু'জন ফিরিশতা তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে কাবার প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন।সেখান থেকে বুরাকে আরোহন করে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলো জিবরাইল।

তাঁরা প্রথমে জেরুযালিমের বায়তুল মাকদিসে হাযির হলেন। বুরাক থেকে নেমে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এখান থেকে জিবরাইল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্ব আকাশ পানে চললেন এবং মুর্হূত মধ্যে তারা প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে পৌছলেন। আসমানের দ্বার রক্ষীদের সঙ্গে জিবরাইলের কথাবার্তা হল এবং দরজা খুলে দেওয়া হল। সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সংগে দেখা হয়। তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান।

এভাবে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে যথাক্রমে হযরত ঈসা (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

হযরত ইবরাহীম বায়তুল মামূরে উপবিষ্ট ছিলেন। বায়তুল মামূর মক্কার কাবার ঠিক উপর সপ্তম আসমানে অবস্থিত। এটি আসমানী কাবা। প্রতিদিন সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য এখানে সমবেত হয় এবং যে একবার আসে তার কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার এখানে আসার সুযোগ হয়না।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। তিনি আরো এগিয়ে গেলে কুদরতী কলমের লিখনের আওয়াজ শুনতে পান। আরো এগিয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছেন। সেখানে একটি কুল গাছ রয়েছে, যার ফল আকারে মটকার মত বড়। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এক আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রতিফলন সেখানে হচ্ছিল, যার

www.pathagar.com

ফলে চারদিকে এ জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটছিল। এ সময় হযরত (সা)-এর উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। ফিরে আসার সময় হযরত মূসা (আ) এর সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি হযরত (সা) এর উম্মতের জন্য সালাতের সংখ্যা কমানোর প্রার্থনা জানানোর পরামর্শ দেন। হযরত (সা) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকবার অনুরোধ জানালে আল্লাহ্ তাআলা তা পঞ্চাশ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করেন।

কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী সিদরাতুল মুনতাহার পরে আরো এগিয়ে গেলে কলমের লিখনের আওয়াজ শুনতে পান। আর তখনই সালাত ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হয়। তারপর জিবরাইল (আ) আর তাঁর সঙ্গে গেলেন না; তিনি একাই এগিয়ে গেলেন। সেখানে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিল। তখন রাসূল (সা) কে নূরের রাজ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানে তিনি সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করেন। একটি পর্দার সঙ্গে আর একটি পর্দার কোন মিল ছিলনা।

তারপর আরো ওপরে উঠে আরশের কাছে পৌছলেন। সেখানে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করার তা ওয়াহী করেন। [১০] তিনি এমন কিছু শোনেন ও দেখেন যার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারো কারো মতে সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ জাল্লাজালালুহুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন।

তারপর তিনি বায়তুল মাকদিসে ফিরে আসেন। সেখানে মসজিদে নবী ও রাসূলগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে ইমাম হয়ে সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি এ ইমামতি আসমানে করেছিলেন, কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি আসমান-যাত্রার আগে এ সালাত আদায় করেছিলেন। বস্তুত তিনি এ সালাত, ফিরে এসে বায়তুল মাকদাসে আদায় করেন; তারপর বায়তুল মাকদাস থেকে রাত্রি ও উষার সন্ধিক্ষণে মক্কায় ফিরে আসেন। এ সকল ঘটনাই অত্যন্ত অল্প সময়ে ঘটেছিল।

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, বায়তুল মাকদিসে দুধ ও মধু অথবা দুধ ও মদ অথবা দুধ ও পানি অথবা চারটি বস্তুই তাঁর সামনে আপ্যায়নের জন্য রাখা হয়েছিল। তিনি কেবল দুধ গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে এ ঘটনাও আসমানেই ঘটেছিল। কিন্তু সমর্থিত মত হলো দুই স্থানেই এ আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা) মি'রাজে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় গমন করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, এত অল্প সময়ে বাস্তবে এ ঘটনা ঘটতে পারেনা, সুতরাং স্বপ্ন যোগে আধ্যাত্মিকভাবে তা সংঘটিত হয়। কিন্তু কাফিরদের বার বার অবিশ্বাস সত্ত্বেও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এটি স্বপ্ন যোগে সংঘটিত হয় বলে বলেননি; আসলে তা বাস্তবে সশরীরেই ঘটেছিল। এটিই সর্ববাদী সম্মত মত। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : 'আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি, তা মানবের ভাগ্য পরীক্ষা স্বরূপ'।[১০]

www.pathagar.com

মি'রাজের ঘটনা বাইশ জন সাহাবী ও বার জন সাহাবিয়া রেওয়ায়েত করেছেন। বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় সামান্য এদিক ওদিক থাকলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সবাই একমত। মি'রাজের ঘটনার সত্যতা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং ইজমা দ্বারা এর যর্থাথ্য স্বীকৃত।

যেমন আল কুরআন সাবউল মাছানী বা উম্মুল কুরআন তাঁকে দান করায় তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমতের প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি কদর বা মহিমান্বিত রাত্রি ও মি'রাজও তাঁর প্রতি বিশেষ দয়া প্রীতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। বিশ্বে যত নবী রাসূল এসেছেন, কোথাও কাউকে এরূপ বিশেষ পুরস্কারে বিভুষিত করা হয়নি, যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে তাঁকে বিশেষভাবে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে যে তিনি ভালবেসে সবার উপরে স্থান দেয়ার জন্যই সকলের শেষে পাঠিয়েছেন, এ সমস্তই তার খাস রহমত।

আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলেছেন : ওয়ামা আর সালনাকা ইল্লা রাহমাতুললিল আলামীন– আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। এছাড়া তাঁকে কিয়ামতের দিন বিশেষ সুপারিশ করার অনুমতিও দান করা হবে। এর সঙ্গে আরও একটি বিশেষ অনুগ্রহের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। সেটি হলো : তাঁকে দেওয়া হয় 'আল কাওছার'।

৫. আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা বিশেষ রহমতে তাঁর প্রিয় নবী মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে কতকগুলি রহমত দান করে তাঁকে ধন্য করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'নিয়ামত' হল কাওসার।

নবুওতের প্রথম দিকে মক্কার জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) আপন বংশের লোকদের বানী শোনান এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তখন চার দিকের পরিবেশ তওহীদ বিরোধী। কেউ তাঁর কথায় কান দিতে চায়না। কয়েকজন মাত্র সাহবী নিয়ে নবী (সা) অসহায় বোধ করছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নবী (সা) বিচলিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁকে এ বিরুদ্ধ পরিবেশে পাঠিয়ে একদিকে তখনকার লোকদের পরীক্ষা করছিলেন, আরেক দিকে হযরত (সা)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা করছিলেন।

তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের অবস্থা যখন একান্ত নৈরাশ্যব্যাঞ্জক ও দুশমনদের নানা কটূক্তি যখন তাঁদের কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল তখন সূরা দোহার ৩-৫ সংখ্যক আয়াতে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ সুববানাহু তাআলা বললেন : অবিশ্বাসী দুশমনরা আপনাকে নানা ভাষায় গালি দিচ্ছে। হে রাসূল, আপনি ঘাবড়িয়ে যাবেন না। ওদের সমালোচনায় আপনি ব্যথিত হবেন না। তাঁর রব নাযিল করলেন : আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার ভাগ্য– পরবর্তী সময়তো পূর্ববর্তী সময় থেকে শ্রেয়। আর শীগগীরই অনুগ্রহ দান করবেন আপনার রব আপনাকে; ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বললেন : তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাঠাননি? তারপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তো আপনাকে পেয়েছিলেন পথ সম্বন্ধে অনবহিত; তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি পেয়েছিলেন আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায়, তারপর তিনি অভাব মুক্ত করেছেন।[১২] হে রাসূল আপনি কি এসব ভুলে গেলেন?

অনুরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা নাযিল করলেন সান্ত্বনা বাণী : আমি অপসারণ করেছি আপনার কাছ থেকে যা ছিল আপানার ভাগ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক। আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, দুশমনরা সারাক্ষণ দুর্নাম করে অতীষ্ট করে তুলছে। এতে আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ নেই। আপনার নাম উজ্জ্বল করার ব্যবস্থা আমি করেছি। বর্তমান পরিবেশে আপনার ভাগ্য কঠোর দেখে আপনি পেরেশান হবেন না। এ অবস্থা বেশী দিন থাকবেনা। শীগগীরই আপনার জন্য সুদিন আসবে আর এরা যারা আপনার বিরোধিতা করছে, নানাভাবে হেস্ত নেস্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। তারা অচিরেই তাদের হিংসার ফল দেখতে পাবে।

সে সময় পরিবেশ কিরূপ নৈরাশ্যজনক ছিল তা তৎকালীন ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে। কুরাইশ সরদাররা বলতো : সে তো জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ঘরে হয়ে গেছে। তার তেমন কোন সঙ্গী সাথীও নেই। সেতো মূল কাটা গাছের মতো, শীগগীরই শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে।

মক্কার অন্যতম কাফির সরদার আস ইবন ওয়াইল বলতো : সে তো এক শিকড়কাটা লোক, তার কোন ছেলে সন্তানও নেই; মরে গেলে তার নাম নেবারও কেউ থাকবেনা।

প্রথমে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বড় ছেলে কাসেম ইন্তিকাল করেন। পরে ছোট ছেলে আবদুল্লাহও ইন্তেকাল করেন। তখন হযরত (সা)-এর নিকটতম প্রতিবেশী, অতি নিকটআত্মীয় চাচা আবুলাহাব (সূরা লাহাবে যাকে লানত করা হয়েছে) খুশী হয়ে দৌড়ে গিয়ে এ খবরটাকে একটি সুসংবাদরূপে প্রচার করতে লাগল। বললো : আজ রাতে মুহাম্মাদ নিঃসন্তান হয়ে গেল; তার সকল শিকড়ইতো কাটা হয়ে গেল।

এমন পরিবেশে হযরত (সা)-এর মনের অবস্থা কতটা শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তওহীদের দাওয়াত দেওয়ার ফলে একদিকে তিনি মুশরিক কুরাইশদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। বংশের সেরা সন্তান বলে যিনি কদর পেতে পারতেন, তিনি এখন বংশের কলঙ্ক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অপর দিকে যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক তার দলে ভিড়েছেন, তাঁরাও সমাজচ্যুত হয়ে মার খেতে লাগলেন। তার উপর একে একে সকল পুত্র সন্তানের ইন্তেকালে যখন পাড়া প্রতিবেশী এবং নিকটবর্তী

www.pathagar.com

ও দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন সহানুভূতি ও শোক জ্ঞাপন, দরদ ও সমবেদনা প্রকাশের পরিবর্তে আপন নিকট আত্মীয়রা উৎসব পালন করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর মনের আবস্থা কেমন হয়েছিল, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ভাল জানেন না।

এ সময়, এমন কঠিন মুহূর্তে সূরা 'কাওসার' নাযিল হয়। বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে যিনি সকল সময়ের বন্ধু, সে পরম দয়ালু রব এ সূরার মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

তিনি ওহী পাঠলেন : আমি অবশ্যই দান করেছি তোমাকে কাওসার সুতরাং সালাত আদায় কর তোমার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নির্বংশ (লেজ কাটা)।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আল্লাহর অগণিত দান ও বিরোধীদের প্রতি তাঁর অভিশাপের ঘোষণা এ সূরায় স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছে। এটি আল কুরআনের সবচাইতে ছোট সূরা। এ সূরায় শব্দ মাত্র দশটি। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সুসংবাদ। এমন সুসংবাদ অন্য কোন রাসূল পাননি। এ সাথে এও ঘোষিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মিশনে কামিয়াব হবেন এবং কাওসার পুরস্কার পাবেন। তাঁকে যতই নিপীড়িত করা হোক তিনি শিকড় কাটা বা লেজকাটা অর্থাৎ নির্বংশ নন। যারা বিরোধী তারাই ছিন্নমূল ও লেজকাটা। তাদেরই কোন ওয়াফা নেই। তাদের না আছে কোন বন্ধু, সহায়ক, আর না আছে কোন রক্ষাকারী।

কুরআনুল কারীমের ১০৮ সংখ্যক সূরার প্রথম আয়াতে কাওসার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। কাসর ধাতু থেকে কাওসার শব্দটি গঠিত হয়েছে। কাওসার অর্থ সকল কিছুর প্রাচুর্য বা আধিক্য। বিশেষ অর্থ মঙ্গলের প্রাচুর্য,অনন্ত কল্যাণ, অসংখ্য সম্পদ কিংবা অনুপম সুমিষ্ট সলিল পূর্ণ সরোবর বা জান্নাতের একটি বিশেষ প্রসবণকেও বলা হয়।[১৩]

মুসলিম পণ্ডিতগণ কাওসার এর অর্থ আল খায়রুল কাসীর– প্রচুর কল্যাণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাওসার অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি জান্নাতের একটি নদী।[১৪]

আর এক বর্ণনায় রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন, এটি তাঁর একটি হাওজ বা চৌবাচ্চা যা তাঁকে মি'রাজে দেখান হয়েছে।

আল কুরআনে জান্নাতের দুইটি অর্থ করা হয়েছে :

১. উদ্যান বা বাগান।

২. বেহেশত বা স্বর্গ।

কাওসারেরও এরূপ দুইটি অর্থ করা হয়েছে :

১. প্রভূত কল্যাণ।

২. জান্নাতের বিশেষ পানির ফোয়ারা।

www.pathagar.com

আল কুরআনে জান্নাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সূরা মুরসালাতের ৪১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে : মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রসবণ বহুল স্থানে। সূরা গাশিয়ার ১২ সংখ্যক আয়াতে রয়েছে : সেথায় থাকবে বহমান প্রসবণ। সূরা মুহাম্মদ-এ বিশেষভাবে বলা হয়েছে : দৃষ্টান্ত সে জান্নাতের যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে মুত্তাকিদের। সেথায় রয়েছে নহরসমূহ নির্মল পানির; আর আছে নহরসমূহ দুধের, পরিবর্তন হয়না যার স্বাদ, রয়েছে নহরসমূহ সূরার– সুস্বাদু, পানকারীদের কাম্য; আর আছে নহরসমূহ পরিশোধিত মধুর... ।[১৫]

এই যে স্বচ্ছ তোয়া নদী, অবিকৃত স্বাদ ক্ষীরধারা, সুস্বাদু মদির প্রবাহ আর নির্মল অমৃত নির্ঝরের বর্ণনা এ সবই কাওসারের ব্যাখ্যামূলক। সূরা কাওসারে উল্লেখিত 'প্রাচুর্য' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল কাওসারকে জান্নাতের একটি নদী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তাবারীর তফসীরে উদ্ধৃত এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : এর পানি শরাব, দুধ, মধুর স্রোতস্বিনী, যা জান্নাতবাসীদের পেয়, এর জান্নাতি স্বাদ পার্থিব কোন কিছুর স্বাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ব্যাখ্যাকারীগণ এ জান্নাতি নহর বা স্রোতধারার তলদেশ মণিমুক্তা খচিত, তীরভূমি সোনায় মণ্ডিত এবং নিম্নস্থ মৃত্তিকা মিশ্‌ক আম্বর সুবাসিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ স্রোতধারার পানীয় একবার পান করলে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। আরো বলা হয়েছে; জান্নাতের সকল নদীই হাওযে কাওসার-এ এসে মিলিত হয়েছে। নহরে কাওসারকে নহরে মুহম্মাদও বলা হয়। কারণ, বিশেষ করে এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য নির্ধারিত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনেই তার পুত্ররা ইন্তেকাল করায় অবিশ্বাসী কুরাইশ নেতারা বলেছিল যে, মুহাম্মদ (সা) তো আব্‌তার বা লেজকাটা অর্থাৎ অপুত্রক হয়ে গেল। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার ধর্মমত এমনকি তার স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারা আরো বলতো : আমরা তো মক্কার যমযম কূপের অধিকারী এবং আমরা এর পানি পান করিয়ে হাজীদের তৃপ্ত ও কল্যাণ করে থাকি। অপুত্রক মুহাম্মদ (সা)-এর কী আছে যে, সে তা দিয়ে ইহ-পরকালের কল্যাণ সাধন করবে? আর তার মৃত্যুর পর কেইবা তার ধর্ম রক্ষা করবে?

এর ফলে রাসূলে করীম (সা) শোকে, দুঃখে ও ব্যথা-বেদনায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। দশটি মাত্র শব্দ সম্বলিত তিন আয়াতের ক্ষুদ্রতম এ সূরাটিতে, বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতের মাত্র তিনটি শব্দে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা যেন দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত তাঁর প্রিয় বান্দার উপর বর্ষণ করলেন। 'নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি' বলে আল্লাহ্ তাআলা এক কথায় সকল কিছুই দিয়ে দিলেন। একটি মাত্র শব্দ 'কাওসার'-এ বিশ্বের সকল মহান ও কল্যাণ এবং অফুরন্ত নিয়ামতের প্রাচুর্য বুঝান হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'দেওয়া হবে' বলেননি; তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, 'আপনাকে দিয়েছি'। নিশ্চিত করে এ কথা বলা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলে দিলেন, অবিশ্বাসীরা তো পার্থিব ধনসম্পদ, পুত্র-সন্তানাদি ও জমজম কূপের গর্ব করছে, কিন্তু তারা তো বুঝেনা যে, এসবই অনিত্য ও অচিরস্থায়ী।

আমি আপনাকে করেছি আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, আপনার আবির্ভাবে খতম করে দিয়েছি সকল নবীর আগমন, আপনাকে দিয়েছি আমার মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম, আপনাকে দিয়েছি আমার সৃষ্টির জন্য, মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ জীবন-বিধান, আমার পবিত্র বাণী আল-কুরআন, আরো দিয়েছি চরিত্রের অতুলনীয় সম্পদ এবং অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান, ইলম ও হিকমত। আর আপনার উম্মত সংখ্যা হবে সবচাইতে বেশী। শেষ বিচারের দিনে একমাত্র আপনাকেই অনুমতি দেওয়া হবে আল্লাহর কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ করার। আপনাকে আরো দেওয়া হয়েছে, জান্নাতের সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ কাওসার নামক অনন্ত কল্যাণময় সরোবর বা নদীর অধিকার তা থেকে জান্নাতবাসীদের চির শান্তিময় ও পরম তৃপ্তিকর সুধা আবে কাওসার পান করাবেন আপনিই। মানুষের ইহলোকের ও পরলোকের উচ্চ পদ, শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, অনুপম গৌরব ও অতুলনীয় সম্পদ আর কী হতে পারে।

এসবের কারণে, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মতের মাধ্যমেই মানবজাতি কল্যাণের পথ পেতে থাকবে। আর কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে যখন সব মানুষ পিপাসায় কাতর হবে, তখন 'হাওযে কাওসার' থাকবে আপনারই অধিকারে। আপনি এ হাওয থেকে যাদের পানীয় পান করাবেন, তারা ছাড়া আর কেউ কোন পানীয় বা পানি পাবে না। এ সুধা সলিল জান্নাতের হাওযে কাওসার থেকেই হাশরের ময়দানে প্রবাহিত হবে। হাশরের পর যখন আপনি জান্নাতে যাবেন, তখনও সেখানকার হাওযে কাওসার আপনার হাতে থাকবে। এ সমস্ত নিয়ামাত আপনাকে দিলাম।

মহানবীর বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন : আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলায়কুম নিমাতি ওয়া রাদীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা– আজ আমি পূর্ণ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে আর সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ইসলামকে 'বিধান' বা 'দীন' রূপে।

এখানে যে নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর সবকিছুর সঙ্গে কাওসারও তার অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে, হাওযে কাওসার-এর পানীয় দুধ, বরফ ও রূপা থেকেও বেশী সাদা, বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতেও মিষ্টি। এ নহরের নিচের মাটি মিশক আতর থেকেও সুগন্ধিময়। এ পানীয় যে একবার পান করবে তার আর পিপাসা হবে না। আর যে এ পানি থেকে বঞ্চিত হবে, আর কিছুতেই তার পিপাসা মিটবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আপনার সম্পর্কে দুশমনদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্যে মন খারাপ না করে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আপনাকে

www.pathagar.com

ইহলোক ও পরলোকে যে অনন্ত কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি তা স্মরণ করে আপনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

'সালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং প্রার্থনা করা। দু'আ, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ অর্থেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর তরফ থেকে বললে এর অর্থ হয় রহমত বর্ষণ, ফিরিশতাদের তরফ থেকে হলে দু'আ ও আর্শীবাদ আর বান্দার তরফ থেকে হলে এর অর্থ প্রার্থনা করা, দরূদ পাঠ করা। এর বিশেষ অর্থ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা, তাহাজ্জুদ, আওয়াবীন, ইশরাক, দুহা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক সালাত আদায়।

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তা'আলা মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুসতাহাব সালাতাদি নিয়মিত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারো কারো মতে এখানে সালাত শব্দ দ্বারা ঈদের সালাত কিংবা মুজদালিফার ফরয সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিশিষ্ট তাফসীরকারদের মতে দৈনন্দিন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, জুমুয়া ও ঈদ ইত্যাদি সবরকমের সালাত নিয়মিত আদায় করাই এর প্রকৃত অর্থ।

'নহর' শব্দের আভিধানিক অর্থ উটের বক্ষ ও কণ্ঠনালির মধ্যে বর্শার আঘাত করে তাকে হত্যা (হালাল) করা। এর অন্য অর্থ 'বুদুন' মানে উট, বকরী ইত্যাদি কুরবানী করা। বিশিষ্ট মুফাসসীরদের মতে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি পশু বৈধভাবে কুরবানী করাই এর সাধারণ ও গ্রহণীয় অর্থ।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন না। যারা আপনাকে লেজকাটা, মূল কাটা ইত্যাদি বলছে, বস্তুত তারাই লেজকাটা ও শিকড় কাটা। তারাই মৃত্যুর পরে ইতিহাসে স্থায়ীভাবে ঘৃণিত ও অপমানিত হয়ে থাকবে, তাদের নাম নিশানাও থাকবে না। এর চাইতে সান্ত্বনার বাণী আর কী হতে পারে?

'আবতার' মানে আটকুড়ে, অপুত্রক, নিঃসন্তান অথবা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যার কীর্তি ও স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেরূপ হতভাগ্য। অবজ্ঞেয় ও হেয় ব্যক্তি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র বিয়োগে আবু লাহাব আবু জেহেল ও অন্যান্য কুরাইশ নেতারা তার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাকে আল আবতার বা নিঃসন্তান, লেজকাটা বলে বিদ্রূপ করেছে; বলেছে, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ধরাধাম থেকে মুছে যাবে, তাঁর ধর্মের নাম নিশানা কিছুই থাকবে না।

তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন যে, আমার রাসূলের নাম-নিশানা, ধর্ম-কর্ম, তাঁর কীর্তি ও স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত হবে না। তাঁর অসংখ্য উম্মতের ইবাদত, আযান, সালাত, ইকামাত, দরূদ ও প্রার্থনাদির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র নাম কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জাগরূক থাকবে। বরং যাঁরা তাঁকে আবতার বলে হেয় করার চেষ্টায় লিপ্ত তারাই দুনিয়া থেকে মুছে যাবে, তাদেরই নাম নিশানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

একথা সত্য যে, মানুষ তার কর্মেই বেঁচে থাকে। পরবর্তী বংশধরদের মাধ্যমে কারো নাম কিছুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু মহত বিরাট ব্যক্তিত্ব কোনদিন মারা যায় না। তারা চিরঞ্জীব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধর নেই ঠিক কিন্তু তাঁর রূহানী সন্তান, তাঁর উম্মত আজ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানব পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর পবিত্র নাম ও পুণ্যস্মৃতি ঘোষণা করছে। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে আযান ও ইকামতের আহ্বানে দৈনন্দিন বিশবার 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। আর ইসলাম ও ঐশীবাণী কুরআনের অলৌকিক সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অপর পক্ষে যারা তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল, তারাই আজ ধিক্কারের পাত্র। কোথায় তারা, কোথায় তাদের বংশধর? সকলই আল্লাহর ইশারায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মহানবী (সা)-এর শিক্ষা সর্বকালের সকল দেশের, সকল জাতির সকল মানুষের জন্য সর্বদা আদর্শ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। ◆

তথ্য সংকেত

১. আল-কুরআন, ২৮ সূরা কাসাস : আয়াত ৮৬।
২. আল-কুরআন, ২৫ সূরা ফুরকান : আয়াত ১।
৩. আল-কুরআন, ২ সূরা বাকারা : আয়াত ৯৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : আয়াত ২।
৫. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : আয়াত ৮২।
৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : আয়াত ৮০।
৭. আল-কুরআন, ৫৯ সূরা হাশর : আয়াত ২১।
৮. আল-কুরআন, ৫৬ সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৭৭-৭৯।
৯. আল-কুরআন, ১৫ সূরা হিজর : আয়াত ৮৭।
১০. আল-কুরআন, ১৭ সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৬০।
১১. আল-কুরআন, ৯৩ সূরা দুহা : আয়াত ৩-৫।
১২. আল-কুরআন, ৯৩ সূরা দুহা : আয়াত ৬-৮।
১৩. আল-কুরআন, ১০৮ সূরা কাওছার : আয়াত ১-৩।
১৪. আল হাদীস।
১৫. আল-কুরআন, ৭৪ সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৫।

www.pathagar.com

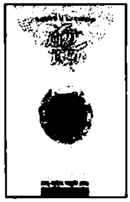

ইয়াসরিবে হিজরাত

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সন।

যে জনগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রের মতো আল্লাহর একটি খাস নিয়ামাতের কদর করতে জানে না এই নিয়ামাতের হকদার তারা নয়। আবার যেই জনগোষ্ঠী এই নিয়ামাতের কদর করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে ইসলামী রাষ্ট্ররূপ নিয়ামাতের হকদার তারাই। তাই মাক্কা নয়, ইয়াসরিবেই ইসলামী রাষ্ট্র পত্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এবার ইয়াসরিবে হিজরাতের পালা।

সন্তর্পণে শুরু হলো হিজরাত। এককভাবে অথবা ছোট্ট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে মুশরিকদের নজর এড়িয়ে মুসলিমগণ মাক্কা থেকে ইয়াসরিবে যেতে থাকেন। প্রথম যাঁরা গেলেন তাঁরা হচ্ছেন আবু সালামাহ ইবন আবদুল আসআদ (রা), আমের ইবন রাবীয়াহ (রা), লাইলা বিনতু আবু হাসমা (রা), আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা), আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং আইয়াশ ইবন আবু রাবীয়াহ (রা)।

অবশেষে রয়ে গেলেন মুহাম্মাদ (সা), আবু বকর আসসিদ্দিক (রা), আলী ইবন আবী তালিব (রা) এবং কয়েকজন অক্ষম মুসলিম। আবু বকর (রা) মহানবীর (সা) কাছে এসে হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা) বললেন, "তুমি তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহ তোমাকে একজন সংগী যোগাড় করে দেবেন।"

এদিকে মুশরিকদের মিটিং বসলো দারুন নাদওয়াতে। মুসলিমরা তো প্রায় সকলেই মাক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (সা) তখনও মাক্কায়। কাজেই তাঁর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এই মিটিং। করণীয় সম্পর্কে আলোচনা চলছে। কেউ একজন বললো, "তাকে বন্দী করে রাখ।" কিন্তু প্রস্তাবটি গৃহীত হলো না। একজন বললো, "তাকে নির্বাসন দাও।" এটিও

www.pathagar.com

যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো না। সর্বশেষে আবু জাহল বললো, "ওকে হত্যা কর।" আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। কিন্তু কে তাঁকে হত্যা করবে এই প্রশ্নটিও এসে দাঁড়ায়। কোন এক গোত্রের লোক তাঁকে হত্যা করবে, আবার কোন এক গোত্রের লোক তাঁর হত্যার রক্তপণ চেয়ে বসবে, এমন যদি হয় তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ। তাই স্থির হলো যে বনু হাশিম ব্যতীত বাকী সকল গোত্র থেকে বাছাইকৃত এক একজন যুবক নিয়ে একটি বাহিনী নির্দিষ্ট রাতে তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করবে এবং সকালে তিনি যখন ঘর থেকে বেরুবেন তখন সকলে মিলিতভাবে তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। আর ঐ রাতেই ঘর ছেড়ে ইয়াসরিবের পথে অগ্রসর হবার জন্য নির্দেশ পান মুহাম্মাদ (সা)।

তখনো বেশ কয়েকজন মুশরিকের গচ্ছিত সম্পদ ছিলো তাঁর কাছে। সেগুলো মালিকদের বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আলী ইবন আবী তালিবকে (রা) ঘরে রেখে মুহাম্মাদ (সা) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি "ফা আগশাইনাহুম ফাহুম লা-ইউবসিরূন" আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন। আল্লাহর রাসূল (সা) হেঁটে চলে যান।

মহানবী (সা) পৌছলেন আবু বকরের (রা) বাড়ি। তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে হিজরাতের অনুমতি দিয়েছেন।" আবু বকর (রা) বললেন, "আমি কি আপনার সংগী হতে পারবো?" মহানবী (সা) বললেন, "হাঁ, তুমি আমার সংগে যাবে।" মহানবীর (সা) সফরসংগী হতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই সৌভাগ্য লাভ করলেন আবু বকর (রা)। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কেঁদে ফেলেন।

মাক্কা থেকে দক্ষিণে সাউর পাহাড়। খুব উঁচু পাহাড় এটি। এই পাহাড়ের শীর্ষ দেশে অনেকগুলো গুহা। একটি গুহাতে অবস্থান গ্রহণ করেন মুহাম্মাদ (সা) এবং আবু বকর আসসিদ্দিক (রা)।

বেশ বেলা হলে পর দুশমনেরা টের পেলো যে মুহাম্মাদ (সা) ঘরে নেই। হৈ চৈ পড়ে গেলো মাক্কায়। আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, "মুহাম্মাদ কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি সারারাত ঘুমিয়েছি। পাহারা দিয়েছো তোমরা। তাই আমার চেয়ে তোমরাই ভালো জানো।" তারা বললো, "ওর খবর তড়িঘড়ি বল। নইলে তোমার রক্ষা নেই।" নির্ভীক কণ্ঠে আলী (রা) বললেন, "আমি কি তোমাদের চাকর যে তোমাদের শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছি? কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছো?"

খোঁজাখুঁজি শুরু হলো চারদিকে। খুঁজতে খুঁজতে একটি দল এলো আবু বকরের (রা) বাড়ি। ঘরে ঢুকে আবু বকরের কন্যা আসমাকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি বললেন, "আমি বলতে পারবো না।" আবু জাহল তার গালে কানে একটি থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। ভারী থাপ্পড়ের আঘাতে কান থেকে তার দুল ছিটকে পড়ে। সন্ধানীরা সাউর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়। উঠে যায় পাহাড়ের চূড়ায়। একটি একটি করে তারা গুহাগুলো পরীক্ষা করতে থাকে। একটি গুহার মুখে তারা ঝোপ দেখতে পায়,

www.pathagar.com

করেছে, তা তোমরা পরিত্যাগ করো।' (সূরা হাশর : আয়াত ৭)

সুন্নাহর গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন :

'তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে গেলাম– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

এ যাবতকার আলোচনা থেকে সুন্নাহর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। একথা সকলেরই জানা, ইসলামের মূল উৎস দুটি : ১। আল কুরআন এবং ২। সুন্নাহ বা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একথাও সকলেরই জানা যে, হাদীস ভান্ডারের মধ্যেই সন্নিবেশিত ও সংরক্ষিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। অর্থাৎ হাদীসে রাসূল থেকেই জানা যায় সুন্নাতে রাসূল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্পষ্টই বলে গেছেন, কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে একথাও জানিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন যে :

'হে নবী! তাদের বলে দাও : তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

রাসূলের অনুসরণ করতে হলে রাসূলের রেখে যাওয়া কুরআনকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর সুন্নাহকেও গ্রহণ করতে হবে। কারণ সুন্নাহ তো কুরআনেরই ব্যাখ্যা।

'আমি তোমার কাছে যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি, যেনো তুমি তাদের প্রতি যা নাযিল করা হলো, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে :

'আল্লাহর আনুগত্য করো আর আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩২)

আরো বলা হয়েছে :

'যদি এ আনুগত্য পরিহার করো, তবে জেনে রাখো আল্লাহ এসব কাফিরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩২)

আসলে রাসূলের কোনো ফায়সালা অমান্য করবার কোনো অধিকারই নেই কোনো মুমিনের : 'যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্ব (মতামতের) কোনো এখতিয়ার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা অমান্য করলো সে সুস্পষ্টভাবে বিপথগামী।' (সূরা ৩ আল আহযাব : আয়াত ২৬)

www.pathagar.com

রাসূলের ফায়সালা অমান্য করা যাবেনা, ব্যাপার কেবল এতটুকুই নয়, বরং রাসূলকেই ফায়সালাকারী মানতে হবে।

'তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনো মুমিন হতে পারবেনা যতোক্ষণ না তারা তাদের বিরোধ-বিবাদে তোমাকে সালিশ মানবে। শুধু তাই নয়, তুমি যে ফায়সালা দেবে, তাও নিঃসংকোচে গ্রহণ করবে এবং প্রশান্ত মনে মেনে নেবে।' (সূরা ৪ আননিসা : আয়াত ৬৫)

ব্যস্, রাসূলের আনুগত্য করা, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়াসালা গ্রহণ করা এবং রাসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। কিন্তু কিভাবে? রাসূলকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার পথ কী? এর একমাত্র পথই হলো কুরআনের সাথে সাথে হাদীসে বর্ণিত সুন্নাতে রাসূলকে জানতে হবে, মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে যেমন কুরআন মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে, তেমনি কুরআনের সাথে সাথে তাকে সত্যিকার মুসলিম হবার জন্যে সুন্নাতে রাসূলও জানতে হবে এবং মানতে হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, সুন্নাতে রাসূল হলো–

১. কুরআনে যা আছে তাই, কিংবা

২. কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অথবা

৩. কুরআনে নেই, অথচ মুমিনদের কর্তব্য এমন জিনিস।

এ কারণেই ইসলামী শরীয়ার উৎস হিসেবে সুন্নাতে রাসূলকে অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা পরিষ্কার :

'যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করলো।' (সূরা ৪ আননিসা : আয়াত ৬৯)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস আকারে রেখে যাওয়া তাঁর সুন্নাহ জানা ও শিখার এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উৎসাহিত করে গেছেন। তিনি বলেছেন :

'ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ চিরসবুজ ও চিরসুখে তরতাজা করে রাখবেন, যে আমার বাণী শ্রবণ করলো, তা সংরক্ষণ করলো এবং অপরের নিকট পৌঁছে দিলো ।' ◆

www.pathagar.com

তাতে বাসায় বসে কবুতর ডিমে তা দিচ্ছে, আবার গুহার মুখে ঝুলছে মাকড়সার একটি বড়ো জাল। তারা বলাবলি করলো যে এই গুহাতে কেউ ঢোকেনি। গুহার সম্মুখে তারা হাঁটাহাঁটি করছিলো। ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছিলো তাদের পা। এই গুহাতেই ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) এবং আবু বকর আসসিদ্দিক (রা)। আল্লাহর রাসূলের (সা) নিরাপত্তার কথা ভেবে শংকিত হয়ে ওঠেন আবু বকর (রা) দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠে মুহাম্মাদ (সা) বললেন, "লা-তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'আনা' (চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)।

খোঁজাখুঁজি করে মুশরিকগণ ফিরে যায় মাক্কায়। তিন দিন তিন রাত মুহাম্মাদ (সা) এই গুহাতে থাকেন। তাঁদের জন্য খাবার আসতো আবু বকরের (রা) বাড়ি থেকে। আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর সারাদিন শহরে ঘুরাফেরা করে মুশরিকদের কথাবার্তা শুনতেন, তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হতেন এবং রাতের গভীরে গুহায় এসে তা রিপোর্ট করতেন।

তিন দিন ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে মুশরিকগণ ভাবলো যে মুহাম্মাদ (সা) নাগালের বাইরে চলে গেছেন। খোঁজাখুঁজিতে তাই ভাটা পড়লো।

মাক্কা থেকে ইয়াসরিবের দিকে চলে গেছে একটি পথ। এই পথে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা যাতায়াত করে। এই পথ মুহাম্মাদের (সা) জন্য নিরাপদ ছিলো না। তাই তিনি বেছে নেন দুর্গম পাহাড়ী পথ। পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য নিয়োজিত হয় মুশরিক অথচ বিশ্বাসভাজন আবদুল্লাহ ইবন উরাইকাত। আবু বকরের (রা) বাড়ি থেকে আসা তিনটি উটে চড়ে মুহাম্মাদ (সা), আবু বকর (রা) এবং আবু বকরের ভৃত্য আমীর ইবন ফুহাইরা সেই দুর্গম পথে অগ্রসর হন।

মাক্কার অনতিদূরে কুদাইদ নামক স্থানে নিজ গোত্রের একটি আড্ডায় অবস্থান করছিলো সুরাকা ইবন মালিক আলমাদলাজী। সেখানেই সে শুনলো যে মুহাম্মাদকে (সা) ধরে দিতে পারলে একশত উট ইনাম দেয়া হবে। কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে বললো যে একটু আগে সে একস্থানে তিনজন লোককে উটে চড়ে যেতে দেখেছে এবং তারা মুহাম্মাদ (সা) ও তার সংগীরা হতে পারে। সুরাকা বলে ওঠে, "না, না। ওরা তো অমুক গোত্রের লোক। ওরা ওদের হারানো উট তালাশ করছে।" অন্য কেউ ইনাম পাবার লোভে মুহাম্মাদের (সা) পিছু নিতে পারে–এই আশংকায় সে এমন কথা বলে। আসলে নিজেই ইনাম হাত করতে আগ্রহী ছিলো। কিছুক্ষণ পর সে আড্ডা থেকে উঠে গোপনে প্রস্তুতি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বর্ণিত পথে এগুতে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর তার ঘোড়া হোঁচট খায়। সুরাকা ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যায়। সে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া আবার হোঁচট খায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সুরাকা। সে যখন মহানবীর কাছাকাছি এসে পৌছে তখন তার ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে যেতে থাকে। সে ভয় পেয়ে যায় এবং অন্তর থেকে লোভ দূর করে। সে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের (সা) সাহায্য চায়। অতঃপর সে বলে, " হে মুহাম্মাদ (সা), আমি নিশ্চিত হয়েছি শিগগির আপনার দীন বিজয়ী হবে। আপনি কথা দিন যে আপনার রাজ্যে গেলে আমি সমাদৃত হবো। আর এই কথাটি একটু লিখে দিন।"

আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশে আবু বকর আসসিদ্দিক (রা) তাকে এক টুকরো হাড়ের ওপর কয়েকটি কথা লিখে দেন।

সুরাকা মাক্কার দিকে ফিরে চলে। পথিমধ্যে সে দেখলো লোকেরা তখনো মহানবীকে (সা) সন্ধান করে ফিরছে। সে তাদেরকে বললো, "তোমরা ফিরে যাও। এই পথে আমি তাকে বহু দূর পর্যন্ত খুঁজেছি।

সুরাকা যখন নিশ্চিত হলো যে মুহাম্মাদ (সা) ইয়াসরিব পৌঁছে গেছেন তখন সে ঘটনাটি জানালো লোকদেরকে। এই কথা গোপন রাখায় আবু জাহল খুব করে বকলো সুরাকাকে। কবিতার ভাষায় সুরাকা আবু জাহলকে বলে, "আল্লাহর শপথ। ওহে আবুল হিকাম, তুমি যদি দেখতে আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি যখন তার পা দেবে যাচ্ছিল, তুমি নিঃসংশয় হতে যে মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। সুতরাং কে তাকে প্রতিরোধ করবে?"

তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল।

দুশমনের চোখ এড়াবার জন্য মুহাম্মাদ (সা) বেছে নিয়েছিলেন দুর্গম পাহাড়ী পথ। পথের চড়াই উতরাই পেরিয়ে মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সংগীরা সামনে এগুতে থাকেন। দুপুরের প্রখর সূর্য কিরণ তাঁদের অগ্রগমন অসম্ভব করে তুলতো। তখন তাঁরা বিশ্রাম নিতেন কোন ছায়াদার গাছের নীচে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে আবার পথচলা শুরু করতেন।

ইয়াসরিব এবং এর নিকটবর্তী জনপদগুলোতে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে আল্লাহর রাসূল (সা) মাক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছেন।

সাড়া পড়ে যায় ইয়াসরিবে।

যাঁর উপস্থাপিত আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা ধন্য হয়েছেন, তাঁকে নিজেদের মাঝে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠে ইয়াসরিবের মুসলিমগণ। সম্ভাব্য উপস্থিতির দিন যতোই ঘনিয়ে আসে ততোই বাড়ে তাঁদের ব্যতিব্যস্ততা। প্রতিদিন সালাতুল ফজরের পর তাঁরা উন্মুক্ত মাঠের দিকে এগিয়ে যান। দূরের দিকে তাকিয়ে থাকেন সন্ধানী চোখ নিয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা উটের একটি কাফিলা দেখার জন্য তাঁরা উদগ্রীব। সূর্যের তাপ অসহ্য হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁরা প্রান্তরে অপেক্ষা করেন। সূর্যের কিরণের প্রচণ্ডতা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাঁরা ঘরে ফেরেন।

মহানবীর (সা) আগমনের দিনের কথা।

সকাল থেকেই প্রতীক্ষায় ছিলেন মুসলিমগণ। না, এলেন না তিনি। দুপুর ঘনিয়ে

www.pathagar.com

আসে। রোদের প্রখরতা বেড়ে যায়। প্রান্তরে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। একে একে ঘরে ফিরেন অপেক্ষমাণ জনতা।

হঠাৎ একটি চিৎকার শুনে তাঁরা চকিত হয়ে ওঠেন। এক ইয়াহুদী চীৎকার করে বলেন, "ওহে বনু কায়লা, তোমাদের সৌভাগ্যের ধন এসে গেছে।"

দৌড়িয়ে বের হন সকলে।

মরুর ধুলা উড়িয়ে এগিয়ে আসে তিনটি উট। মহানবী (সা) এসে গেছেন কুবা পল্লীতে।

শুরু হয় সালাম বিনিময়। শুরু হয় মুসাফাহা। প্রিয়জনকে নিজেদের মাঝে পেয়ে কুবাবাসীদের আনান্দের সীমা নেই। আল্লাহর রাসূল (সা) কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিন দিন পর আলী ইবন আবী তালিব (রা) এসে মহানবীর (সা) সাথে মিলিত হন কুবাতে। এখানে আল্লাহর রাসূল (সা) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই কুবা মসজিদ।

কিছুদিন কুবায় থাকার পর মহানবী (সা) ইয়াসরিবের দিকে রওয়ানা হন। তিনি রাতনুল ওয়াদী বা ওয়াদীয়ে রানুনা পৌছেন। সেদিন ছিলো জুমাবার। এখানে সকলকে নিয়ে সালাতুল জুমআ আদায় করেন। এটাই ছিলো প্রথম সালাতুল জুমুআ।

ওয়াদীয়ে রানুনা থেকে মহানবী (সা) মূল ইয়াসরিবের সীমানায় পৌছেন। খুশীর প্লাবন নেমেছে ইয়াসরিবে। পথে পথে জনতার আনন্দ মিছিল। বালিকারা জড়ো হয়েছে ছাদে ছাদে। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, "তালাআল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদা', ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মা দা'আ লিল্লাহি দা'।"

উটে চড়ে মহনবী (সা) সামনে এগুতে থাকেন। পথিমধ্যে বনু সালেম ইবন আউফের ইতবান ইবন মালিক (রা) এবং আব্বাস ইবন উবাদা ইবন নাদলা (রা) গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে তাঁর উটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমাদের যা জনবল, সহায় সম্বল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি এখানেই অবস্থান করুন।" মহানবী (সা) বলেন, "তোমরা আমার উটের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশে সে আমাকে যথাস্থানে পৌছিয়ে দেবে।" উটের পথ ছেড়ে দেয়া হয়।

উট চলতে থাকে আপন গতিতে। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা) এসে পৌছেন বনু বায়েদার বসতি স্থলে। মহানবীকে (সা) মেহমান হিসেবে পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে বনু বায়েদার যিয়দ ইবন লাবীদ (রা) এবং ফারওয়া ইবন আমর (রা) একদল লোক নিয়ে উটের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমাদের যা জনবল, সহায় সম্বল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি এখানেই অবস্থান করুন।" মহানবী (সা) বলেন, "তোমরা আমার উটের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশে সে আমাকে যথাস্থানে পৌছিয়ে দেবে।"

উটটি চলতে চলতে বনু সায়েদার এলাকায় এসে পৌছে। মহনবীর (সা) মেহমানদারীর

www.pathagar.com

সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে উটের গতিরোধ করে দাঁড়ায় বনু সায়েদার সা'দ ইবন উবাদা (রা), মুনযির ইবন আমর (রা) এবং আরো অনেক লোক। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমাদের যা জনবল, সহায় সম্বল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি এখানেই অবস্থান করুন।" মহানবী (সা) বলেন, "তোমরা আমার উটের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশে সে আমাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।"

তাঁরা পথ ছেড়ে দেন। শান্ত পদে উট এগিয়ে চলে সামনে। শিগগিরই তা এসে পৌঁছে বনু হারেসের বসতিতে। বনু হারেসের সাদ ইবন রাবী (রা) খারেজ ইবন যায়িদ (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) তাঁদের গোত্রের লোকদের নিয়ে মহানবী (সা) উটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমাদের যা জনবল, সহায় সম্বল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি এখানেই অবস্থান করুন।" মহানবী (সা) বলেন, "তোমরা আমার উটের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশে সে আমাকে যথাস্থানে পৌঁছাবে।"

উটের পথ ছেড়ে দেয়া হয়।

উট সামনে অগ্রসর হয়ে বনু আদী ইবন নাজজারের এলাকায় প্রবেশ করে। বনু আদী ইবন নাজজারের লোক নিয়ে এগিয়ে আসেন সালীত ইবন কায়েস (রা) এবং আবু সালীত উসাইবা (রা)। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি আমাদের নিকট অবস্থান করুন। আমাদের যা কিছু জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তার ওপর আস্থা রাখুন।" মহানবী (সা) বলেন, "আমার উটকে অবাধে চলতে দাও। আমাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তার ওপর আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে।"

তারা উটের পথ ছেড়ে দেন।

আবারো চলতে থাকে উট সামনে। শিগগিরই তা এসে পৌঁছে বনু মালিক ইবন নাজজারের বসতি এলাকায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে এখানেই বসে পড়ে মহানবীর (সা) উট। উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ বাতাস। মহা আনন্দে এগিয়ে আসেন আবু আইউব খালিদ ইবন যায়িদ (রা)। উটের পিঠ থেকে নেমে পড়েন আল্লাহর রাসূল (সা)। আবু আইউব খালিদ তাঁকে আহলান সাহলান জানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান। এই ঘরেই অবস্থান গ্রহণ করেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

আবু আইউব খালিদের (রা) বাড়ী অসংখ্য মানুষের পদভারে প্রকম্পিত। আল্লাহর রাসূলকে (সা) বার বার দেখার লোভ সামলাতে পারছেন না কেউ। সবাই চাচ্ছেন তাঁর সাথে হাত মিলাতে, তাঁর মুখের দুটো কাথা শুনতে। মনের গভীরে সকলেই অনুভব করছেন তিনি তাঁদের প্রিয়জন– একান্ত আপন। ◆

www.pathagar.com

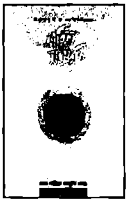

মি'রাজুন্নবী (সা)

ডঃ এম. শমশের আলী

মি'রাজ শব্দটির অর্থগুলো হচ্ছে, সিঁড়ি বা সোপান, ঊর্ধ্বে আরোহণ, উপরে ওঠা। লাইলাতুল মি'রাজ বা শবে মি'রাজ বলতে আরোহণের রাত্রি বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায়, এটা সেই রাত্রি যখন হযরত মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের বায়তুল মাকদিস যান এবং সেখান থেকে সাত আসমান ভ্রমণ করেন ও আল্লাহর সন্নিকটে পৌছান। আজকের দিনে মি'রাজের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক খোঁজার আগে ভাল করে জানা দরকার– এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে কি বলা হয়েছে। কুরআনে মি'রাজের প্রতি সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় সূরা 'বানী ইসরাঈলের' প্রথম আয়াতে অর্থাৎ ১৭ নম্বর সূরার ১ নং আয়াতে। এই আয়াতে বলা হয়েছে :

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায় যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' পরে মি'রাজের প্রতি আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় সূরা 'নাজম' অর্থাৎ ৫৩ নম্বর সূরার ১২ থেকে ১৮ আয়াতে। হাদীসে মি'রাজের যে বর্ণনা আছে তার কয়েকটি ভাষ্য পাওয়া যায়। খুঁটিনাটি বিবরণের দিক দিয়ে এগুলির একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন। যাহোক, মুসলিম এবং বুখারী শরীফের হাদীসগুলোর সংক্ষিপ্ত সার হল এ রকম :

কোন এক রাতে যখন নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ঘুমাচ্ছিলেন, তখন জিবরীল (আ) সহ তিনজন ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কাবা শরীফে নিয়ে যান। সেখান থেকে জিবরীল (আ) তাকে সাথে নিয়ে বুরাকে চড়েন এবং প্রথমে যান জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায়। সেখানে নবী করীম (সা) দু' রাকাত নামায পড়েন। সেখান থেকে জিবরীল (আ) তাকে সাথে নিয়ে সাত আসমানের প্রতিটির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেন। এইসব আসমানে নবী করীম (সা) পর্যায়ক্রমে হযরত আদম (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত হারুন (আ),

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ), এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হাদীসের বর্ণনায় আরও আছে যে, নবী করীম (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মামুরেও নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বেহেশত দেখেন, দোযখ দেখেন। তিনি আল্লাহকে দেখেন অনন্ত মহিমায় ও শান শওকতে। একই রাতে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই ভ্রমণেই তিনি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট পাঁচবার সালাত কায়েম করবার নির্দেশ লাভ করেন।

এখন এই মি'রাজ ঘটনাটির ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে দিতে পারি? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, মি'রাজ সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দুটো school of thought বা মতবাদ আছে। একটি মতবাদ অনুসারে মি'রাজ সংঘটিত হয় আধ্যাত্মিক পর্যায়ে। অন্যমতের অনুসারীরা বলেন যে, মি'রাজ ঘটেছিল শারীরিকভাবেই। যদি প্রথম মতবাদটি গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল আধ্যাত্মিকরূপে, তাহলে সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার খুব একটি অবকাশ থাকে না। কারণ জড় পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যেমনভাবে করতে পারি, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঠিক তেমনটি পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব পদ্ধতি ও হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে– সেগুলোর কার্যপরিধি জড় পদার্থের বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করেই। আধ্যাত্মিক জগতকে probe বা তলিয়ে দেখবার কাজটি বিজ্ঞানের বিশেষ পদ্ধতিতে হয়ত কখনই সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা না করাই সমীচীন। কিন্তু নবী করীমের (সা) এই নৈশ ভ্রমণকে যদি literal বা শাব্দিক অর্থে নেওয়া হয়, অর্থাৎ যদি ধরা হয় যে ঘটনাটি শারীরিকভাবেই ঘটেছিল– তবে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন আসে এবং এক্ষেত্রে এক ঝাঁক প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নগুলো হল এরকম : হযরত মুহাম্মাদ (সা) gravitational force বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করলেন কি করে? বুরাক নামক অদ্ভুত জন্তুটি যা আরবী শব্দ 'বুরক' অর্থাৎ বিদ্যুৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত, তা কি আসলে একটা মহাশূন্যযান ছিল? এই বুরাক যার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়, কুরআনে নয়, তা এত দ্রুতগতি সম্পন্ন কি করে হল যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে astronomial দূরত্বে যেতে পারল? প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক ও চমকপ্রদ। এবং এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব যে একটা সহজ ব্যাপার তাও নয়।

যাক। প্রশ্নগুলো একটু তলিয়ে দেখা যাক। মাধ্যাকর্ষণের প্রশ্নেই আসা যাক। যদিও মি'রাজ যে কালে ঘটেছিল তখন বা এমন কি তারও অনেক পরবর্তী সময় পর্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণ যাকে আমরা gravity বলে থাকি এবং যার আবিষ্কর্তা বলা হয় Newton-কে তাকে ডিঙ্গানো বা অতিক্রম করা অকল্পনীয় ছিল। রকেটের যুগে বাস করে আজ অবশ্য আমরা বুঝতে পারছি যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুকে যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী গতিতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে ওই বস্তুর পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পেরিয়ে যাওয়া কোনই কঠিক কাজ নয়। এই যে গতিবেগ অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৭ মাইল– এটাকে বলা হয় Escape velocity– অর্থাৎ এটা সেই গতিবেগ

www.pathagar.com

যা পেলে বস্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পেরিয়ে যেতে পারে। জ্বালানী পুড়িয়ে রকেটগুলো এই গতিবেগ অর্জন করে। পোড়া গ্যাসগুলো যতই পিছন দিকে নির্গত হয়, ততই নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে রকেট সামনের দিকে এগোতে থাকে। তাই যদিও আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে পেরুনো অকল্পনীয় ছিল– আজ কিন্তু আর তেমন নেই।

এখন হয়ত কেউ ভাবতে পারেন যে 'বুরাক' কি তাহলে এক ধরনের মহাশূন্যযান ছিল? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর জানি না– তবে এটুকু বলা যায় যে, বুরাকে চড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে– তার গতিবেগ ঐ ভ্রমণে, 'escape velocity' এর সমান না হলেও চলে। গতিবেগ অত্যন্ত বেশী হবে বা আধুনিক এ্যারোপ্লেন CONCORD এর গতিকে ছাড়িয়ে যাবে– এ রকম একটা শর্তই যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, CONCORD এর মত প্লেন মানুষ হালে বানাতে শিখেছে– তাই হালে ঐ ধরনের গতিসম্পন্ন কোন বাহক বা যানের কথা কল্পনা করতে কোন অসুবিধা হয় না। এ প্রসঙ্গে আরো প্রশ্ন আসে এবং এ প্রশ্নগুলো খুঁটিনাটি প্রশ্ন। যেমন, বুরাকের shape বা আকার কি রকম ছিল? উড়বার শক্তি ও জোগাড় করবে কোথা থেকে? ইত্যাদি, বিজ্ঞানের সূত্র ধরে এটুকু বলা চলে– অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেমে গমন করা কোন অসম্ভব বিষয় নয়। তবে অধিকতর কঠিন যে প্রশ্ন তা হচ্ছে– সপ্ত আসমানে আরোহণের ব্যাপারটি। এখানে অসাধারণ গতিবেগে পৌঁছানোর আগে acceleration বা ত্বরণের প্রশ্নটি নিহিত আছে। আরো একটা প্রশ্ন। ভ্রমণে সময় কতটুকু লেগেছে? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যিনি ভ্রমণ করছেন না, তার ঘড়িতে এই ভ্রমণে যতটা সময় ব্যয়িত হয়েছে বলে মনে হবে– তা, যিনি ভ্রমণ করছেন তার ঘড়িতে ব্যয়িত সময়ের থেকে আদালা হবে। এটা হেঁয়ালী ঠেকলেও আপেক্ষিকতা তত্ব তাই বলে। সুতরাং দ্রুতগতিবেগ অর্জন করা এবং এর প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিগত সমস্যা যতই দুরূহ বলে মনে হোক– ভ্রমণটা যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে সেটা বোঝা তত দুরূহ নয়– বিশেষ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব জানবার পর। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন পর্যবেক্ষক যদি নিজেকে তার ঘড়ির সাথে আপেক্ষিকভাবে স্থির দেখতে পান, তবে অন্য যেসব ঘড়ি যা তিনি সুষম গতিবেগে চলাচল করতে দেখবেন, সেগুলোর সময় তার কাছে দ্রুত চলছে বলে মনে হয়। ঘড়িগুলোতে সময় কত তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হবে তা নির্ভর করবে ঘড়িগুলোর গতিবেগের উপর। উদাহরণস্বরূপ একটি ট্রেন, যদি আলোর গতিবেগ বা তার ০.৯৯৯ ভাগ গতিবেগে ধাবিত হয়, এবং ঐ ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের ঘড়িতে যদি ১ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে বলে মনে হয় তবে স্টেশনের ঘড়িতে তিনি দেখবেন এক ঘণ্টার বেশি অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ ভ্রমণকারীর সময় এবং স্থির হয়ে আছেন যিনি তার সময় আলাদা হবে। জিবরীল (আ)-এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সপ্তাকাশে আরোহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে বিষয়টি এসে পড়ে তা হল এই যে, তারা যদি কোন

www.pathagar.com

যান ব্যবহার করে থাকেন, তবে ঐ যানকে উঠবার সময় অনেক acceleration বা ত্বরণ পেতে হয়েছিল, আবার পৃথিবীতে নামবার সময় গতি কমাতে হয়েছিল; এক্ষেত্রে ঐ যানটিকে ঠিক একটি inertial frame বা জড়কাঠামো হিসাবে গণ্য করা যায় না– তাই ভ্রমণকারী ও বাড়ীতে থেকে যাওয়া লোকের ঘড়ির সময়ের তফাৎ হয়ত একটি বাস্তব ঘটনা– অবশ্য মি'রাজের বর্ণনায় এই সময়ের ব্যবধানের কথা কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

পরিশেষে বলা চলে যে, জগৎসমূহের পরিচালক আল্লাহ্ যে কোন সময়ে যে কোন ঘটনা ঘটাতে পারেন। তার নিজের কথাতেই, তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়। এখন এই ধরনের ঘটনা আমাদের দৃশ্যজগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়মে ঘটে থাকে, না-কি এমন নিয়মে যা আল্লাহ্ই জানেন, কিন্তু আমরা জানতে পারি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থায় আমরা আসিনি। আমরা বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত যা জেনেছি, তা দিয়ে মি'রাজের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে এখনও অসমর্থ। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের আরো বিকাশ ঘটলে, মি'রাজের উপর হয়ত ভবিষ্যতে আরো আলোকপাত করা সম্ভব হবে। আল্লাহ্ আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, এই হোক আমাদের প্রার্থনা। ◆

www.pathagar.com

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা

হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ)

১

অন্ধ-তামসে পূরিত বিশ্ব, ক্ষুব্ধ জলধি বক্ষে তা'র
গর্জ্জে গভীর, উর্ম্মি ভীষণে ধ্বংস-গীতিকা বাজিছে যা'র
দুর্দ্দিনে সেই মর্ত্ত্যে উতরি' মানব-শীর্ষ মুকুটমণি!
শূন্য, ভুবন, পবন ভরিয়া মন্দ্রে তুলিল মহান ধ্বনি।
ঘুচিল আঁধার হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক-পাতে
সত্য মহান, ধর্ম্মের জ্যোতি : হেরিল মানব নবীন প্রাতে।

২

তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীর ধ্যানে,
সাক্ষাত লভি' স্বর্গ দূতেরে ধরিলে মহান সত্য জ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সে জন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যা'র
জানালে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য আর।
ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব নূতন অরুণ আলোক-পাতে,
সত্য মহান ধর্ম্মের জ্যোতি : হেরিল মানব নবীন প্রাতে।

৩

কঠোর মরুভূ-বেষ্টিত মহা বন্ধুর-ভূমি আরব বুকে
করুণার চির পূর্ণ, আকর ব্যথিত হৃদয়ে জীবের দুখে
স্বর্গ বিভব শান্তির পূত স্নিগ্ধ নিঝর বহা'লে ধীরে,
মুক্ত হইল বিশ্বমানব গাহন করিয়া পুণ্য নীরে।
ধর্ম্মজগতে কর্ম্মী পুরুষ সাধন-পথের অগ্রগামী,
জগন্নরের শীর্ষভূষণ সর্ব জীবের মুক্তিকামী।

৪

বর্ষিল বিধি শীর্ষে তোমার আশিস জাগা'তে বিশ্বপ্রাণী
(তাই) কণ্ঠে তোমার ঝংকৃত হল গম্ভীরে পূত কোরাণ-বাণী।

www.pathagar.com

সুপ্ত ধর্ম্ম উঠিল জাগিয়া জনমে তোমার ধরার তীরে,
কল্যাণ মহাস্বর্গ হইতে আসিল আবার নামিয়া ধীরে।
ধর্ম্মজগতে কর্ম্মীপুরুষ সাধন পথের অগ্রগামী,
জগন্নরের শীর্ষভূষণ সর্ব জীবের মুক্তিকামী।

৫
সুদূর অতীতে শুনালে যে গান কবি বরেণ্য জগতে, তুমি,
লক্ষ কণ্ঠে ঝংকৃত আজি মুখরি' গগন, পবন, ভূমি।
খোদার করুণা মানব-মূর্ত্তি ধরিয়া মর্ত্তে উড়িলে তুমি,
বহালে পুণ্য শান্তি নিঝর, ধরায় নামিল স্বরগ-ভূমি।
মুর্ত্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্ত্যে জগৎপাতার মহান দান,
আর্য্য মানব সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব কবির প্রাণের গান।

৬
সোনার তরণী দিয়েছ দেখায়ে জীবন-তটিনী মাঝারে তুমি,
ভ্রান্ত মানব বাহিয়া তাহারে লভিছে সুদূর আলোক-ভূমি।
কল্যাণে তুমি অজ্ঞ নরের বিলা'লে নিজেরে জগৎময়
দেখা'লে সাম্যধর্ম প্রভাবে শত্রু সেজন আপন হয়।
মুর্ত্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্ত্যে জগৎপাতার মহান দান,
আর্য্য মানব, সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব কবির প্রাণের গান।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের কবিতা

সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা

পুরানো রাতের চাঁদ ক্ষ'য়ে উঠেছে আকাশে নতুন চাঁদ,
সে চাঁদই নিভেছে কালো অঙ্গারে, পার হ'য়ে মরু নীলার বাঁধ
তোমার কুটীর দ্বারে হয় কত খণ্ড শশীর আবির্ভাব,
তবুও মক্কা-মদীনার রাজা মেটে না তোমার গৃহে অভাব,
উনানে চড়ে না আহার্য কাটে ক্ষুধিত তোমার কত না রাত
মানুষের লাগি উম্মত লাগি তবুও ক'রেছো অশ্রুপাত;
জ্বলে না কুটীরে চেরাগ, জ্বলে ও ব্যথিত বক্ষে প্রেমের শিখা
জ্বলে ও মাটির শামাদানে লাল ফিরদৌসের স্বপ্ন লিখা।

গলেছে পাহাড়, জ্বলেছে আকাশ, জেগেছে মানুষ তোমার সাথে,
তোমার পথের যাত্রীরা কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে,
তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু-দোল,
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনের ও কলরোল
তাই ওসমান খুলে গেল দ্বার অতুলন দিল মণিকোঠার,
তাইতো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার,
খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞান যাত্রীরা করে প্রয়াণ।
পাল তুলে দিয়ে কিশ্‌তি ছুটেছে জোয়ার ভাটার মাঝে অটল
নতুন তুফানে কোটি মরাগাঙ ধমনীতে পেল নতুন বল,
তারা খুঁজে ফেরে সিন্ধু ঠিকানা প্রবল তৃষার বারি অতল,
মৌসুমী ফুল জাগায়ে দু'ধারে বর্ষ শেষের তোলে ফসল।

মানুষের হাতে সকল পাথেয় দিয়ে কামালৎ-সম্ভাবনা
সব কাজ শেষে মরু-আফতাব হ'লে কি এবার অন্যমনা?
আজ এত দিনে হ'ল কি সময় আবার নতুন পথচলার?
পরম প্রিয়ের ডাক এলো নাকি? আকাশ মহলা সাত তলার
ওপার থেকে সে মহা কারিগর ডাক দিল নাকি হে নূরনবী?

www.pathagar.com

মরুর আকাশ রোশনিতে ভরি এবার 'কোথায় জাগ্‌বে রবি?
এখানে তোমার নিশীথারণ্য? কোথায় তোমার ফুটেছে যুঁই?
সে কোন স্বর্ণচামেলি বনের আভায় এ মাটি হ'ল বিভুঁই?
ফিরদৌসের কোন গুলশানে 'সী' বিহঙ্গ উঠলো ডেকে'
চ'লে গেলে তুমি ও-মাটির ফুলমৃত্তিকা তনু ধুলায় রেখে,
যেথা সুন্দর গোলাবী পাপড়ি অক্ষয় রসে নিত্য লাল
চলে গেলে সেথা তারি ছায়া মুক্তি পথের আল-হেলাল।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদৎ অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে,
নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে,
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখানো সেখানে অনির্বাণ।

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা ব'য়ে জিলানের বীর, চিশ্‌তী বীর
'রংগিন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দে রর নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিঁদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোনদিন শেষ হবে না জানি।
লাখে শামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।

সুর্মা গভীর আকাশের চোখে অশ্রুসজল বৃষ্টিধারা,
নতুন তারার পথ চেয়ে চেয়ে নীহারিকা হ'ল দৃষ্টিহারা।
বিরাট প্রসার মহা-পটভূমি তোমার বেলায় ইতস্তত
অশেষ সম্ভাবনার পলিতে দুরন্ত মরু ঝড়ের মত
যারা এঁকে আসে নতুন মাটিতে সুদৃঢ় ছাপ পথচলার
দীপ্ত ছুরিতে ভাঁজ কেটে কেটে অসাড় তিমির স্থবিরতার;
তাদের সঙ্গে সালাম জানাই হে মানবতার শাহানশাহ্।
হে নবী! সালাম : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।

[শেষাংশ]

www.pathagar.com

বে-নজীর আহ্‌মদের কবিতা

না'ত

হাজারো ছালাম লহ নবী মুহাম্মদ
দুনিয়া জাহান জপে এ নাম-শহদ।
প্রভাতে জাগিয়া পাখি
এ নামে উঠিছে ডাকি
এ নামে আশেক সাকী
প্রেম গদগদ।

ভোমরা গাহিছে তব
দরুদ নব নব
কত যে তাহার ক'ব
তারিফ বে-হদ।

গাহিছে বাতাস নিতি
তোমারি মধুর গীতি
তোমারি আশেকে তিতি
বহে নদীনদ।

নবীজি নবীজি বলি'
দিবস উঠিছে জ্বলি'
রজনী শিশিরে ঢলি
চুমে তব পদ।

www.pathagar.com

তালিম হোসেনের কবিতা

আল্-আমীন

তোমাকে যেমন করে দেখেছি,
একটি মাত্র কবিতায় যদি
তেমনি করে দেখাতে পারতাম অন্যকেও,
অনেক কবিতা লেখার
বা না লেখার গ্লানি থেকে
আমার তৎক্ষণাৎ মুক্তি হতো।

আজকের মানুষ যদি
এমন কোন সাত-পুরুষের শত্রুকে পেতো-
যার প্রাণনাশের প্রয়োজন জেনেও
মানতে পারতো তাকে
বিশ্বস্ত, সত্যাশ্রয়ী, সুবিচারক বলে,
অনন্যোপায় আত্মহননের পথ থেকে
পৃথিবী ফিরে আসতো।

আমি জেনেছি-
শুধু সমদর্শিতা আর ন্যায়-নীতির
সংবিধান জারী থাকলেই চলে না,
তার চেহারা দেখার একটি দর্পণ চাই;
সে দর্পণ তুমি-
হে আল-আমীন্।
এবং আমি জেনেছি,
সবকিছুর পরেও মানুষের জন্য চাই
প্রেম আর করুণা-
যাকে কোন সংবিধানে বাঁধা যায় না-
তোমার হৃদয় তার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ,
হে রাহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন।

www.pathagar.com

আবদুস সাত্তারের কবিতা

মুহাম্মদ

'মিম হে মিম' ও 'দাল' এই চার অক্ষর প্রতীকে
নিজের দেহটা তিনি 'মুহাম্মদ' বানিয়ে গোপনে
ইশক-জৈতুনে জ্বেলে আল্লাহর সে আলো নিজ মনে
মোরাকাবা করতেন হেরার গুহায়; কোনো দিকে
দৃষ্টি না ফিরিয়ে তিনি মাথার সে 'মিম' নত করে
কেবল 'হামদ' হলে অলৌকিক জ্যোতির মহিমা
মুহূর্তে ছড়িয়ে যেতো বিশ্বের এ সীমা-পরিসীমা
সৃষ্টির অপূর্ব রূপ এ পবিত্র চারটি অক্ষরে।

মিম যদি নতজানু তাহলে হামদ শুধু দেখে
হৃদয়ের আলো জ্বেলে সবখানে অলৌকিক নাম,
যে নামের গুন গায় রাত্রি দিন পবিত্র কালাম–
সে কালাম সর্বক্ষণ সৃষ্টির রহস্যে সব লেখে,
স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে একমাত্র যোগসেতু তাই
মিমকে আনত করে হামদ হলেই সব পাই।

www.pathagar.com

আফজাল চৌধুরীর কবিতা

ফতহুম মুবীন

তোমার কদমতলে দিগ্বিজয় আসন্ন এখন
আকাশে বাতাসে তার রেশ
তুফানের মাঝে তুমি দুর্জয় সারেঙের মতো
দাঁড়িয়েছো বেশ।

এতদিন এই দেহ গড়েছো তো মাংস ও মাছে
শাহাদাত উঁকি দ্যায় কাছে
তোমার ললাটে পাতা রয়েছে সুরের দুরবীন
সমাগত সত্যে তাই ফতহুম্ মুবীন
বিশাল বিজয়
লাৎ ও মানাৎ ওজ্জা, হোবলের মূর্তি আর ভয়
বাতিল এদেশে
মর্দে-মুমীন দল ফের হেসে হেসে
সাইমুমের ঝুঁটি চেপে ধরো
সুপুরুষ কখনোই প্রথার গোলামী করে করে
কাঁপেনা সভয়ে থরো থরো–

এবার লাগাম খোলা তাজির মতোন ছুটে যাও
পদধ্বনি সব
এবার বাতিল তন্ত্রমন্ত্রের কবরে ঢেলে দাও
আল্লাহর গযব।

www.pathagar.com

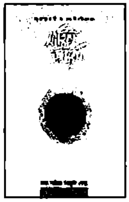

বাংলা-কাব্যে রাসূল (সা)
শাহাবুদ্দীন আহমদ

ব্যক্তি বিশেষকে প্রশংসা করে কবিতা বা গান লেখার রেওয়াজ সারা দুনিয়াতে আছে। যখন কোন মনীষী পৃথিবীতে এমন কোন কাজ করেন যা সাধারণ ধারণার মধ্যে ধারণ করতে পারে না, তখন অতিমানব ভেবে মানুষ তাঁর প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না এবং কবিরাও করেন না। পৃথিবীতে সেই ধরনের অতি অসাধারণ কাজ করে যিনি মানবজাতিকে আলোকিত জীবনে উত্তীর্ণ করেছিলেন তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল-কুরআনুল করীম যাঁকে নির্দেশ করে বলেছেন, 'হে নবী! বল, আমি তোমাদেরই মত মানুষ।' এবং যিনি নিজেও বলেছেন, 'আমি তোমাদেরই মত মানুষ।' কিন্তু এ সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে কখনও সাধারণ অর্থের মানুষ মনে করে না। তিনি মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত ও ওহীপ্রাপ্ত নবী, পয়গম্বর এবং রাসূল এবং তিনি শুধু মানুষের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সকল নবী-পয়গম্বর ও রাসূলদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের কর্মসাধনা, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁর চরিত্র ও বিচারশক্তি, বিবেচনাশক্তি ও বিচক্ষণতা দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন যে, তাঁর তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে পূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করেননি এবং পরেও কখনও জন্মগ্রহণ করবেন না। সে জন্যেই পৃথিবীর নানা ভাষার কবিরা, এমনকি কিছু কিছু অমুসলিম কবিরা ও তাঁদের কবিতায় এই মহামানবের প্রশংসা গীতি লিখেছেন। আমি এখানে বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন, প্রশংসিত হয়েছেন এবং বাঙালী কবিরা– বিশেষ করে মুসলিম কবিরা (তাঁর উপর বাঙালী হিন্দু কবিদের কোন কবিতা চোখে না পড়াতে শুধু বাঙালী মুসলিম কবিদের নাম করছি) তাঁদের কাব্যে তাঁকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন বা তাঁর প্রশংসা করেছেন বা বাংলা কাব্য তাঁর অনুপম আদর্শ ও চিন্তাধারায় কতটা প্রভাবিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

বাংলা ভাষার বাংলা গদ্য হাল আমলের– সম্ভবত পৌনে দুশো বছরের, (আমি সাহিত্য-গদ্যের কথা বলছি) কিন্তু কাব্য হাজার বছরের। এর মধ্যে ইংরেজী চতুর্দশ শতাব্দীর 'য়ুসুফ জুলেখা'র লেখক শাহ্ মুহাম্মদ সগীর থেকে এ বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এ দশকে

www.pathagar.com

যত বাঙালী মুসলমান কবি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের ভিতর প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলিম কবির কাব্যে রাসূল (সা) স্থান লাভ করেছেন– অথবা ঐ সব কবিরা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শে দ্বারা। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্ব মুসলিম মানসে এমন বিস্ময় ও মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছে যে, ইসলামী দর্শনের প্রাচীর টপকে তাঁকে কেউ কেউ এমন আসনে সমাসীন করতে চেয়েছেন– যাকে ইসলামী আইনে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করা যায়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর মহিমার উচ্ছ্বাস ও প্রশংসার এই ছবি আমরা মধ্যযুগের অনেক কবির কাব্যে লক্ষ্য করি। প্রাচীনকালের হিন্দু কবিরা প্রবন্ধ-কাব্য বা মহাকাব্য রচনার আগে দেব-দেবীর প্রশস্তি গাইতেন; ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাওয়া বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করার আগে হিন্দু কবিদের লেখায় এ দেব-দেবী বন্দনার প্রাধান্য দেখা যায়। এমনকি হিন্দুধর্মত্যাগী খৃস্টান মধুসূদন সে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি বলে তিনি তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর শুরু করেন এই দেবী অর্থাৎ সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। কাব্য লেখার এই রীতির অনুসরণে এক আল্লাহবাদী মুসলিম সেই জন্য যে-কোন রচনার শুরুতে আল্লাহর গুণগান এবং সেই সঙ্গে নবী মুস্তাফা (সা)-এর গুণগান করতেন। এখনে বলা উচিত যে, যেহেতু শুধু এক আল্লাহয় বিশ্বাসী হলে মুসলমান হওয়া যায় না, রিসালাতেও মুসলমানদের বিশ্বাসী হতে হয়, সেই জন্য আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম কবিরা রাসূল-প্রশস্তিকে অপরিহার্য বলে ভেবেছেন। এ কারণে রাসূল (সা) মধ্যযুগের বাঙালী মুসলিম লিখিত কাব্যে অপরিহার্য্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছেন।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছ'শ বছর পুঁথি-রচয়িতা মুসলমান কবিরা রাসূল (সা)-এর উপর পঁয়তাল্লিশটার মত কাব্য রচনা করেন : রসূল বিজয়– জঈনউদ্দীন; ওফাতে রসূল, শবে-মেরাজ, রসূল-চরিত, নবী-বংশ, রসূল-বিজয়, জয়কুম রাজার লড়াই– সৈয়দ সুলতান; জঙ্গনামা– নসরুল্লাহ খাঁ; নূরনামা-মীর মোহাম্মদ শফী; রসূল বিজয়-শাহ ফরিদ খাঁ; নূরনামা শেখ পরাণ, রসূল-বিজয়– শেখ চান্দ; নূরনামা– আবদুল হাকিম; রসূল চরিত– মোহাম্মদ জমি; দুল্লাহ মজলিশ, নবীবংশ, নূরনামা– আবদুল করিম খোন্দকার; আম্বিয়াবাণী, নবীনামা– কাজী শফিউদ্দীন (প্রকাশক); কাছাছোল আম্বিয়া– মুন্সী জনাব আলী; খেলাফতনামা– মুন্সী আমীর; খোলাছাতুল আম্বিয়া– এলাহী বক্স দেওয়ান, মৌলুদের পুঁথি– মুন্সী জনাব আলী; কাছাছোল আম্বিয়া– মুন্সী আমীর; মদীনার গৌরব, মোসলেমের বীরত্ব– মীর মশাররফ হোসেন; খায়ের বরকত– আবদুল গফুর; হালাতুন্নবী– মুন্সী সাদেক আলী; নূরনামা, হুলিয়ানামা, খোলাসাতুল আম্বিয়া– মুন্সী খাতের মোহাম্মদ; নূরনামা– আবদুল করিম; তরিকায়ে মোস্তাফা– মুন্সী ফসিহ্দ্দীন; নূরনামা- দেবান আলী; জঙ্গে খায়বর– দোস্ত মোঃ চৌধুরী; তাওয়ারীখে মোহাম্মাদী– মৌঃ মোহাম্মদ ছায়ীদ; জঙ্গে খয়বর– মুন্সী জনাব আলী; রসূলের মেরাজ– কবি সৈজুদ্দীন; নাজাতে কাওসার; নাজাতে

www.pathagar.com

কাওসার, মাযারে ফিরদাওস– সাইয়িদ আবদুল কাদির; মেহরাজনামা– শাহ জোবেদ আলী; কেরামতে মুহাম্মদ– মহাম্মদ– মওলবী আঃ সোহবহান; জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে আলী– মৌঃ আজহার আলী। এই কাব্যসমূহে (সঙ্গে কবিদের নাম দেওয়া হয়েছে) রাসূল প্রধান বিষয় বা মূল বিষয় হলেও– দু'একটি কাব্যের ঈষৎ ভিন্ন নাম সত্ত্বেও– যেসব কাব্য ভিন্ন বিষয়ে রচিত যেমন : দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু, নায়েব উজীর মুহাম্মদ খানের 'মাকতাল হুসায়ন', শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইছুফ জলিখা', দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী', সৈয়দ মর্তুজার 'যোগ-কলন্দর', হায়াত মাহমুদের 'সর্বভেদবাণী', 'হিতজ্ঞান বাণী', 'আম্বিয়া বাণী' এবং সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবর্তী'-এসব কাব্যে রাসূল-প্রশস্তি বন্দনা বিষয় হিসাবে স্থান লাভ করেছে।

মোটকথা, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক যে সব কবি কাব্য-পুঁথি রচনা করেছেন তাঁরা সবাই মুখবন্ধে রাসূল-বন্দনা করেই তাঁদের মূল কাহিনী বর্ণনা শুরু করেছেন। পূর্বে কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির নামোল্লেখ করেছি, নীচে আরও কিছু কবির নামোল্লেখ করলাম। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে এইসব কবিদের মধ্যে আরও ছিলেন– মুজাম্মিল, আফজাল আলী, শাহ বারিদ খান, দোনা গাজী, মুন্সী মালে মুহাম্মদ, ফয়জুল্লাহ, শায়খ পরাণ, নসরুল্লাহ খান, মোহাম্মদ সগীর। সপ্তদশ শতকে ছিলেন– মরদন, কুরায়শী মাগন ঠাকুর, শায়খ মুত্তালিব, আবদুল করীম খন্দকার, আবদুল হাকীম, লওয়াজিশ খাঁ, সাইয়িদ মুহাম্মদ, কবর আলী, আবদুন নবী। একইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর আলী রাজা, হায়াত মাহমুদ, শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজার কাব্যের মুখবন্ধে রাসূল প্রশস্তি দীপ্যমান। একই ঐতিহ্য রূপায়িত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মুন্সী মালে মোহাম্মদ, তাজউদ্দীন মোহাম্মদ, খাতের মোহাম্মদ, মুন্সী জান মোহাম্মদ, গরী বুল্লাহ্, জয়নুল আবেদীন, ফকীর মুহাম্মদ, মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ এবাদত খাঁ, এবাদত উল্লাহ্, রেজাউল্লাহ্, আমির উদ্দিন, আশরাফ আলী প্রমুখের কাব্যে।

আজিমুদ্দীন আহমদ, জনাব আলী, মুহাম্মদ মূসা বিরচিত 'মজমুয়ে ফতুহ শ্বাম ও ফতুহুল মেছের' খাতের মোহাম্মদের 'ছহি বড় শাহনামা' মুন্সী আবদুর রহীমের 'গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুঁথি', জনাব আলী ও সাদ আলী 'শহীদে কারবালা', ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর 'রূপজালাল', রেজাউল্লাহ, আমির উদ্দীন, আশরাফ আলী রচিত 'কাছাছোল আম্বিয়াতে' পূর্বসূরীদের রাসূল বন্দনা রীতি অনুসৃত হয়েছে। এ প্রবন্ধে সকলের রাসূল-বন্দনার রীতি ও পদ্ধতিকে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। আমি মাত্র প্রসিদ্ধ কয়েকজন কবি শাহ বারিদ খান, নায়েব উজির, মুহাম্মদ খান, দৌলত উজীর, বাহরাম খান ও আলাওলের কাব্যগ্রন্থ থেকে নমুনাস্বরূপ কিছুঅংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

www.pathagar.com

১. নূর মোহাম্মদ হৈলা যার হেন্তে পয়দা হৈলা
সৃষ্টি হৈলা এ তিন ভুবন।
যার হেতু নিরঞ্জন দুনিয়া করিল সৃজন
আকাশ পাতাল মর্তস্থান।
(শাহ্ বারিদ খান ॥ হানিফার দিগ্বিজয়)

২. মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পাপীজন পরিণামে যাইবে তরিয়া ॥
দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করতে তাঁর সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেক এ চৌদ্দ ভুবন ॥
অনিল সলিল সূর্য এ নভোমণ্ডল
হযরত কারণে সৃষ্ট জানহ্ সকল ॥
বন্দনায় নবী পদ নির্ণয় না হয়।
এ কারণে গুণীগণ ক্ষান্ত দিল তায় ॥
(মুহাম্মদ খান : মাকতাল হুসায়ন)

৩. প্রণামহু তান সখা মহাম্মদ নাম।
এ তিন ভুবনে নাহি যাহার উপামা ॥
আদি-অন্তে মহাম্মদ পুরুষ অতুল।
স্থল শূন্য না আছিল, আছিল রসূল ॥
আকাশ-পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন।
যার প্রেমরস হন্তে হইতেছে সৃজন ॥
উম্মত সহায় তুমি পরম সারথী।
পাপ তাপ আপদেত তুমি মাত্র পতি ॥
নূরনবী কাণ্ডারী আছ এ যেই নাএ।
সাগর তরঙ্গ-ভয় নাহিক তথা এ ॥
(দৌলত উজীর বাহরাম খান ॥ লায়লী মজনু)

৪. পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
চাচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচারল ॥
নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতিমূলে ত্রিভুবন নিরক্ষিলা ॥
তাহান পীরিতে প্রভু সৃজিলা সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥
–(আলাওল ॥ পদ্মাবতী)

এই উক্তিগুলোর মধ্যে একটি আশ্চর্য মিল আছে; প্রত্যেকে এই কথা বলেছেন যে মুহাম্মদ (সা) সৃষ্ট হয়েছিলেন বলেই গোটা বিশ্বভুবন সৃষ্টি হয়েছে। যদি তার জন্ম না

www.pathagar.com

হ'ত বিশ্ব-দুনিয়াই সৃষ্টি হত না। মুসলিম কবিদের কাছে এটা নিছক কবিত্ব ছিল না। এটা ছিল অনাক্রান্ত সত্য-পরম বিশ্বাস। সেজন্যেই পুঁথি-রচয়িতা সকল কবি ব্যতিক্রমহীনভাবে ঐ একই কাব্য উচ্চারণ করেছেন– 'মুহাম্মদ আল্লার রসূল সখাবর/যাঁর নূরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর ॥' (সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী; 'যত জাতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন/ মহাম্মদ হন্তে কৈলা তা সব রতন ॥' –(ইছুফ জলিখা ॥ শাহ মোহাম্মদ সগির)

বিস্ময়ের ব্যাপার নয় বিংশ শতাব্দীর কবি কাজী নজরুল ইসলাম রাসূল (সা)-এর উপর লিখিত তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে এই ঐতিহ্য অনুকরণ করতে দ্বিধা করেননি। উপস্থাপনা ও আঙ্গিকের পার্থক্য বাদ দিলে– (নজরুলের অতুলনীয় রচনা কৌশলের সঙ্গে পূর্ব-সূরীদের লেখার কোন তুলনা হয় না) বক্তব্যের মিল দৃষ্টি এড়ায় না। 'মরু ভাস্কর'-এর 'অনাগত' পরিচ্ছেদে আদম সৃষ্টির কাহিনীর উল্লেখ করে নজরুল লিখেছেন–

সৃজিয়া মানব আত্মা তাহার দানিল মানব দেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পাশিয়া মাটির গেহে!
বলে, 'প্রভু আমি রইতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহি কেমন করে!'
আদমের মাঝে বারে-বারে যায় বারে-বারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলে প্রভু, 'ভয় নাই, দিনু আমার যে প্রিয়তম
তোমার মাঝারে জ্বালিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।
আমা হ'তে ছিল প্রিয়তর যারা আমার আলোর আলো
মোহম্মাদ সে, দিনু তাহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো।'

এখানে যে তাত্ত্বিক কথা বলা হয়েছে পূর্বসূরী কবিরা সেই বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব দিয়ে রাসূল (সা)-এর গুণ-গান করতেন। যাই হোক রাসূল (সা)-এর উপরে বাউল কবিরাও বেশ কিছু গীতি কবিতা লিখেছেন। এইসব বাউল কবিদের মধ্যে আছেন লালন শাহ, পাগলা কানাই, শীতলাং শাহ, আবদুল জব্বার, ইয়াছিন, শেখ ভানু, মঙ্গল শাহ ও মুসলিম শাহ্ প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যে যে মুর্শিদী সঙ্গীত আছে– তার মধ্যেও রাসূল (সা)-কে মুর্শিদ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস আছে। তিনিই সূফীদের আধ্যাত্মিক গুরু। বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম লেখক মুনশী মেহেরউল্লাহ, মীর মশাররফ হোসেন, দাদ আলী, মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) রাসূল (সা)-এর উপর গীতি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার পর বাংলা কবিতার রূপ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যম পর্যায় থেকে কবিতার টেকনিক বা আঙ্গিকগত কলা-কৌশল বদলাতে শুরু করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র,

www.pathagar.com

নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ কবিতার আঙ্গিককে ঢেলে সাজান। তার পরিণত রূপ আমরা বিংশ শতাব্দীতে দেখি। আধুনিক মুসলিম কবিদের আবির্ভাব হল। বাংলা কবিতায় দেখা দিলেন গোলাম মোস্তফা, শাহদাৎ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যিনি তিনি নজরুল ইসলাম। এবং মুসলিম সমাজের জন্য আনন্দের বিষয় মোসলেম ভারতে প্রকাশিত দ্বিতীয় কবিতাটিতেই– 'খেয়াপারের তরণী'তে তিনি রাসূল (সা) এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ চার সাহাবীদের গুণের মহিমা রাখলেন। আমরা দেখলাম তিনি যখন লিখছেন–

পূর্ণ-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি মর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহমদ; তরী ভরা পাথেয়!

তখন মনে হল তাঁর মহান পূর্ব-সূরীদের হৃদয়ানুভূতি তাঁর হৃদয়সত্তায় নতুন করে জেগে উঠেছে। বাংলা ১৩২৭-এর অগ্রহায়ণে (১৯২০-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর) মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হল নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং রাসূল (সা)-এর উপর লিখিত বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতা 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম্ (আবির্ভাব)'। ঠিক এক বছর পরে, ১৩২৮-এর অগ্রহায়ণে মোসলেম ভারতে, একই মানের ভাব-গম্ভীর আর একটি কবিতা 'ফাহেতা-ই দোয়াজ দাহম (তিরোভাব)' প্রকাশিত হল। পরবর্তী সময়ে গোলাম মোস্তফাকে 'বিশ্বনবী' (১৯৪২-এ প্রকাশিত) শিরোনামে দীর্ঘ কবিতা লিখতে দেখেছি; আবদুল কাদিরকে 'হযরত মোহাম্মদ'; 'মিল্লাদুন্নবী', 'অন্তর্ধান' লিখতে দেখছি; এবং ফররুখ আহমদকে লিখতে দেখছি 'সিরাজাম মুনীরা।' কিন্তু 'ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম্'-এর উজ্জ্বলতাকে কেউ ম্লান করতে পারেননি; এমনকি নজরুল ইসলামের স্বরচিত 'মরু-ভাস্কর' (অসমাপ্ত) কাব্যগ্রন্থ যাদুকরী বহু পংক্তি উপহার দিলেও 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম'-এর চোখ-ধাঁধানো প্রভাকে আড়াল করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করতে চাই, নজরুল ইসলামেরও এক বছর আগে কবি শাহাদাৎ হোসেন ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠের (১৯১৯-এর মে) সওগাত-এ 'হযরত মোহাম্মদ (সা)' এ শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও সংকলিত ইসলামী কবিতা; শাহাদাৎ হোসেন-এ মুদ্রিত)। অনেকের কাছে অপরিচিত বলিষ্ঠ ছন্দে লেখা এই কবিতার (সম্ভবত আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল (সা)-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা প্রথম কবিতা) কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি;

তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীরে ধ্যানে,
সাক্ষাত লাভি' স্বর্গ দূতেরে ধরিলে মহান সত্যজ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সেজন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যার
জানলে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য আর।
ঘুচিল আঁধার, হাসিল বিশ্ব, নূতন অরুণ আলোক-পাতে,
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতি : হেরিল মানব জীবন-প্রাতে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, রাসূল (সা)-এর উপর কবিতা ও গীতি কবিতা রচনায় এবং প্রবন্ধ কাব্য লেখায় যাঁর পারদর্শিতা ও কীর্তি অতুলনীয় তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় না'ত নামধেয় যে রাসূল প্রশস্তি লিখেছেন– (সংখ্যা আশির উর্ধ্বে)-এই কাব্য-গীতির বিশ্ব-সাহিত্যে তুলনা থাকলেও তা অতিবিরলতা অতিক্রমী নয়।

নজরুল ইসলামের পর রাসূল (সা)-কে নিয়ে হৃদয়ে অবিরাম গুঞ্জরিত হওয়ার মত অন্ততঃ একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন ফররুখ আহমদ। অধিকাংশ বাঙালী মুসলিম কাব্য পাঠকের কাছে পরিচিত মধুর শব্দে ও সুরেলা আবেগ-স্পন্দিত ছন্দে লেখা এই কবিতাকেও ফররুখ-পরবর্তী কোন বাঙালী বা বাংলাদেশী মুসলিম কবি লিখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আসলে পাশ্চাত্য আধুনিকতা সংক্রমিত বাংলা কবিতা আধুনিক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে ধর্মভাবসম্পন্ন কবিতা লেখার দিক থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একা শুধু হিন্দু কবিরা নন বাঙালী মুসলিম কবিরাও ব্যক্তিগত ভাবনা-অনুভাবনা ও মুহূর্তের ভাবনাকে, সমস্যা-জটিল বিশ্বের বিজ্ঞান মনস্কতায় সম্পর্কিত ভাবনাকে, কবিতার রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা ধর্মের প্রতি অনুরক্তিকে উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু মনে হয় স্রোত-তাড়িত সময় মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে বিবর্তনের সূচনা করছে এবং সাররিয়ালিজমের অনুরাগী কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের মত আধুনিক কবি লিখেছেন 'সকল প্রশংসা তাঁর'-এর মত কাব্যগ্রন্থ– যেখানে রাসূল (সা)-এর উপর মুদ্রিত হয়েছে চারটি চিত্তাকর্ষক চতুর্দশপদী।

আসলে ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের এবং ষাট, সত্তর ও আশির দশকের কবিরা ধর্মের প্রতি বিপুল অনুরাগ হারালেও কোন কোন কবি যে ধর্মের বুকের তাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি, ধর্মের উপর লিখিত তাঁদের কিছু কিছু কবিতা তার প্রমাণ। কবি আবদুস সাত্তার সম্পাদিত ও সংকলিত 'নাত যুগে যুগে' নামে যে বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমরা রাসূল (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখছি নিম্নলিখিত আধুনিক কবিদের :

চল্লিশের দশক

ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন রওশন ইজদানী, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, আনিসুল হক চৌধুরী, আজিজুর রহমান, সাঈদ সিদ্দিকী, আ.ক.শ নূর মোহাম্মদ, কাজী গোলাম আহমদ, আবদুর রশীদ খান।

পঞ্চাশের দশক

আবদুস সাত্তার, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, ফারুক মাহমুদ, নূরুল আলম রইসী, শেখ ফজলুর রহমান, আবদুল হালীম খাঁ, সৈয়দ শামসুল হুদা।

www.pathagar.com

ষাটের দশক

আফজাল চৌধুরী, ফজল-এ-খোদা, মসউদ-উশ-শহীদ, খালেক বিন জয়েন উদ্দীন, আবদুল মুকীত চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, ইমরান নূর, শমসের আলী।

সত্তর ও আশির দশক

রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, মুকুল চৌধুরী, মতিউর রহমান মল্লিক, বুলবুল সরওয়ার, মোশাররফ হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজ, গাজী রফিক।

এ সংকলনে যাঁদের কবিতা যায়নি কিন্তু যাঁরা রাসূল (সা)-কে নিয়ে উদ্দীপ্ত কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামটি আবদুল মান্নান সৈয়দের। আর অনুজদের মধ্যে আছেন সোলায়মান আহসান ও হাসান আলীম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিশ ও ত্রিশের দশকের রাসূল (সা)-এর প্রশস্তিগাথা রচনাকারীদের মধ্যে আমি গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও আবদুল কাদিরের নামোল্লেখ করলেও আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করিনি। যাঁদের মধ্যে আছেন জসীম উদ্‌দীন, বে-নজীর আহমদ, কাদের নওয়াজ, মোহাম্মদ সুলতান, আজহারুল ইসলাম এবং সৈয়দ আসফউদ্দৌলা সিরাজী।

এখানে বলা আবশ্যক, কবিতার জন্যে বহু প্রকারের বিষয় আছে যেমন ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম, ধর্মপ্রেম তেমনি আছে আল্লাহপ্রেম ও রাসূল-প্রেম। রাজনৈতিক কারণে ধর্মপ্রেম, আল্লাহ প্রেম ও রাসূল প্রেম সাময়িকভাবে বাংলাকাব্যে বিরল-দৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সময়-চক্রের আবর্তনে সেই প্রায় অপসৃত বিষয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটছে– রাসূল (সা) ও পুনরায় তাঁর অনাতিক্রম্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। কারণ এই পৃথিবীতে তিনিই তো সেই একমাত্র মানুষ যাঁর সম্বন্ধে নজরুল বলেছেন–

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন
এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন
মানুষের লাগি চির দীন বেশ ধরিল যেজন
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন।

এই চারটি লাইনের মধ্যে নিহিত আছে ইসলামী দর্শন ও আদর্শের সারাৎসার– যার থেকে নতুন ও অভিনব কোন জীবনাদর্শ বা জীবনদর্শন কোন মহান মনীষী দিতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর শান্তির জন্যে কল্যাণকামী মানুষ যা চায়, তার সবই তো এ বাণীর মধ্যে জাগ্রত। তাইত ফররুখ আহমদ বলেছেন–

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল। ◆

www.pathagar.com

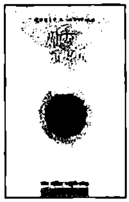

মুহাম্মাদ (সা) : এক অনন্য নবী

ড: সদরুদ্দিন আহমেদ

"আমরা আপনার পূর্বে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" (কুরআন ৪০ ঃ ৭৭)

যে সব নবী-রাসূলদের কথা কুরআনে বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) নিঃসন্দেহে অনন্য, তিনি কেন অনন্য তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

নবী রাসূলদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা) সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কুরআনে যে সব নবীর কথা বলা হয়েছে তাদের পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত সেখানে নেই, কারণ কুরআন কোন জীবনী গ্রন্থ নয়। তাদের সম্মন্ধে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আমাদের জানা নেই। এ কথা মুহাম্মাদের (সা) অব্যবহিত পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আ) সম্বন্ধেও সত্য যদিও বাইবেল তার জন্য শিষ্যের লেখা তার জীবনী তবু এই জীবনীগুলোতে বিবৃত তথ্যের মধ্যে অনেক গরমিল আছে। The 100 গ্রন্থের রচয়িতা Michael H. Hart লিখেছেন : Most of the information that we have about Jesus Christ is uncetain পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সা)এর জীবনী বিস্তৃভাবে ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর জীবনীর উৎস তিনটি ঃ (১) কুরআন (২) হাদিস ও (৩) মাগাজী সাহিত্য। কুরআন তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছিল এবং সেখানে তাঁর সম্মন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে, যেহেতু কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা অবিকৃত অবস্থায় আছে তাই সে সব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্মন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। হাদিস মহানবীর কথা ও কর্মকাণ্ডের সংকলন এবং এই সংকলন এমন কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে যে তার

www.pathagar.com

সত্যতা সম্মন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সংগৃহিত তথ্য এভাবে যাচাই-বাছাই করা হয় না, বা করা সম্ভব নয়। মাগাজী সাহিত্যের অনেকটারই রচয়িতা হাদিস বর্ণনা কারীরা নিজে, তাই মাগাজী সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা যায় না। বস্তুত মুহাম্মাদ (সা) কোন কল্পকাহিনীর নায়ক নন, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যার জীবনের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিবৃত হয়েছে এবং তিনি যে নবী রাসূলদের মধ্যে অনন্য, এটি অন্যতম কারণ।

মহানবীর জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তিনি এতিম হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। শৈশবে তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। বালক বয়সে তিনি মেষ চরিয়েছেন, যৌবনে সমাজ সেবা করেছেন, সত্যবাদী হিসেবে আল-আমিন উপাধি পেয়েছেন, ব্যবসায়ী হিসেবে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সততার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে ধনী বিধবার সু-প্রসংশা ও আস্থা অর্জন করেছেন এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন বিস্তার বয়সের ব্যবধান সত্বেও। সংসার জীবন যাপন করেছেন আর দশজন সাধারণ মানুষের মত। স্বামী হিসেবে, পিতা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু প্রাচুর্য তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেনি। হৃদয়ের গভীরে তিনি বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছেন তার সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি সমাজ থেকে দূরে গিয়ে সাধনা করেছেন নীরবে-নিভৃতে। অবশেষে সত্যের বাণী তাঁর কাছে অবর্তীণ হলো। সেই বানী প্রচারের জন্য তিনি প্রত্যাদৃষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে কিছু লোক তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম লোকে তাকে পাগল বলে উপহাস করতো। কিন্তু যতই মুমিনের সংখ্যা বাড়তে লাগলো ততই তাঁর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বেড়েই চললো। অবশেষে জীবনের উপর হুমকি এলো। তিনি মদিনায় হিজরত করলেন। সেখানে তিনি বিপুল সংবর্ধনা পেলেন। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু মক্কার কোরায়েশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর প্রচারিত সত্যের আলো নিভিয়ে দিতে চাইলো। তখন তিনি সংগ্রামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অনেকগুলো যুদ্ধ করলেন, অবশেষে মক্কা জয় করে সমগ্র আরবের উপর কতৃত্ব স্থাপন করলেন। সমাজ গড়লেন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন। একটা মানুষের জীবনে যত রকমের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তার সবই তিনি অর্জন করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় কিভাবে চলতে হয় কি আচার-আচরণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেলেন। অন্য কোন নবী-রাসূল বা মহাপুরুষ তা দেখাতে পারেননি। এদিক দিয়েও তিনি অনন্য। মুহাম্মাদ (সা) একমাত্র নবী যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত মিশন বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(সা) তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে একটা আদর্শ রেখে গেছেন যার তুলনা অন্য কারুর মধ্যে পাওয়া যায় না।

মুহাম্মাদই (সা) একমাত্র নবী বা মহাপুরুষ যিনি অনেকগুলো বিবাদমান গোত্রকে একীভূত করে একটি জাতিতে পরিণত করেন। যে জাতি মাত্র একশো বছরের মধ্যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, একটা সভ্যতার গোড়াপত্তন করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা এখনো রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। জনৈক ঐতিহাসিক একে 'an unfathomed mystery' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় অবদান হলো এই যে, তিনি মানুষের চিন্তা-চেতনায় এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ মানবিক গুনাবলীতে চমক সৃষ্টি করেছিল। ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মুসলমানরা কখনো রাজ্যস্থাপন করেনি, অথচ সে সব দেশে অগণিত লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। এ থেকে প্রমাণ হয় আরব বণিকদের প্রভাবে, তাদের আচার-আচরণে ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা মুসলমান হয়েছিল। এই মানবিক গুনাবলী, এই চরিত্র মাধুর্য সৃষ্টিতে মহানবীর অবদান অনন্য। তিনি একমাত্র নবী, যিনি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রেখে গেছেন। যে গ্রন্থ ১৪০০ বছর যাবৎ সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়ে গেছে এবং যে গ্রন্থ আল্লাহর সরাসরি বাণী কুরআন মহানবীর কাছে মৌখিকভাবে অবতীর্ণ এবং এই গ্রন্থ যে মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়-এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে কুরআনে উল্লেখ আছে একাধিকবার। যদি মুহাম্মাদ (সা) এই গ্রন্থের লেখক হতেন তাহলে এ ধরনের চালেঞ্জ দেওয়া তাঁর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হতো। কারণ যারা তাঁর নবুয়তের দাবি স্বীকার করেনি তারা এ দাবী নস্যাৎ করার সুযোগ ছাড়তো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ দাবী এখনো Unchallenged রয়ে গেছে। H.A.R. Gibb তার Arabic literatur : An Introduction গ্রন্থে লিখেছেন ঃ The Quran has neither forerunners nor successors in its own idiom. অর্থাৎ কুরআনের আগে ও পরে অনুরূপ ভাষা দেখতে পাওয়া যায় না। A.J. Arberry Zvi The Quran Intrpreted গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ I have no doubt at all that the Quran is a supernatural product. এ কথার সমর্থনে তিনি দু'টি যুক্তি পেশ করেছেন। প্রথমতঃ কুরআনের ভাষায় অপূর্ব ধ্বনি মাধুর্য। তিনি বলেন যে, এমন কোন বিষয় নেই যেটা কুরআনে আলোচিত হয়নি এবং বিষয়বস্তু ভেদে ভাষায় পরিবর্তন এসেছে কিন্তু আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত a haunting thythm, a mysterious compelling beauty and arresting hypnotic power আছে যেটা তিনি পৃথিবীর অন্য

www.pathagar.com

কোন গ্রন্থে পাননি। দ্বিতীয়তঃ হাদিসে যেটা মহানবীর কথা বলে আমরা জানি, যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে কুরআনের ভাষার কোন মিল নেই। উভয় ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান।

শুধু ভাষাই বা বলি কেন? কুরআনে বিশ্বকোষ সমতুল্য জ্ঞান আছে; ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, নীতিকথা, আধুনিকতা, ইত্যাদি। মুহাম্মাদ (সা) নিজে উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন এবং আরব তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কেন্দ্র ছিল না অথচ এই জ্ঞানের উৎস কি? এ নিয়ে মহানবীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু থিওরী দাঁড় করানো হয়েছে। তাঁর সমসাময়িকরা অভিযোগ করতো তিনি মৃগী রোগী ছিলেন; রোগের আক্রমণ হলে এসব কথা বেরিয়ে আসতো ও তিনি যাদুকর ছিলেন। অন্য কোন ব্যক্তি তাকে এসব কথা শিখিয়ে দিয়ে যেতো এসব অভিযোগের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। যে তাচ্ছিল্যের ভাষাতে তা বলা হয়েছে– সেই তাচ্ছিল্যের ভাষাতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর অনেকগুলোর জবাবও কুরআন দিয়েছে। Garry Miller এর ভাষায় : The Quran has answered its own crites. (A Concise Reply to Christianity) পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে অবিশ্বাসীরা কি বলছে, কি অভিযোগ উত্থাপন করছে তার উল্লেখ থাকে না। কিন্তু কুরআন নিঃসংকোচে অভিযোগকারীদের বক্তব্য তাদের ভাষাতেই তুলে ধরেছে এবং এর অসারতা প্রতিপন্ন করেছে।

বর্তমান যুগে কুরআনের উৎস সম্মন্ধে যে সব থিওরি দাঁড় করানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত Catholic Encyclopedia লিখেছে ঃ We have put forward many theories about the sources of the Quran but today no sensible person believes the theories and this leaves us in some difficulty. প্রকারন্তরে, এই বিশ্বকোষ স্বীকার করছে যে, কুরআনের কোন উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এর ফলে তারা (খৃস্টানরা) কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন। মোট কথা, তারা কুরআনের কোন উৎস খুঁজে পাচ্ছেন না আবার মুহাম্মাদ (সা)কে কুরআনের লেখক বলেও প্রমাণ করতে পারছেন না। কুরআন কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়, এটি একটি দিক নির্দেশনা মূলক গ্রন্থ (a book of guidance) অথচ এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপস্থিতি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এ সম্বন্ধে মরিস বুকাইলী-এর The Bible the Quran and Science গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এর মধ্যে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যা সপ্তম শতাব্দির একজন লোকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

ঐ সময় পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞান সম্মন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। বাইবেলে এইসব

www.pathagar.com

ভ্রান্ত ধারণার অনেক নজির আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তম শতাব্দির গ্রন্থ হলেও কুরআনে তৎকালীন সময়ের কোন ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। বরং এমন অনেক তথ্য আছে যা অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে, মরিস বুকাইলী-এর বই-এর শেষ কথাটি হলো ঃ The Quran is a challenge to human explanation অর্থাৎ এই গ্রন্থ মানুষের রচনা এটা প্রমাণ করা কঠিন।

বহু অমুসলিম মনীষী মহানবীর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রশংসা বাণী আমরা অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে থাকি, কিন্তু আমরা সম্ভবত ভুলে যাই যে আল্লাহই মুহাম্মাদ (সা) সম্বন্ধে সর্বোচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁকে সিরাজম মুনিরা বা প্রোজ্জ্বল প্রদীপ বলে অভিহিত করেছেন। কথাটা একটি রূপক (Metaphor)। সমস্ত পৃথিবী যখন অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন তিনি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তাঁর আবির্ভাবে সে অন্ধকার দূরীভূত হয় যেমন প্রোজ্জ্বল প্রদীপের আলোতে অন্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁকে কুরআনে উসওয়াতুন হাসানা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। সর্বপরি আল্লাহ তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন সমস্ত পৃথিবীর জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর হয় না।

তাই আমরা যারা তাঁর উম্মত বলে দাবি করি তারা কতই না ভাগ্যবান। কিন্তু শুধু উম্মত বলে দাবি করাটাই যথেষ্ট নয়। তাঁর আদর্শ অনুসরণ এবং কুরআনে উল্লেখিত জীবন বিধান সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমরা ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করতে পারি। ◆

www.pathagar.com

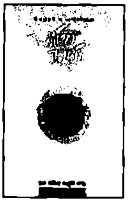

মহানবীর উসওয়াতুন হাসানাহ

আবদুল মান্নান তালিব

খৃষ্টীয় ছয় শতকে দুনিয়া জোড়া ছিল জাহেলিয়াহর প্রাধান্য। জীবন ও জগত সম্পর্কে নবীদের শেখানো দর্শন ও বিধান তখন মানুষ ভুলে গেছে। মানুষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের প্রভুত্ব। তওহীদের স্থান দখল করে নিয়েছে শিরক। পাপাচার পরিণত হয়েছে পুণ্যে। ক্ষমতাহীনদের ওপর ক্ষমতাবানদের নির্মম জুলুম অত্যাচার চলছে অহর্নিশ। তার বিরাম নেই। সাধারণ মানুষকে শোষণ করে করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে একদল শোষক। দুর্নীতির সয়লাবে ভেসে গেছে সুনীতি। নারী তখন ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটানোই তার জীবনব্রত। বিত্তবান আর ক্ষমতাবানদের খিদমতের জন্য নিয়োজিত থাকতো ক্রীতদাস। অন্যান্য পশুর মতো দাস মানুষ বেচাকেনা হতো সকল দেশে। মনিব বদল হতো, বদল হতোনা তার ভাগ্য। শাসকদের খেয়াল খুশিই হতো আইনের উৎস। সাধারণ লোকদের উপর আইন প্রয়োগ হতো নির্মমভাবে। বিত্তবান আর ক্ষমতাবানরা ছিল আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মদ খেয়ে, মাতলামী, নারীদেহ নিয়ে উল্লাস আর জুলুম শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়াই ছিল ক্ষমতাবানদের প্রধান কাজ।

নিঃস্ব মানুষের তখন চরম দুর্দিন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে তাদের প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। বিত্তবানদের দ্বারে দ্বারে চলতো জীর্ণশীর্ণ কংকালসারদের মিছিল। কোথাও ভাগ্যে জুটতো দু'টুকরো শুকনো রুটি। কোথাও তাড়া খেতো অবাঞ্ছিত কুকুরের মতো। বিবেক যাদের তখনো মরে যায়নি– তাদের কাছে বেসুরো মনে হতো প্রচলিত জীবনধারা। সবকিছুই মনে হতো বড্ড গোলমেলে। কিন্তু প্রতিকার কি? বিকল্প কি? তাদের জানা ছিলনা।

এই ঘোর আঁধারে মানবতার চরম দুর্দিনে আলোর মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন একজন মানুষ। মানুষ পিতার ঔরসে মানুষ মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম। মানুষের মতোই

www.pathagar.com

তিনি শ্বাস প্রশ্বাস নেন। মানুষের মতোই মাটির পৃথিবীতে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া করেন। মানুষের সুখ দুঃখের সাথে একাত্ম হয়ে যান। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেন। উপলব্ধি করেন। প্রতিকারের উপায় খোঁজেন। নিজ স্বভাবে চেষ্টাও করেন কিছু প্রতিকারের। কিন্তু তাতে মানবতার উন্নয়ন ও মহাপতন ঠেকানো সম্ভবপর নয় বলে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি আলোর সন্ধান করতে থাকেন। সাধনা করতে থাকেন সত্যের।

একদিন পেয়ে গেলেন সত্যের সন্ধান। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মানুষ মানুষের প্রভু নয়। কোনো মানুষ অন্য মানুষের গোলাম নয়। মানুষ একমাত্র আল্লাহর গোলাম। পৃথিবী ও বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে কারোর কোনো একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সবই একমাত্র আল্লাহর। যে যা কিছু কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে সে জন্য তাকে আল্লাহর কাছে দায়ী থাকতে হবে। একদিন আল্লাহর দরবারে তাকে এজন্য বিচারের সম্মুখীন হতে এবং জবাবদিহি করতে হবে। কেউ কারোর হক ছিনিয়ে নিতে বা আত্মসাত করতে পারবেনা। প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীকে দিতে হবে মর্যাদার আসন। তাদেরকে দিতে হবে অধিকার। সব দুর্নীতি, অবিচার, অন্যায় ও পাপাচারের করতে হবে মূলোৎপাটন। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ খতম করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে ন্যায় ও সুবিচার। সমস্ত মানুষ এক আল্লাহর বান্দা। তারা পরস্পর ভাই ভাই।

মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী উপাসনা আরাধনা পূজা করবে। আর কারোর নয়। মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কারো ইবাদত করার জন্য নয়। মানুষের সমস্ত পাপ ও গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত ও পূজা করলে তা মাফ করা হবেনা। কারণ আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা। বাকি সবাই সৃষ্টি। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর মধ্যে সামান্য পরিমাণও সৃষ্টিগুণ নেই। আল্লাহ সমস্ত বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। এতে কেউ তাঁকে সাহায্য করছেনা। মানুষ যাকিছু করছে এর সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত। তাই মানুষ অনেক কিছু করতে চেয়েও করতে পারেনা। আবার একদিন আল্লাহ এ সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন এবং সমস্ত মানুষকে বিচারের কাঠগাড়ায় দাঁড় করাবেন। সেদিন একমাত্র আল্লাহই হবেন বিচারক। আর কারোর কোনো টুঁ শব্দটিও করার ক্ষমতা থাকবেনা। মানুষের প্রত্যেকটি কাজের চাক্ষুষ প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদ তার সামনে পেশ করা হবে। তার শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ, তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, পৃথিবীর গাছ-পালা, পত্র-পল্লব, পুকুর-নদী-সাগর, পানি, বাতাসের অণু ও ইথারের প্রতিটি কণা এবং তার মধ্যে সংস্থাপিত ইলাহী মুভি ক্যামেরার ছবি তার সমস্ত কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরবে। তার পক্ষে সত্য কথাটি বলা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবেনা।

www.pathagar.com

চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো সর্বত্র। সত্য সন্ধানীরা খুঁজে পেলো মুক্তিপথ। জালিমেরা শংকিত হয়ে ভাবলো, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব বুঝি আর রইলোনা। শুরু হলো সত্য আর মিথ্যার লড়াই। জুলুম নিপীড়ন বরদাশত করে সামনে এগিয়ে চললো ইসলামী কাফেলা। সমস্ত বাধার পাহাড় ধূনা তূলোর মতো উড়ে গেলো তাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সামনে। খরস্রোতা নদী ও সাগরের ফুঁসে ওঠা তরংগ তাদের সামনে নতি স্বীকার করলো। বনের হিংস্র পশুরা হিংসা ভুলে গেলো। তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ালো।

পৃথিবী থেকে জালেম, অসৎ, প্রতারক মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব খতম হয়ে গেলো। প্রতিষ্ঠিত হলো একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব। এলো বিশ্বমানবতার সুদিন। মানুষ আর মানুষের গোলাম রইলোনা। মানুষ হলো আল্লাহর গোলাম। মানুষ হলো আল্লাহর বান্দা। অন্য কোনো মানুষের বান্দা নয়। বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-অধিকারহারা মানুষেরা বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে ঘোষণা করলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, আল-লা-তাবুদূ ইল্লা ইয়্যাহ, যা-লিকাদ্ দীনুল কাইয়িম– 'বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই, তিনি আদেশ দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদত না করতে। এটিই সরল-সোজা দীন তথা জীবন বিধান।' বিপ্লবী জোয়ারে ভেসে গেলো সব অন্যায়, পাপ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দুষ্কৃতি। এ বিপ্লবের মহানায়ক মানুষের মধ্য থেকে আসা একজন মানুষ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্বমানবতার উসওয়াতুন হাসানাহ। আজ আবার নতুন জাহিলিয়াহর পতন ঘটাতে হলে, সমাজ অংগন থেকে পাপ, জুলুম, শোষণ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হলে এগুতে হবে তাঁরই দেখানো পথে। শিক্ষা নিতে হবে তাঁরই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে।

আজ কেবল মুখে আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর পাঠানো রাসূল বলে স্বীকার করে বাকি নিজের ইচ্ছামতো জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করলে সেই মুহাম্মদী বিপ্লবের স্পর্শও লাভ করা যাবেনা। আজ একদল ধর্মকে আফিম বলে নিজেদের ইচ্ছামতো সমাজ গঠন করতে গিয়ে সত্তর বছরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে পিছটান দিল। অন্য একদল দীর্ঘকাল থেকে ধর্মবৈরিতায় মগ্ন ছিল। ধর্মকে আফিম না হলেও আফিমের চেয়ে কিছু কমই মনে করে। সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুনিয়ার অন্যান্য কাজ কারবার থেকে ধর্মকে বাদ রাখতে তাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার অন্ত নেই। অবশ্য দুনিয়ার ধর্মগুলো যে অবস্থানে আছে তাতে তাদের এ ছাড়া আর গতি নেই। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে একথা খাটেনা। যারাই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে, জেনেছে এবং তার বিধানগুলো পালন করার চেষ্টা করেছে তারা জানে ইসলাম কেবল মাত্র ধর্মই নয় বরং একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলার জন্য পরিপূর্ণ পথ বাতলে দিয়েছে ইসলাম। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য যেমন পূর্ণাংগ বিধান দিয়েছে তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও দিয়েছে পূর্ণাংগ

www.pathagar.com

বিধান। একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দেবার কথা বলেন তাদের তো আর নতুন কিছু দেবার নেই। দুনিয়ার বস্তাপচা পুরাতন জুলুম শোষণ ব্যবস্থাটাকেই তারা আবার টেনে আনতে চান।

ইসলাম আধুনিক বিশ্বের, কলংকিত পুঁজিবাদ ও পরাজিত মার্কসবাদের পর তাকে নতুন করে সাজাতে চায়। সে ক্ষমতা ইসলামের আছে। দিকে দিকে ইসলামী আদর্শবাদের নব উত্থানে এরই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মুহাম্মদী আলোক ছটায় উদ্ভাসিত আধুনিক মন মানসের অধিকারী মুমিন ও মুসলিমদের অবশ্যই এর সুযোগ পাওয়া উচিত। এটা কেবল সুযোগ নয়, তাদের দায়িত্ব পালনেরও অংশ। এ যুগে এ দায়িত্ব তাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। ◆

www.pathagar.com

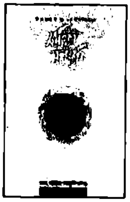

মুহাম্মাদ (সা) : নবী ও বিশ্বনবী

অধ্যাপক আবু জাফর

সব দেশে সব ভাষাতেই মহানবী (সা)কে নিয়ে এত অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে যে, সেই বিপুল গ্রন্থরাজি সর্বকালীন পৃথিবীর এক অপরাজেয় রেকর্ড ও বিস্ময়। কিন্তু চৌদ্দশতাধিক বৎসরের এই ক্রমাগত আলোচনার পরেও মনে হয়, মহানবী (সা)কে নিয়ে এতদিনের এই সমগ্র আলোচনা-সমষ্টি একটি মুখবন্ধ মাত্র, প্রকৃত আলোচনা এখনো শুরু হয়নি। এ রকম যে মনে হয়, তার কারণ নবী মুহাম্মাদ (সা)কে নিয়ে মানুষের ভাবনা ও প্রেম ক্রমশ বেড়েই চলেছে, মানুষের চিন্তা ও গবেষণা ও রচনা শত বৈরিতার মধ্যেও আরো তীব্র, আরো বেগবান হয়ে উঠেছে। সত্যই কী মনোরম এই দৃশ্য, এমন কোন দেশ কি সমাজ কি ভাষা নেই যেখানে এই মহামানবকে সামনে রেখে নি:স্বার্থ আলোচনার এক নির্মল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে না। অর্থাৎ কিছু মানুষ বা অনেক মানুষ যতই অনীহা কি পরান্মুখ হোক, মহানবী (সা)এর জীবন ও চরিত্র ও আদর্শ সর্বদেশে ও কালে পরিব্যাপ্ত সমগ্র মানববংশের জন্যই এক শাশ্বত সম্পদ। কেউ তাঁকে অস্বীকার করে স্বকপোলকল্পিত স্বল্পায়ু, সুখস্বর্গ রচনা করতে পারে, কিন্তু মানবগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণের প্রেক্ষাপটে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের অপরিহার্যতা চিরদিন একইভাবে অটুট ও উজ্জ্বল। সময় বদলে যায়, ভাষা বদলে যায়, বদলে যায় দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, বার বার পরিবর্তিত হয় পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাস কিন্তু মহানবী (সা)এর জীবন ও আদর্শের কার্যকারিতা কণামাত্র হ্রাস পায় না, বরং দিনবদলের সাথে সাথে আরো বেশি চূড়ান্তরূপে অনুভূত হয় তাঁর অপরিহার্যতা, এবং সকল রোগের চূড়ান্ত প্রতিষেধক হিসেবে ধরা পড়ে এই মহামানবের কথা ও কাজ ও মানবকল্যাণ কার্যক্রমের বাস্তব উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে এই জন্যই তিনি বিশ্বনবী, এইজন্যই সতত সমভাবে ফলপ্রসূ এক অপরিহার্য আদর্শ ও জীবনবিধানের রূপকার তিনি শেষ নবী; এবং এইজন্যই তিনি বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরিত এক অত্যুত্তম আদর্শের

www.pathagar.com

আধার, আগত অনাগত সকল সংকটের তিনি অব্যর্থ প্রতিষেধক। যারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করার মধ্যেই দেখতে পায় আধুনিক পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষা, তারা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। একদল, তারা সত্যের প্রতিশ্রুত শত্রু, তারা কেউ সম্পূর্ণ জেনেশুনে মার্লোচিত্রিত ডক্টর ফস্টাসের মত ইবলিসের কাছে স্বেচ্ছায় খরিদ হয়ে যাওয়া পণ্য, কেউবা আপন মুখরক্ষার্থে আবু জেহেলদের ভূমিকায় অবতীর্ণ খলনায়ক। এবং অপরদল কিছুই না জেনে মিথ্যা ও অন্ধকার ও কুহকের হাতে বন্দি ও শৃঙ্খলিত এক অতি অবোধ বালক সম্প্রদায়। এই বালকদের ব্যাধি ও অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু বটে, কিন্তু তাদের মেজাজ ও মস্তিষ্ক নানা ধরনের উৎপাতে এমন বক্র ও বিদ্বিষ্ট ও ভারাক্রান্ত যে, তাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব কোনটা পুষ্প আর কোনটা পুষ্পবেশী পতঙ্গশিকারী বর্ণময় ফাঁদ। দরিদ্রবিশ্বে এই বালকেরা কেউ অতি উদার বুদ্ধিজীবী, কেউ সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ মানবদরদে উদ্দীপিত স্বাপ্নিক, কেউবা নতুন এক বিশ্বরচনার উন্মাদনায় অতিবিপ্লবী। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় হলো দেশ বা দূরদেশে অবস্থানরত কোন না কোন প্রভুর অভিপ্রায়লালিত এরা এক একজন বশংবদ ক্রীতদাস। কোন সন্দেহ নেই, ইসলাম আজ অনেক দেশ ও অনেক মানুষের দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন। এবং মুহাম্মাদ (সা) যেহেতু ইসলামেরই পূর্ণতম মানবিক রূপ, মুহাম্মাদ (সা)কে না চেনা ও তাঁর আদর্শকে সর্বপ্রযত্নে আড়াল করাই এই আত্মবিস্মৃত বালক সম্প্রদায় ও তার প্রভুদের সর্বপ্রধান কর্তব্যকর্ম।

মহানবী (সা)কে মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পেরেছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা), না দেখেও চিনেছিলেন নাজ্জাশী হিরাক্লিয়াস, কিন্তু খসরু চিনতে পারেনি। আপন পিতৃব্য আবু লাহাব ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু বহু দূরাগত বহু সংকটে পোড় খাওয়া হযরত সালমান ফারসি (রা) প্রথম দর্শনেই চিনে নিয়েছিলেন। বুঝা যায়, সৌন্দর্যকে সত্যকে চেনা ও গ্রহণ করার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আধুনিক পৃথিবীর একটা বড় বদনসীব যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েও তার বোধোদয় ঘটলো না। বিশ্বের পণ্ডিতেরা গবেষণার বহু বিজ্ঞানসম্মত পন্থা প্রক্রিয়া তৈরি করেছেন, যা থেকে একটি নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয় না। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের এই পন্থা ও প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ও তাদের প্রাচ্যদেশীয় ভাবশিষ্যেরা ইসলামের ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার করেন। করেন না তার কারণ তারা দূষিত আবেগ ও অতি তুচ্ছ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে ভালোবাসে ও সত্যকে তারা ভয় পায়। বিশ্ব কাঁপানো বিটলস দলের অধিনায়ক জন লেনন পাশ্চাত্য মানসতার এই ভয়াবহ শূন্যতার কথা ভেবে এই জন্যই একদা বলেছিলেন- যখন খ্যাতি ও ঐশ্বর্য আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে তখন এটা বলা অত্যন্ত কঠিন যে, আমি রাজা হতে চাই না আমি সত্যকে চাই। জন লেনন কথিত এই দুরারোগ্য অক্ষমতাও একটি হেতু, যে কারণে আধুনিক পৃথিবী আজ মহানবী (সা)কে চিনেও না চেনার ভান করছে, জেনেশুনেও সর্বশক্তি নিয়ে রচনা করছে প্রতিরোধ।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সা)এর মহিমা ও মহত্ব শুধু তর্কাতীত নয়, তুলনারহিত। পারলৌকিক প্রশ্ন, জিবরাইল (আ) বাহিত তাঁর কাছে নাজিলকৃত কুরআন ইত্যাদি বিষয় কেউ যদি অস্বীকারও করে শুধু জাগতিক মানদণ্ডেই এটা নিরঙ্কুশভাবে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত যে, দশ হাজার বছরের এই আবহমান মানববংশে তিনিই শ্রেষ্ঠতম, তিনিই সুন্দরতম। বৈজ্ঞানিকেরা মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সূর্যেরও কলঙ্ক আছে, চাঁদের তো আছেই; কিন্তু সুপার এ্যাটমিক অনুবীক্ষণ কি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এটা আবিষ্কার করা অসম্ভব যে, মুহাম্মাদ (সা)এর চরিত্রে একটিও কোন খুঁত কি ত্রুটি কি অসঙ্গতি ছিল। উল্লেখ করেছি যে তিনি তুলনারহিত, তবু দুটি বিশেষ মুজিযার প্রেক্ষাপটে কিছু প্রতিতুলনার অবতারণা করতে চাই; হয়ত এ থেকে মুহাম্মাদ (সা)এর অনন্যতা সম্পর্কে জন্মান্ধরাও কিছু ধারণা করতে সক্ষম হবে।

সারা পৃথিবীর আবহমান ইতিহাস থেকে এমন একটি দৃষ্টান্ত কি উপস্থাপন করা সম্ভব, যে ব্যক্তির দশম কি অষ্টম উর্ধতন অবস্থান থেকে পুরুষানুক্রমিক পরিচয় অক্ষত আছে? নেই, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, নিউটন, গ্যালিলিউ আইনস্টাইনসহ প্রাচীন ও আধুনিক জগতের সকল মনীষীরই পূর্বপুরুষদের নাম পরিচয় নিঃশেষে অবলুপ্ত। এমনকি একেবারে কাছের মানুষ আমাদের অতিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথেরও প্রপিতামহ পর্যন্ত উঠতে পারি, তদুর্ধে গাঢ় থেকে গাঢ় অন্ধকার এবং এত যে বিখ্যাত লালন ফকির, তিনি লোকটি কী ছিলেন হিন্দু না মুসলমান সেই রহস্যেই এখনো অবগুণ্ঠিত। আর জগদ্বিখ্যাত শেক্সপিয়রকে নিয়ে তর্কের তো কোন শেষই নেই; শেক্সপীয়রই আসল শেক্সপীয়র নাকি নেপথ্যে কোন আত্মগোপনতালিপ্সু অমাত্য বা যুবরাজই আসল, এই সমস্যা বহু শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞকে এখনো ব্যাকুল করে তোলে। অথচ কী বিস্ময়কর, মহানবী (সা)এর বংশপঞ্জি কোন সুদূরকাল থেকে উজ্জ্বল ও অক্ষয়! পৌত্তলিক ও পুরোহিত আজরের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (আ)এর আবির্ভাব সেই খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে, সেই থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে নেমে এসেছে মুহাম্মাদ (সা)এর পুরুষানুক্রমিক বংশলতিকা। আশ্চর্যই বটে, সমগ্র মানবকুলে এই একটিইমাত্র ব্যতিক্রম, পূর্বাপর বংশধারায় যেখানে কোন ছেদ নেই। কিন্তু বংশপরিচিতিরও এই অলৌকিক সুরক্ষা সম্ভব হলো কী করে? হলো এই কারণে যে এটা আল্লাহপাকের অভিপ্রায়। আল্লাহপাক চেয়েছেন তাঁর প্রিয়তম হাবীব, পৃথিবীর জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপহার এই মনোনীত মানুষটির পূর্বাপর বংশেধারা পৃথিবীর কণ্ঠে মুক্তোমালার মত উজ্জ্বল অবিকৃতরূপে শোভা পাক, এবং তাইই পাচ্ছে। বিনীত চিন্তাশীলদের জন্য এ এক অবশ্যই চূড়ান্ত শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ।

পৃথিবীতে ধর্মের অভাব নেই; কিন্তু সেই সকল ধর্মের অনুসারীরাই বলুক, তাদের ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মগুরুদের সম্পর্কে সত্যই কতটুকু তারা জানে। এবং যেটুকু জানে, বলাই বাহুল্য, তা অতি অল্পই নির্ভরযোগ্য এবং অতি অল্পই অবিমিশ্র তথ্যভিত্তিক। সত্য

www.pathagar.com

যে, বেদ একটি বহুবিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু কেউ কি জানে কে বা কতজন রচনা করেছেন এই গ্রন্থ? কী তাঁদের নাম, সঠিক কোন সময়ে তাঁদের আবির্ভাব? ব্যাসদেবের কথা যদিও আসে কিন্তু তিনি মূল রচয়িতা নন, শ্রুতিলেখক মাত্র। এবং এই ব্যাসদের সম্পর্কেও কোন চতুর্বেদী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও প্রায় কিছুই জানে না। কনফুসিয়াস সম্পর্কেও একই কথা। এবং জরথুস্ট কি গৌতমবুদ্ধের জীবনচিত্রও এত অস্পষ্ট ও অনুমাননির্ভর যা থেকে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। তওরাত মূসা (আ)এর উপর অবতীর্ণ কিন্তু ইহুদিরা আবেগে অনুরাগে যাই বলুক, তারা ভালোই জানে, তওরাত শুধু বহুমাত্রিক বিকৃতির শিকার নয়, বর্তমান তওরাতের লেখকই আলাদা, এবং মূসা (আ)এর জীবনীও নিদারুণ বিস্মৃতির শিকার। যীশুখ্রিস্টের (হযরত ইসা (আ) জীবনচিত্রও আলাদা কিছু নয়, একই রকম কঠিন কুহেলিকায় আবৃত। ঈশ্বরের এই একমাত্র 'পুত্রের' মাত্র তেত্রিশ বছরের যে জীবৎকাল তার মধ্যে শৈশব ও শেষ তিন বছরের কতিপয় ঘটনার কিছু মোটা দাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া মধ্যবর্তী পঁচিশ বছরের কোন খবরই নেই। কিন্তু কেন এমন হলো এবং হয়? কারণ যাই হোক, পৃথিবী কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে মুহাম্মাদ (সা)এর জীবন এক্ষেত্রে এক অলৌকিক ব্যতিক্রম। শুধু নবুয়তউত্তর জীবন নয়, নয় শুধু বছর কি মাসের হিসাব, মাতৃগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পুণ্যমুহূর্ত থেকে উম্মুল মুমেনীন আয়িশা সিদ্দিকার (রা) কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ পর্যন্ত তেষট্টি বছরের যে জীবন তার প্রত্যেকটি দিন ঘণ্টা ও মিনিট পর্যন্ত এমন নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ, যেন ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত ডিটেইলসহ একটি অক্ষয় সবাক চলচ্চিত্র। পৃথিবী জীবনীগ্রন্থ ও আত্মজীবনী অনেক দেখেছে কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে কল্পনাতীতরূপে বিশুদ্ধ এই একটিই অবিনশ্বর জীবনালেখ্য, যার কোন একটি মুহূর্তও হারিয়ে যায়নি, এবং হারিয়ে যাবার সকল পথই আল্লাহপাক রুদ্ধ করে দিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সা)এর সব কথা ও কাজ ও আচরণ এমনকি নীবরতা পর্যন্ত যথাযথ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণে, সংগ্রহ ও চয়ন ও বিন্যাসে, সত্যাসত্য নির্ণয়ের পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মেধা সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাঁদের সংখ্যা লক্ষাধিক এবং এই লক্ষাধিক গবেষক ও সংকলকের জীবন নিয়েও রচিত হয়েছে অতি প্রামাণ্য ও বিশাল জীবনীগ্রন্থ 'আসমাউর রিজাল'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) এর নিজের জীবন তো বটেই, এমনকি তাঁর সঙ্গে ও তাঁর জীবনচিত্রের নির্ভুল সংরক্ষণকর্মে যাঁরা কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত তাঁরাও ইতিহাসে অমর। পৃথিবীর কোন ভাষা ও সাহিত্যে, কোন ধর্ম কি জ্ঞান কি গবেষণায় এর কোন নমুনাই নেই।

হাভার্ড অক্সফোর্ডের অসূয়াতাড়িত পণ্ডিত কি দরিদ্রবিশ্বের প্রভুরঞ্জনে তৎপর বুদ্ধিজীবী সবাই স্বীকার করে, মুহাম্মাদ (সা)এর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এই যে বিশাল ও ব্যাপক একটি বিজ্ঞানসম্মত ডিসিপ্লিন-এ এক অপার বিস্ময়। জন্মান্ধদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে ধর্ম ও যে বিশ্বাসেরই হোক, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যুগপৎ, বিস্ময়কর ও

www.pathagar.com

অতিপ্রাকৃতিক বাস্তব ও নির্ভুল, এই সুরক্ষার ব্যবস্থাটিকে অলৌকিক না বলে পারে না। কিন্তু সকল বিকৃতিমুক্ত এই যে অক্ষত মহিমান্বিত জীবন ইতিহাস, এর নেপথ্য রহস্যটা কী? রহস্য হলো, আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন- তিনি স্বয়ং কোরআন শরীফকে সকল বিকৃতি থেকে রক্ষা করবেন। এইজন্যই মানুষের যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে কুরআন শরীফের প্রতিটি বর্ণ ও বাক্য সুরক্ষিত। নবী মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন এই কুরআনেরই হুবহু বাস্তব প্রতিরূপ; অতএব আল্লাহপাক কুরআন-মজীদের মত কুরআনের এই মানবিক রূপটিকেও সর্বকালের জন্য নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এবং এই শাশ্বত সুরক্ষাই প্রমাণ করে তিনি বিশ্বনবী, প্রমাণ করে তিনি সর্বকাল ও সর্বমানবের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, এবং প্রমাণ করে একমাত্র তিনিই অনুসরণযোগ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের বড় বদনসীব, এমন অক্ষয় ও সহস্ররশ্মি আলোকবর্তিকার অতিনিকটে অবস্থান করেও তারা অন্ধ ও বধির ও বাকশক্তিহীন এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। ভাগ্যহীন পৃথিবীর ততোধিক দুর্ভাগা এই মূঢ় মানবসন্তানদের প্রকৃত অবস্থা সেই ইহুদির মত, যে ব্যক্তি মদিনার ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াতো, 'খুব শীঘ্রই এখানে একজন নবীর আগমন ঘটবে, ভুল করো না, তাঁকে তোমরা অবশ্যই সত্য বলে গ্রহণ করবে। তারপর নবী (সা) যখন সত্যসত্যই মদিনাতে আসলেন, মদিনাবাসীরা প্রস্তুতই ছিলেন, রাসূল (সা)এর আহ্বানে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন কিন্তু সেই ইহুদির মধ্যে কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হলো না। লোকে জানতে চাইলো, 'তুমিই সবাইকে অগ্রিম সুংবাদ জানালে অথচ তুমি নিজে কেন মুখ ফিরিয়ে আছো?' ইহুদি বললো, 'তোমাদের যা বলেছি তা যথার্থ কিন্তু এ-ব্যক্তি সে ব্যক্তি নয়'। 'বহুদর্শী বিদ্যানিধি' ইহুদিটির কী পরিণতি হয়েছিল জানি না, কিন্তু মুহাম্মাদ (সা)এর প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকা এই পৃথিবীর পারলৌকিক তো বটেই পার্থিব পরিণতিও যে ক্রমাগত এক সমূহ ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান, এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। এবং বর্তমান পৃথিবীব্যাপী তীব্র থেকে তীব্রতর মানবিক সংকট আজ সেই কথাই প্রমাণ করে। উর্ণনাবের জালে অবরুদ্ধমক্ষিকার মত মানবগোষ্ঠীর সঙ্কট ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। চৌদ্দশ বছর কম সময় নয়, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্লান্ত অবসন্ন ব্যর্থ বিপন্ন পৃথিবীর এইটুকু বোধোদয় হওয়া উচিত ছিল যে, মহানবী (সা)এর সর্বোত্তম আদর্শিক নিঃশর্তে আনুগত্য গ্রহণ করা ছাড়া পরিত্রাণের কোন পথই খোলা নেই, খোলা রাখাই হয়নি। এবং এইজন্যই মহান আল্লাহপাকের অমোঘ ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' তিনি অবশ্যই সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, 'বিশ্বজগতের আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরিত' এবং 'তাঁর আদর্শই সর্বোত্তম'। ◆

www.pathagar.com

ওরে মন বেভুল ॥ কে. জি মোস্তফা

ইয়া নবী সালাম 'আলাইকা
ইয়া রসূল সালাম 'আলাইকা...
আমার প্রিয় নবী হযরত
মুহাম্মদ রসূল
যার নামে দরূদ পড়ে
স্বয়ং আল্লাহ্ ফেরেশতাকুল ॥
অশান্ত এই পৃথিবীতে
আদর্শ যার পারে দিতে
শান্তি সুধার অমিয়ধারা
নেই কোন যার তুল ॥
সব মানুষের শোকে-দুখে
আর্তজনের ভাঙা বুকে
তাঁর প্রেমেতে সুবাস ছড়ায়
বেহেশতেরই ফুল ॥
তৌহিদেরই রজ্জু ধরে
রসূল নামে দরূদ পড়ে
সার্থক কর ইহ জীবন
ওরে মন-বেভুল ॥

১২ রবিউল আউয়ালের পংক্তিগুচ্ছ ॥ সুজাউদ্দিন কায়সার

মর্ম টানে রহস্য-প্রত্যয় টানে সত্যপ্রাণ
তুমি নবী মগ্নময় চাঁদ, তুমি দ্বীনের রাসূল ধ্যানময় সূর্য
আল্লাহর স্বীয় শক্তির প্রজ্ঞা ধরে
তোমার হিকমত ও বিচক্ষণ প্রভা
ত্রিভুবনে সমান পরিব্যাপ্ত–
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কুল মখলুক ঘিরে রাহ্মাতুল্লিল আলামীন
হে রাসূলে পাক হে নূরের জ্যোতি
হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা)

www.pathagar.com

তোমাকে স্মরি–
চিরঞ্জীব সত্যনিষ্ঠ পথের কাণ্ডারী
বিপুল বৈভবে তুমি হিরন্ময় নিমগ্ন সাধক।

খ.

সত্যপ্রিয় জীবন উৎস সন্ধানে ভিখিরি থাকে চিরকাল
জীবনের তৃষ্ণা চাওয়ার আশায় যদি ভণ্ডামী দিন ঘিরে ধরে
স্বপ্ন ঘুঁচে যায় তবে। আজ
আতপ্ত কর্ষণ চালায় দাজ্জাল ফিৎনা মূঢ়তা গণ। সময়
তাদের বারংবার ভেঙে দিতে চায়। অথচ
কখনো সখনো পারেনা পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত পাঠ নিয়ে
সঠিক জন্ম লালিমা মুছে দিতে চায় একদল শয়তান মনুষ্য বিবেক
মতিভ্রম এ কালের দুনিয়ায় আজ বড় প্রয়োজন
ভ্রাতৃত্ববোধ।খুব বেশি জরুরী ইসলামী ঝংকার
এবং শ্রেষ্ঠ
কুরআনের ঐশী বাণী। আর
পরিত্রাণ করো প্রভু হউক এ জীবন তোমার কীর্তি কর্মের
একবিন্দু শোভা।

আপনার পবিত্র ছবি ॥ হোসেন মাহমুদ

আমার চোখে ভাসে আপনার পবিত্র ছবি, আমি
দেখিনি আপনাকে কোনদিন কখনো কোন স্বপ্নে
তবু আপনি আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে ঠিক
প্রতিদিনের সূর্যের মত উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে
দীপ্যমান, যেমন মাটির পৃথিবীর কাছে বড়
এক বাস্তবতা অসীম আকাশ আর ছায়াময়
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, আপনি আমার কাছে সারাক্ষণ
সেভাবেই সত্তাময় হে প্রিয় মুহাম্মদ রসূল (সা)!

আমার চোখে ভাসে কা'বা এবং প্রিয় মসজিদে
নববীর ছবি, আর বদর, ওহূদ, খন্দকের

www.pathagar.com

প্রান্তর, আমি দেখতে পাই শুধু মরুর বিস্তার
উটের কাফেলা, কানে শুনি যেন ইকরা'র ধ্বনি

আমার চেতনার গভীরে আমি সুদৃঢ় প্রোথিত
করি যে ছবি, সেতো আপনারই হে প্রিয় রসূল (সা)।

আমার উচ্চারণ ॥ গাজী রফিক

কবিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল
তিনি কবিতা শুনতেন! কেননা
যে বেদনা কবিতাকে স্বয়ম্ভু করে তোলে
তাতে তাঁর জন্ম-মৃত্যু অন্তর্দাহ ছিল

তাঁর প্রাণ আদিঅন্ত সময়ের
সকল শিল্পের প্রাণান্ত সাধনা
তাঁর প্রেম প্রজ্জ্বলিত জীবনের
সর্বশেষ দ্যুতি

তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রেমিক
তাঁর জন্ম আলোর সকল উৎসবকে
উদ্বোধিত করেছিল।

আমার দুর্ভাগ্য আমি কবি, লজ্জাকর!
অর্থহীন আমার আয়ত্তের তাবৎ উপমা
সে নবীর প্রশংসায় আমি অপারগ।

আমার উচ্চারণ শুধু আদি অন্ত তাঁর চৈতন্যকে
অবিরল স্পর্শ করে যাক!

www.pathagar.com

এইবার ভুলের পাহাড় থেকে আমাদের নেমে যেতে হবে ॥

মাহফুজ পারভেজ

আমি ভুল করি
সংখ্যার গণ্ডি অতিক্রমী ভুল করি প্রতিদিন, বার বার;
লাটিমের আবর্তিত ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে জড়াই ভুলের কালচে সূতোয়
আমি ভুল করি প্রতিদিন বার বার...

ভুল করি ঘরে, ঘরের বাইরে
সমাজ ও জীবনের স্তরে স্তরে আমার সকল শুদ্ধতা আক্রান্ত ভুলের প্রযত্নে
আমি ও আমার মতো মানুষেরা আজ এক ভুলের পাণ্ডুর পাহাড়ের বসবাসকারী;
কাটাচ্ছি ভুলের যাপিত জীবন...
আনন্দে... আহারে... ভোগে... সম্ভোগে... স্বপ্নে... শয়নে... সামান্য প্রাপ্তিতে..

মানুষেরা এমন ভুলের নদীতেই নৌকো ভাসায় নূহের কিস্তিটি ফেলে
যেমন মূসার নাগরিকগণ বেছে নিয়েছিল মাটির বাছুর
আর আমরা তো ভুলের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছি
যেখানে শুদ্ধতা খুঁজে বের করা সবচেয়ে কঠিন কর্তব্য!

আপনি, হে রাসূল, [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফিরিয়ে স্বর্ণের পাহাড়সমূহ
বুকে টেনে নিয়েছিলেন মানুষ;
একদিন যারা নিজেরাই হয়ে গিয়েছিলেন স্বর্ণালী :
জীবনে ও মরণের ওপাড়ের ঠিকানায়।

বিষণ্ন রাতের পৃথিবীর দিকে বেদনায় নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে
জ্বল জ্বল করেন সোনালী মানুষেরা আজো নক্ষত্রের জ্যোতিতে আকাশে;
আমাদের কেউ কেউ সেইসব আলোকিত নক্ষত্রের মায়াবী দিশায়
ভুলের পাহাড় ছেড়ে ফিরে আসেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসের উপকূলে।

ভুলের পাহাড়ে চড়া আর শুদ্ধতার সমতলে চলে আসার ভেতর দিয়ে
কেটে গেছে চৌদ্দ শত বছরের অধিক সময়;
আগেও হাজার বছর কেটেছে এই ওঠা-নামার খেলায় :
সত্য-মিথ্যার সঙ্গত লড়াই ও সংগ্রামে।

www.pathagar.com

ক বি তা

আপনি, হে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার
শেষ সমরের সেনাপতি হয়ে করেছেন ঘোষণা সত্যের বিজয়
কিন্তু আমরা তো কানে তুলা আর চোখে আচ্ছাদন নিয়ে দিব্যি বসে আছি
ভুলের পাহাড় শীর্ষে মিথ্যার কর্কষ ও বন্য জমিনে!

আমরা আকাশে দেখছি আলোক-নক্ষত্রমণ্ডলী
নীচে শুদ্ধতার শুভ্র উপকূল; অথচ আমরা
চারপাশে মোষের পালের মতো জমাচ্ছি কুটিল মেঘ
আমাদের ভবিষ্যৎ বলতে 'বিপদ' ছাড়া আজ আর কিছুই অপেক্ষমাণ নেই!

এই বিপদের কথাও আপনি বলে দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে সবাইকে;
নফস্, দুনিয়া, শয়তান আর এই ত্রি-শত্রুর শতমুখী ইয়াজুজ-মাজুজ ও
খানে দাজ্জালের গোষ্ঠী
আধুনিক, অতি-আধুনিকরূপে খাব্‌লে ধরেছে বিশ্বায়নকৃত পৃথিবীর পুরোটা আকাশ,
আমরা কি তবে হবো এই শয়তানী করতলে নাচের পুতুল?

ভুলের পাহাড়ে নাচতে নাচতে অতীত হারিয়ে বিপর্যস্ত বর্তমানে
পথহারা মানব প্রজন্ম হারাবো কি বহুদূরগামী অনন্ত জীবনব্যাপী স্থায়ী ভবিষ্যৎ;
জীবনের অপার মহিমা লুটিয়ে দেবো নগণ্য প্রাপ্তির প্রলোভনে আর
মানুষের মহান জীবনাদর্শ তুলে দেবো অমানবিক শক্তির পিঞ্জরে?

হে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
মানবতার মুক্তির মহান শিক্ষক আমার ও আমাদের পৃথিবীর সকলের :
একমাত্র আপনার জন্য, আপনার শিক্ষার জন্যেই মানুষের সক্ষমতা বিবেকী তাড়না হয়ে
ভুলের বিরুদ্ধে... সত্যের সন্ধানে... ক্ষমার আশায়...
জায়নামাজে সেজদারত হয় অশ্রুসিক্ত নির্ঘুম নয়নে
নূরানী সুবেহ সাদেকের রহমত জাগানিয়া দিগন্তে বাড়িয়ে দেয়
শূন্য দু'হাত আল্লাহ গাফুরুর রাহিমের শাহী দরবারে
নাজাতের ঐকান্তিক প্রত্যাশায়... প্রার্থনায়...

এইবার ভুলের পাহাড় থেকে আমাদের নেমে যেতে হবে ॥

www.pathagar.com

সে কবে ॥ নূর-ই আউয়াল

আমার গানের এই লিপিকায় ঠিকানা– মদিনা ধাম;
নিবেদিত সুর সাধনে মধুর মুহাম্মাদেরই নাম।

গরীব নাদানে ওমরার টানে হৃদয় গভীরে কাবা,
জায়নামাজের শ্যামলিমা ঘের সিজদা ও মোরাকাবা;
নিরালে যদিনা সুদূর মদিনা বেঁধে দেয় এহরাম ॥

দু'চোখের জলে বুকের অতলে ঝিনুকে জমানো মোতি,
তুফানের তোড়ে আঁধারে বেঘোরে ঝলসে ওঠেনা জ্যোতি।

শাশ্বত কালামে দরূদে-সালামে নামহারা ফুল ফোটে;
শ্রাবণে ভাদরে ঝরে অন্যাদরে খোশবু ধরেনা মোটে;
ফুটবে সে কবে গোলাপ গরবে সুরভিত অভিরাম ॥

পূর্ণিমা আলো ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

ফুল বনে ফুটে থাকে যতো শতো ফুল,
তার যতো রূপ-রঙ সুরভি অতুল,
তার চেয়ে বেশি রূপ– হাসি শবনম,
সুরভিত রাসূলের রূপ অনুপম!

ঊষসীর সোনারঙ রাসূলের হাসি,
জোছনায় ফুল যেনো ফোটে রাশি রাশি!
রঙধনু ঝিলমিল রাসূলের গায়,
স্বর্গের পাখিরাও ফিরে ফিরে চায়!
প্রজাপতি বর্ণিল তাঁর দশদিক,
জোনাকির আলো যেনো করে ঝিকমিক।
সুরভিত কস্তূরী রাসূলের দেহ,
চন্দনে চর্চিত– নাই সন্দেহ!

নূরনবী হেঁটে যান দূর বিয়াবানে,
চাঁদ-তারা চেয়ে থাকে শুধু তাঁর পানে!
ভালোবাসি, রাসূলেরে খুব বাসি ভালো,
রাসূল যে আমাদের পূর্ণিমা আলো।

www.pathagar.com

হে মহামানব ॥ এ. কে. এম. সামসুল ইসলাম

হে মহামানব
তোমার আগমনে
পৃথিবীতে নেমে আসে শান্তির স্রোতধারা
সব ভ্রান্তি দূর হলো প্রকৃতির
জাগরণের জোয়ারে।

পাখীর কূজনে সুললিত গান
ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়ায়
বাতাসের আনন্দ উল্লাসে
ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত সে তো
তোমারই মধুর সম্ভাষণে।

তুমি রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন
তুমি স্যায়িদিল মুরসালিন।

মহা বার্তাবাহী ॥ তমসুর হোসেন

আমার আকাশ যে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত
অনেক আকাশে তার ছায়া পড়ে সুগভীর রাতে
নির্মল পরিশুদ্ধ বাণীগুলো শুভ্র শিশির হয়ে
ফুটন্ত কলির মুখে পড়ে থাকে শান্ত সমুজ্জ্বল।

তারার কি আলো আছে, অন্য কোন জগতের জ্যোতি
মৃত্তিকার বুক চিরে জ্বলে ওঠে অনন্তের অনির্বাণ শিখা
অনেক দূরে নীল নভঃতটে নিশ্চল ঘুমায় যে মেঘ
বাহ্য চোখে তাকেও আলোর উৎস বলে ভ্রম হয়।

মানুষের হৃদরাজ্য অনালোক কত কাল থেকে
আধারাশ্রয়ী আত্মা কৃষ্ণ পক্ষ সরীসৃপ বটে
দংশিত বিবেক ক্ষুধিত পাষাণ হয়ে হিমশীতল রাতে
মৃত্যুর বিমূর্ত ভীতিময়তা খোঁজে সবার অজান্তে।

www.pathagar.com

আমার আকাশ এক অনুপ জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর
মিশে একাকার অতীত ভবিতব্য অনিত্য লোকে
মহা বার্তাবাহী 'নূরে মোহাম্মদী' চিরায়ত রাহ্বার
কপোতের বুকে শান্ত উষ্ণতার মতো সার্বত্রিক।

মুহাম্মদ (সা) ॥ মুর্শিদ-উল-আলম

সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামে মুখর
অনাচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ধংসে জীবন মিশন
আরাম আয়েশ ত্যাগ সেতো এক মামুলী সুকর
ক্লান্তিহীন রক্ত-ঝরা দেহ নিয়ে ছুটেন ভীষণ
দ্বারে দ্বারে, শহরে বন্দরে, পরিশুদ্ধ চেতনার
বিকাশ সাধনে মানুষের মাঝে পরিশ্রমী দূত
অপচিন্তার আধার শুষে নিতে রূঢ় দোতনার
মধ্যে রক্ত ঢেলে দিয়েছেন জীবন নায়ের কুত।

সভ্য দুনিয়া গড়ার স্বপ্নে নেশাতুর দিবারাত
মরুঝরের রুক্ষতা পিছে ফেলে গিয়েছে সম্মুখে
অমানিশা দূরে ঠেলে উন্মেষিত হয় সুপ্রভাত
বিশ্বসভা উল্লসিত নতুন দিনের রব মুখে।
স্বপ্নমাখা আশা, শিল্পীত চেতনা দিয়ে অফুরান
ভালোবেসে বিশ্বজুড়ে আদর্শিক দৈন্যতা পুরান।

সফল নেতা ॥ মানসুর মুজাম্মিল

সকল কালের সফল নেতা
আমার রাসূলে পাক
দয়ার শরীর দিয়ে তাঁকে
বানালেন আল্লাহ্ পাক।

সব মানুষের উর্ধ্বে তিনি
তাঁরই কাছে সবাই ঋণী

www.pathagar.com

আঁধার যুগে তিনিই দিলেন
সত্য ন্যায়ের ডাক
সকল কালের সফল নেতা
আমার রাসূলে পাক।

এই যে আমার যুদ্ধ জীবন
মহানবীর রূপের আলোয়
শুধুই ভরে যাক
সকল কালের সফল নেতা
আমার রাসূলে পাক।

যে যা আমায় বলিসরে ভাই
মহানবীর পথটি
সবই পড়ে থাক
সকল কালের সফল নেতা
আমার রাসূলে পাক।

মোহাম্মদ রাসূল (সা) ॥ শহীদুল্লাহ আনসারী

এই পৃথিবীর মানুষ যখন
পথ ভুলে যায় আল্লাহ তখন
পাঠান যে রাসূল,
হাজার নবী ডালপালা হন
সাজে সবুজ বন, উপ-বন
একটা ফোটে ফুল।

মিষ্টি মধুর সে ফুল বাসে
দল বেঁধে সব ছুটে আসে
গন্ধে হয় আকুল,
সব অনাচার মদ জুয়া চোর
দূর হয়ে যায় দেখলে সে নূর–
'মোহাম্মদ রাসূল'।

www.pathagar.com

রাসূল নামের ফুল ॥ মোহসেনা খাতুন

মানুষ নামের ফুল গো তুমি
রাসূল নামে ফুল
ওগো হযরত মোহম্মদ রাসূল।
আল্লাহর নূরেরই ছোঁয়ায়
বেহেস্তে ফুটল কত ফুল,
চারিদিকে দিশেহারা হয়ে
ফুটলো কত রঙিন ফুল।
তোমার মমতার ছায়ায়
প্রাণ পেল কত লক্ষ জন
কেঁদে কেঁদে তোমার নামে
তারা করে গুঞ্জন।

আলোর মিনার ॥ শাহীনুর ইসলাম

আঁধার সরাতে ধরায় এলেন রাসূল
বাঁধার প্রাচীর দাঁড়ায় আরবের কুল।
জালিমের হুঙ্কারে কেঁপে উঠে মাটি,
পিড়নে ছাড়িতে হয় আপন বাটি।
গড়ে তোলেন মদীনায় নতুন সমাজ
ক্ষেপে উঠে ভিমরুল দেখে তাঁর কাজ।
তাই তারা বাধায় দেখ ওহুদ বদর
দিন দিন বাড়ে তবু নবীর কদর।

প্রিয় নবী ॥ পারুল আহমেদ

ঘুমিয়ে আছ প্রিয় নবী সুদূর মদীনায়
তোমার কাছে বারে বারে হৃদয় যেতে চায়।
তোমার নামে পাঠ করি দরূদ ও সালাম
তৃষ্ণা আমার মেটে না তবু, জপে সে প্রিয় নাম।
তোমার রূপে সৃজন করেন আল্লাহ্ সে মহান
অপরূপে এই বিশ্ব ভুবন সে যে তাঁরই দান।

www.pathagar.com

অব্যক্ত সুর ॥ এস, এম জাহাঙ্গীর কবির

যদি তোমাকে আমি মনুষ্য জাতির দিশারী বলি,
তুমি তার চেয়েও বড় দিশারী।
যদি তোমাকে জালিম জগতে সত্যের নিশানা বলি,
তুমি তার চেয়েও অধিক।
যদি তোমাকে কুরাইশ বংশের নেতা বলি,
তুমি নেতার চেয়েও বেশি।
যদি তোমাকে আঁধার ঘরের আলো বলি,
তুমি তার চেয়েও ঢের আলো।
তুমি আমার অব্যক্ত সুর, ব্যক্তের চেয়েও বেশি,
কভু পথভ্রষ্ট হলে যেন তোমার পথেই ফিরে আসি।

মরুর বুকে ॥ আখতারউজ্জামান নূরী

চাঁদ হাসে আজ ফুল হাসে ওই
মিষ্টি মধুর সৌরভে
মরুর বুকে মহান জাতির
মহান নেতার গৌরবে।

তোমার ছোঁয়ায় ছেয়ে গেছে
শুকনো তরু পল্লবে
উঠছে মেতে মানবজাতি
মহা সুখের উৎসবে।

তোমায় পেয়ে ভোরের পাখি
উঠলো নেচে গাইলো গান
গরীব দুঃখী পেলো শান্তি
অন্ন-বস্ত্র বাসস্থান।

তোমায় পেয়ে চন্দ্র হাসে
সূর্য হাসে পূব গগনে।
তোমায় দেখে বিশ্ববাসী
উঠলো মেতে পুণ্যগানে ॥

www.pathagar.com

ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি

শাহ আবদুল হান্নান

ইসলামী দাওয়াত (Islamic Call) ইসলামী আদর্শ ও বিধানেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী দাওয়াত হচ্ছে ইসলামের সংরক্ষণ এবং ইসলামী সমাজের রূপায়ণ ও অগ্রগতির পদ্ধতি। কুরআন মাজীদেই ইসলামী দাওয়াতকে মুসলমানদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর, বিরত রাখ।" (আল কুরআন ৩ : ১১০)
'তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত; যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে থেকে বিরত রাখবে।' (আল কুরআন ৩ : ১০৪)
'তোমাদের বানিয়েছি এক মধ্যপন্থী জাতি, যেন তোমার বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক হতে পার।' (আল কুরআন ২ : ১৪৩)

ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষকে ইসলামের অনুগত ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করা ও সুকৃতির প্রসার এবং দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা। যেখানেই সম্ভব সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করাও নিশ্চয়ই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা) নিজেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং রাসূলের সুন্নাত হলো আমাদের আদর্শ। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, "যখন তাদের দুনিয়ার বুকে ক্ষমতা দেওয়া তয় তখন তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সুকৃতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুস্কৃতির মূলোৎপাটন করে।' (আল কুরআন ২২ : ৪১)

ইসলামী দাওয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিশ্চয়ই ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এমন রাষ্ট্র যা

www.pathagar.com

ইসলামী আইন কানুনের অনুগত হবে ও ইসলামের আলোকে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে এবং অনৈসলামিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু যদি কোন সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য বাস্তবভাবে কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করাই হবে ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইসলামের দাবি বা শিক্ষা নয়। যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।"(আল কুরআন ২ : ২৬৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে, ক্ষমতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কাজেই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হবে, কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং কোথাও ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করা। আর তা নির্ভর করবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর। আমাদের দেশে বর্তমানে অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরিবেশ রয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতে এসব লক্ষ কার্যকরী করার কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে নবী (সা)এর সুন্নাতের দিকে দেখতে হবে। নবী (সা)এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ইসলামী দাওয়াত প্রসারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি খাওয়ার মজলিসে দাওয়াত দিয়েছেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। গোপনে মক্কার আশেপাশে এবং বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে দাওয়াত প্রচার করেছেন। মক্কার বাইরের বিভিন্ন শহরে দাওয়াত দিতে বের হয়েছেন। হিজরত করেছেন, যুদ্ধ করেছেন- অর্থাৎ দাওয়াত প্রসারের জন্য যখন যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই করেছেন। তবে ইসলামী ও সাধারণ নৈতিক নিয়মাবলী যা রয়েছে, তা কখনো ভঙ্গ করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে নবীর সুন্নাত হলো একটি উন্মুক্ত ও উদার পথ। অর্থাৎ ইসলামের নৈতিক নিয়মাবলীর সীমার মধ্যে হলে যে কোন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই বীর সুন্নাত মুতাবেক হবে। ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি একটি মুক্ত ও খোলা বিষয় হওয়ার কারণেই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

পদ্ধতিগত সুন্নাতের আলোচনার পর দেখতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দাওয়াতের জন্য কি কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত তামাদ্দুনিক ও তৃতীয়ত বৈপ্লবিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দল গঠন, স্বাধীন সংবাদপত্র ও প্রকাশনার সদ্ব্যবহার, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন, আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। অন্যদিকে উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণকে এবং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ জনগণকে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত,

www.pathagar.com

অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলাম অনুসরণে উৎসাহিত করাকে ইসলামী দাওয়াতের তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক পদ্ধতি বলা যায়। ইসলামী দাওয়াতের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলে অথবা মুসলিম জাতির আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য হলে বৈপ্লবিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কোন দেশে দাওয়াতের কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, তা নির্ভর করবে সে দেশের পরিস্থিতির ওপর। এমনও হতে পারে যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে একই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। তবে একটি কথা আমাদের খুব ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার (instability) মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। তার পূর্বে তারা ছিল বিভিন্ন উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের অধীন। সে সময় তাদের গভীর ও সুদৃঢ় কোন রাজনৈতিক ট্রেনিং ছিল না। ফলে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা অর্জন করেছে, মুসলিম বিশ্ব সে ধরনের কোন স্থিতাবস্থা এখন অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম বিশ্বে এখনো হর-হামেশা সামরিক বিপ্লব, নতুন নতুন দল গঠন সরকার পরিবর্তন ও পতন লেগেই আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াতের জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমেও গত ত্রিশ বৎসরে একমাত্র ইরান ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। অবশ্য মুসলমান যেখানে জাতিগত জুলুমের শিকারে পরিণত হয়েছে সেখানে বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াত ও মিশনের প্রসারের জন্য তামাদ্দুনিক পদ্ধতির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পদ্ধতিই সবচেয়ে অধিক কার্যকর হওয়া সম্ভব। তামাদ্দুনিক পদ্ধতির লক্ষ্য হবে জনগণকে ইসলামী আদর্শ বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, যেন ইসলামী বিধান ও আদর্শ জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস, বিবেক ও চিন্তার অংশে পরিণত হয়। জনগণের চিন্তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে, যাতে যে কোন সমস্যা ও বিষয়ে তাদের নজর সর্বপ্রথম স্বত:স্ফূর্তভাবে ইসলাম ও তার শিক্ষার দিকে নিবদ্ধ হয়। তামাদ্দুনিক পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে হবে একটি শিক্ষা আন্দোলন (Education Movement)। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী রূপে দেওয়া না হবে অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাবে, ততদিন পর্যন্ত উন্নত ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামী বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ পথেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম বিশ্বে গত পঞ্চাশ বছরে এক নতুন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সাহিত্যের ভাষা আধুনিক,

www.pathagar.com

এর পরিভাষা আধুনিক। সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান সময়ের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সাহিত্য রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উপমহাদেশের আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), মাওলানা আকরম খাঁ ও ফররুখ আহমদ উল্লেখযোগ্য। আরব বিশ্বের সাইয়েদ কুতুব, ইউসুফ আল কারদাবি, মোস্তফা আল জারকা, সাঈদ রমজান, মুহাম্মদ আল গাজালী ও অন্যদের মধ্যে আলীজা ইজে তাবেগভিচ, মুহাম্মদ আসাদ, মরিয়ম জামিলা জামাল বাদাবী, আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান ও টি রি আরভিং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রচিত সাহিত্যের পর এই নতুন সাহিত্য রচনার ফলে এক বিরাট শূন্যতার কিছুটা পূরণ হয়েছে। আমাদের মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় এই বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারকে পৌঁছাতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এই সাহিত্যের অনুবাদ করতে হবে, যাতে এক ভাষায় সাহিত্যের যে অভাব রয়েছে অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য অনুবাদ করে তা পূরণ করা যায়।

বর্তামানে যে ইসলামী সাহিত্য রয়েছে তা যদিও যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে আরো প্রচুর সাহিত্য রচিত হওয়া দরকার। তামাদ্দুনিক আন্দোলনের এটাও একটি দিক। ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠনসূহ অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত রয়েছেন। ইতিমধ্যেই মুসলিম বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি রিসার্চ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের তৈরি এসব সাহিত্যকেও দ্রুত অনুবাদ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

সাধারণ জনগণকে অবশ্য এ সাহিত্য দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাবে না। এ জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে জুমআর খুতবা ও ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্য জুমআর খুতবাকে আরো সময়োপযোগী করার জন্য দেশবরেণ্য আলেমদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের কমিটি গঠন করে নতুনভাবে খুতবার বই প্রণয়ন করার দরকার হবে। এ সব কাজই হবে তামাদ্দুনিক আন্দোলনের মূল কর্মসূচি।

ইসলামী দাওয়াতের তামাদ্দুনিক পদ্ধতিকে সফল করতে হলে ইসলামী সংগঠনসমূহকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের উচিত তামাদ্দুনিক কাজকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। অবশ্য তামাদ্দুনিক কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে এ সব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক খেদমত, কর্মীদের চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কেননা চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া তামাদ্দুনিক কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে না। ◆

www.pathagar.com

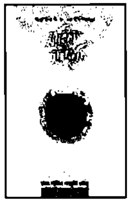

দু'আ কি, কেন ও কিভাবে?

অধ্যাপক মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন

দু'আর গুরুত্ব ও বরকত

মানবজীবনে দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতিটি নেক আমলকে তাঁর সাহায্য ও অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল করেছেন। আমাদের প্রতি এটা তাঁর বড়ই অনুগ্রহ। আমাদের কর্ম ও বিশ্বাসের ত্রুটিগুলো দু'আর মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়, ইবাদাত পরিপূর্ণতা লাভ করে, ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং পরনির্ভরশীলতার পরিবর্তে আমরা আল্লাহ-নির্ভর হওয়ার অবারিত সুযোগ পাই। প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে আল্লাহ্ তায়ালা একটি করে বিশেষ দু'আ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ তাঁদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহ প্রদত্ত সে সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীরই একটি দু'আ আছে যা তিনি করেন। [এবং এটি কবুল হয়ে থাকে] আমি চাই আমার দুআটি আখিরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে সংরক্ষিত থাকুক।'

অন্য এক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (সা) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ যা চাওয়ার চেয়ে নিয়েছেন', কিংবা তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীরই একটি দু'আ কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দু'আ করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

তথ্যসূত্র : বুখারী : ৫ম খণ্ড হাদিস নং ৫৮৬০, প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৮২।

হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) সেই অপরিহার্য দুআটি যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পেশ করবেন তার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে নিম্নোদ্ধৃত হাদিসটিতে।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে রান্না করা (খাসীর) গোশত পেশ করা হলো। এটা ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তিনি তা থেকে এক টুকরো খেলেন এবং বললেন, 'আমি হাশরের দিন সমস্ত মানবজাতির নেতা হবো। তোমরা কি জান কিভাবে আল্লাহ্ [হাশরের দিন] পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একটি বিশাল সমতল ময়দানে জামায়েত করবেন যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং আহ্বানকারীর ডাক সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কেউ কেউ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো? তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে দেখবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্যে শাফায়াত করবেন? অপর কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ) আছেন [তাঁর নিকট চল] অতঃপর সবাই তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম (আ)! আপনি সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকেছেন এবং আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা সবাই আপনাকে সিজদা করেছে এবং আপনাকে তিনি জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্যে আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখেন না আমরা কি [ভয়ানক] অবস্থায় আছি এবং কত কষ্টের সুম্মুখীন হয়েছি? তখন আদম (আ) বলবেন, আজ আমার আল্লাহ্ এত রাগান্বিত হয়েছেন যে এর পূর্বে কখনও এমনটি হননি। আর পরেও হবেন না। [তাছাড়া] তিনি আমাকে বৃক্ষটির নিকটবর্তী হতে [ফল খেতে] নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি [তাঁর] নাফরমানি করেছি। এখন আমার নিজেরই ইয়া নফ্সী ইয়া নফ্সী অবস্থা। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। নূহের (আ) কাছে চলে যাও। তখন সবাই নূহের (আ) কাছে যাবে এবং বলবে, হে নূহ (আ)! পৃথিবীবাসীর প্রতি আপনিই ছিলেন প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দা' খিতাব দিয়েছেন। আপনি কি দেখেন না আমরা কি অবস্থায় আছি? আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা কত দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি? আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে শাফায়াত করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আজ আমার প্রভু এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমনটি এর আগে আর কখনও হননি, আর পরে কখনও হবেন না। এখন আমার নিজেরই ইয়া নফ্সী ইয়া নফ্সী অবস্থা। তোমরা নবী মুহাম্মাদ (সা)এর কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি আরশের নিচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান, শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে। আপনি যা ইচ্ছা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ বলেন, পুরো হাদিসটি আমি মুখস্থ রাখতে পারি নি।

তথ্যসূত্র : বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ৩০৯৩, পৃ. ৩২২-৩২৩, প্রকাশকাল; জানুয়ারি ১৯৮৮।

www.pathagar.com

দু'আর বরকতে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে অনেক কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে যেমন, দুআর বরকতে হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করেছেন (সূরা আরাফ ৭:২৩) হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছেন (সূরা আম্বিয়া ২১ : ৮৭) হযরত নূহ (আ) মহাপ্লাবন থেকে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে উদ্ধার লাভ করেছেন। (সূরা মুমিনুন ২৩ : ২৬-৩০ সূরা আশ শু'আরা ২৬ : ১১৭-১২০), হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ) এর মতো নেককার পুত্র লাভ করেছেন (সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭ : ১০০-১০১), উপরন্তু, তাঁর দুআর বরকতে মক্কা নিরাপত্তার নগরীতে পরিণত হয়েছে মক্কার মরু প্রান্তর ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে, তাঁর বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত ও রিসালাত লাভ করেছেন, মিল্লাতে ইবরাহীমের উত্থান ঘটেছে এবং দুনিয়াবাসীর অন্তরে তাঁর নেককার সন্তানদের জন্যে ভালবাসার উন্মেষ ঘটেছে [সূরা বাকারাহ ২ : ১২৬-১২৯) সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৩৫-৪১]। হযরত যাকারীয়া (আ) বার্ধক্যে হযরত ইয়াহইয়া (আ)এর মতো নেককার পুত্র লাভ করেছেন [সূরা আল ইমরান ৩ : ৩৮] হযরত আইয়ুব (আ) যন্ত্রণাকর দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছেন (সূরা আম্বিয়া ২১ : ৮৩)। বিবি হান্না বার্ধক্যে বিবি মারিয়ামের মত নেককার কন্যা লাভ করেছেন এবং তাঁর দু'আর বরকতে বিবি মারয়াম বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৫-৩৭)। হযরত মূসা (আ) নরহত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন [সূরা ক্বাসাস ২৮ : ১৬-১৭] এবং মাদইয়ানে আশ্রয় লাভ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) আযীযের স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৩-৩৪] আসহাবে কাহাফ গিরিগুহায় আল্লাহর রহমত লাভ করে ধন্য হয়েছেন [সূরা কাহাফ ১৮ : ৯-১২] হযরত লুত (আ) তাঁর পরিবারের মুমিন সদস্যদের নিয়ে আল্লাহর গযব ও তাঁর কওমের ষড়যন্ত্রের থেকে রক্ষা পেয়েছেন [সূরা আশ শু'আরা ২৬ : ১৬৯-৭২] সূরা আনকাবুত ২৯ : ৩০]। হযরত ইউসুফকে (আ) হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ভাইগণ আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন [সূরা ইউসুফ ১২ : ৯৬-৯৮], হযরত ঈসা (আ) এর হাওয়ারীগণ আল্লাহর কাছ থেকে খাদ্যভাণ্ডার লাভ করেছেন [সূরা আল মায়িদাহ ৫ : ১১৪-১১৫]। হযরত সুলায়মান (আ) অতুলনীয় বাদশাহী লাভ করেছেন (সূরা ছোয়াদ ৩৮ : ৩৫-৩৮], হযরত মূসা (আ) এর দুআর বরকতে হযরত হারুণ (আ) নবুওয়ত লাভ করেছেন। [সূরা আশ শুআরা ২৬ : ১২-১৪ ক্বাসাস ২৮ : ৩৩-৩৫]। হযরত মুহাম্মাদ (সা) বদ্‌দুয়ায় পারস্য সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। (মিশকাত : ১০ম খণ্ড, হাদিস নং ৩৭৫০, প্রকাশক : এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ)। কাফির, মুশরিক, ইহুদি ও নাসারাদের প্রাণ বিনাসী ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করেছেন (সূরা আল ফালাক : ১১৩ এবং সূরা আন নাস : ১১৪)।

www.pathagar.com

দু'আর অর্থ

ক. আভিধানিক অর্থ।

দু'আর আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, সম্পৃক্ত করা, নাম রাখা [যেমন, আমি আমার পুত্রের নাম যায়েদ রেখেছি], ইবাদাত করা। সাহায্য বা প্রার্থনা অর্থেও দু'আ শব্দটি ব্যবহৃত হয় [দ্র. লিসানুল আরব, তাজুল আরূস ও আল মুফরাদাত]।

খ. পারিভাষিক অর্থ।

দু'আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নিজের বা অন্যের অনুকূলে অথবা কারও বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আল কুরআনে যে যে অর্থে দু'আ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে

উপরিলিখিত আভিধানিক, পারিভাষিক এবং অন্যান্য অর্থেও পবিত্র কুরআনে দু'আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -

ক. আহ্বান করা।

'রাসূল এর আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অন্যের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য করো না'।

তথ্যসূত্র : সূরা নূর, ২৪ : ৬৩।

খ. সম্পৃক্ত করা।

'তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে, এটা আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের দ্বীনীভাই এবং বন্ধু'।

তথ্যসূত্র : সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫।

গ. ইবাদাত করা।

'তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা গর্বের কারণে আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

তথ্যসূত্র : সূরা আল মুমিন ৪০ : ৬০।

ঘ.সাহায্য প্রার্থনা করা।

'এ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।'

তথ্যসূত্র : সূরা আল বাকারাহ্, ২ : ২৩ ।

ঙ. আশ্রয় প্রার্থনা।

'আর তাদের ওপর যখন কোনো আযাব আপতিত হতো তখন তারা বলত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে দুআ কর, তোমার সাথে তাঁর যে

www.pathagar.com

অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী।'
তথ্যসূত্র :সূরা আরাফ ৭ : ১৩৪।

দু'আর উদ্দেশ্যে

দু'আর মাধ্যমে বান্দা তার রবের সামনে নিজের চাহিদা, অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে, তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব, শাস্তিদানের ক্ষমতা ও দয়ার বিশালতা এবং নিজের দাসত্ব, আনুগত্য, অক্ষমতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষুদ্রত্ব ও আল্লাহনির্ভরতাকে মেনে নিয়ে কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চায়, আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যে শক্তি ও সাহস চায় এবং আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকার করে বিপদ মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। উপরন্তু, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তিপাগল দীনের খাদেম ও মুজাহিদের জন্যে দুআ একটি অপরিহার্য ইবাদাত।

দু'আ কার কাছে

শুধু আল্লাহর কাছেই দু'আ করতে হবে, অন্য কারও কাছে নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সূরা আর- রদের ১৩ : ১৪ আয়াতে বলেন, একমাত্র তাঁকেই (আল্লাহকে) ডাকা সঠিক। আর অন্যান্য সত্তাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা যে সত্তাসমূহকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো ঠিক এমনি ধরনের যেমন, কোনো ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়- তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌঁছতে সক্ষম নয়। ঠিক এমনিভাবে কাফিরদের দু'আও একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়।'
সূরা আল বাকারার ২:২৮৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহরই সত্তাধীনে রয়েছে যা আসমানসমূহে এবং যমীন আছে; আর যা তোমাদের অন্তরে আছে, তোমরা তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ, তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব নেবেন, উপরন্তু, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন, আর আল্লাহ সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

দু'আর বিষয়বস্তু

আমাদের ঈমান, আমল, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ বিদ্যা, নিরাপত্তা, আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, জীবন-মৃত্যু, কিয়ামাত-হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি রোগ-ব্যাধি, মহামারি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কি অগুরুত্বপূর্ণ সবই দু'আর বিষয়। তাই দু'আর বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের পুরো জীবনটাই দু'আর বিষয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) নিম্নোদ্ধৃত হাদিসটি স্মরণ করা যেতে পারে,
'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ রবের কাছে প্রয়োজন পূরণের জন্যে দু'আ করে।

www.pathagar.com

এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তার জন্যেও দু'আ করে।'
হযরত ছাবিত বুনানীর মুরছাল বর্ণনায় অধিক রয়েছে, 'এমনকি তাঁর নিকট লবণও ভিক্ষা করে, এমনকি আপন জুতার ফিতা ভিক্ষা করে যখন তা ছিঁড়ে যায়।'
তথ্যসূত্র : তিরমিযী, মিশকাত : ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২১৪৫, পৃ. নং ৮৪

দু'আর শ্রেণীবিভাগ

১. কল্যাণ ও অকল্যাণের দিক থেকে দু'আ দুই প্রকার
ক. আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, হিদায়াত, বরকত, ক্ষমা, নি'আমত ইত্যাদি লাভের জন্যে দু'আ।
খ. আল্লাহ তাআলার রহমত, হিদায়াত,বরকত, ক্ষমা, নি'আমত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করার জন্য বদ দু'আ।
২. বৈশিষ্ট্যের বিচারে দু'আ তিন প্রকার
ক. আল্লাহর তাওহীদ বর্ণনা এবং তাঁর হামদ্ ও ছানা প্রকাশ করা। যেমন; 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই' এবং হে আমাদের আল্লাহ! আপনারই জন্যে সকল প্রশংসা।'
খ. আল্লাহ্র ক্ষমতা, দয়া ইত্যাদি কামনা করা। যেমন, 'হে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।'
গ. কল্যাণ প্রার্থনা করা। যেমন : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন।'
ঘ. [তাহলীল ও তাহ্মীদকেও যথাক্রমে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও প্রশংসা] দু'আ বলা হয়। কারণ পুরস্কার লাভের এটিও একটি মাধ্যম। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার প্রশংসায় মগ্ন থাকার কারণে যে বান্দা আমার নিকট দু'আ করার অবকাশ পায় না, আমি সেই বান্দাকে দু'আকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশি করুণা দান করি।' অনুরূপ বক্তব্য কুরআনেও আছে।
ঙ. আরবী শব্দটিও দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন :
তাদের [জান্নাতীদের] দু'আর শেষ বাক্যহবে সকল প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।
তথ্যসূত্র : সূরা ইউনুস ১০ : ১০।
৩. উপস্থাপনার দিক থেকে দু'আ চার প্রকার
ক. ইনফিরাদী দু'আ যা ব্যক্তিগতভাবে একাকী করা হয়।
খ. ইজতিমায়ী দু'আ যা সম্মিলিতভাবে করা হয়।
গ. নীরব দু'আ যা গোপনে বা মনে মনে করা হয়।
ঘ. সরব দু'আ যা সশব্দে করা হয়।

www.pathagar.com

দু'আ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ

ক.'তোমরা আমার নিকট চাও, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' তথ্যসূত্র : সূরা আল মুমিন ৪০ : ৬০।

খ. 'তোমাদের রবকে ডাক বিনত হয়ে, দীনহীনভাবে এবং চুপে চুপে। অবশ্য তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।'

তথ্যসূত্র : সূরা আরাফ ৭ : ৫৫।

গ. 'আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে (রাসূলকে) জিজ্ঞেস করে, তখন [আপনি বলে দিন] আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর [দু'আ কারীর] আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য'।

তথ্যসূত্র : সূরা আল বাকারাহ ২ : ১৮৬।

ঘ. কে শোনে পেরেশান ও অশান্ত হৃদয়ের ডাক, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার মুসীবত দূর করেন এবং তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা সামান্যই ধ্যান কর।'

তথ্যসূত্র : সূরা আন নামল ২৭ : ৬২

ঙ. আল্লাহ বলেন, 'আমাকে ডাক। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা গর্বের কারণে আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

তথ্যসূত্র : সূরা আল মুমিন ৪০ : ৬০।

চ. 'বলুন আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাঁকে না ডাক, তোমরা মিথ্যা বলছ। এতএব, সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।'

তথ্যসূত্র : সূরা আল ফুরকান ২৫ : ৭৭।

এবং আল্লাহ এ নিয়ম নয় যে, মানুষ ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাদের উপর আযাব দেবেন।'

তথ্যসূত্র : সূরা আনফাল ৮ : ৩৩।

'অতএব, হে নবী। আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন নিজের অপরাধের জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্যেও। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত।'

তথ্যসূত্র : সূরা মুহম্মদ ৪৭ : ১৯।

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি রহমতের দু'আ কর ও সালাম পাঠাও।'

তথ্যসূত্র : সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৬।

যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও তখন আপন লোকদেরকে (মুমিনদেরকে)

www.pathagar.com

সালাম করবে দু'আ স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত বরকতময় উত্তম দু'আ। এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

তথ্যসূত্র : সূরা নূর ২৪ : ৬১।

দু'আর ফযীলত

১. ফেরেশতাদের সাথে সালামের মাধ্যমে দু'আ বিনিময় করার জন্যে হযরত আদম (আ) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ' আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, ফেরেশতাদের যে দলটি বসে আছে তাদেরকে সালাম কর। আর তারা তোমাকে কি জবাব দেয় তা শোন। তারা যে জবাব দেবে তা-ই হচ্ছে, তোমার ও তোমাদের সন্তানদের জবাব। কাজেই আদম (আ) বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম', ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তারা ওয়া রাহমাতুল্লাহ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছিল।'

তথ্যসূত্র রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩ হাদিস নং ৮৪৬, বুখারী, মুসলিম।

২. পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলনের জন্যে নবী (সা) এর নির্দেশ

হযরত ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, 'হে লোকেরা! পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, অভুক্তদের আহার করাও, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে সে সময় নামাজ পড়। তা হলে তোমরা শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন : হাদিস ৮৪৯, পৃ. ২৫৪, ২য় খণ্ড।

৩. মজলিসে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় সালাম করা মুস্তাহাব

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মজলিসে এলে সালাম করা উচিত। তারপর যখন মজলিস থেকে উঠে যেতে চাইবে তখনও সালাম করা উচিত। কারণ তারা প্রথম সালামটির তুলনায় দ্বিতীয় ও শেষ সালামটির কম হকদার নয়।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৮৬৯।

৪. আল্লাহর প্রশংসাকারী হাঁচিদানকারীকে দু'আ করা মুস্তাহাব

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তার বলা উচিত, 'আল হামদুলিল্লাহ' এবং তার ভাই, সাথীর বলা উচিত ইয়ারহামুকাল্লাহ্' তার জন্যে যখন বলা হয় ইয়ারহামু কাল্লাহ' তার জবাবে বলা উচিত, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বা লাকুম।'

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদিস নং ৮৭৯।

৫. মহান আল্লাহ বান্দার দু'আ পূর্ণ করার জন্যে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, আছে কি কেউ আমার নিকট দু'আ করার আমি তার দু'আ কবুল করব। আছে কি কেউ আমার নিকট আবেদন করার, আমি তাকে দান করব। আছে কি কেউ আমার নিকট মাফ চাওয়ার, আমি তাকে মাফ করব।'

তথ্যসূত্র : বুখারী : ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ৫৮৭৬,পৃ. পৃ. ৫৮৮, প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৮২।

৬. দু'আ হচ্ছে ইবাদাত

নুমান বিন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত : নবী করীম (সা) বলেছেন, দু'আ হচ্ছে ইবাদাত।'

তথ্যসূত্র : আবু দাউদ, তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, হাদিস নং ১৪৬৫ পৃ, ২. চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশকাল : ১৯৯৪ ইং।

৭. আল্লাহ দু'আকারীর প্রয়োজন পুরণ করেন

হযরত আবু জরাই জাবির ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনকে দেখলাম, লোকেরা তার তাবেদারী করে থাকে। সে যাই বলুক না কেন লোকজন তা-ই গ্রহণ করে। আমি বললাম, ইনি কে? লোকেরা বললো, রসূল (সা) আমি বললাম, আলাইকাস সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ দুবার বললাম, তিনি বললেন, 'আলাইকাস সালাম, বলো না। কারণ, আলাইকাস সালাম হলো মৃতকে সালাম। বরং বল আসসালাম আলাইকা। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। তুমি যদি কোনো বিপদ দুর্ভিক্ষে পড়, তাঁর নিকট দু'আ করবে, তিনি তোমার জন্যে শস্য উৎপন্ন করিয়ে দেবেন। তুমি যদি জন মানবহীন, অথবা পানিবিহীন প্রান্তরে থাক, আর তোমার সওয়ারী হারিয়ে যায়, তুমি তাঁর নিকট দু'আ করবে তিনি তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবেন।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৭৯৬ এর প্রথমাংশ।

৮. স্বচ্ছ মনে শাহাদাত লাভের জন্যে দু'আকারীর স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও শহীদের মর্যাদা লাভ করে

সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত লাভের জন্যে দু'আ করে তাহলে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদের স্তরে পৌছে দেন।

তথ্যসূত্র : মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ১৩২১।

৯. দু'আ করাকে আল্লাহ ভালবাসেন

www.pathagar.com

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ' আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাও। কারণ তাঁর নিকট কিছু চাওয়াকে তিনি ভালবাসেন এবং বিপদ হতে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, মিশকাত : ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২১৩২, পৃ. ৭৯।

১০. দু'আ নূর এবং অস্ত্র

ক. [হুজুর (সা) ইরশাদ করেন, 'দু'আ মুমিনের জন্য অস্ত্র এবং আকাশ ও পাতালের নূর।'

তথ্যসূত্র : হিসনে হাসীন, ইমাম মুহম্মাদ আল জাযরী (রহ) এর সঙ্কলন

খ. দু'আ হচ্ছে অস্ত্র

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন , ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৩০, পৃ. ৩২-৩৬, ৪র্থ খণ্ড, ১৫০৫-১৫০৬, পৃ. ২৩-২৪।

১১. আল্লাহ দু'আকারীর সাথে থাকেন

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ঠিক সে রকম যে রকম বান্দা আমার সম্পর্কে ধারণা করে। যখন সে আমার কাছে দু'আ করে তখন আমি তার সাথে থাকি।

তথ্যসূত্র : বুখারী, রমজানের ত্রিশ শিক্ষা, পৃ. ৬০, প্রকাশকাল : ১৯৯৫ ইং।

১২. রোজাদারকে মেহমানদারির মাধ্যমে ফেরেশতাদের দু'আ লাভের জন্যে রসূল (সা) উৎসাহিত করেছেন।

তথ্যসূত্র : রমজানের ত্রিশ শিক্ষা : পৃ. ৫৮-৫৯, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, ইবনু হিব্বান

১৩. হযরত আবি যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ' আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখিয়েছি; সুতরাং আমার নিকট পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমরা প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু আমি যাকে অভাবমুক্ত করেছি ; সুতরাং আমার নিকট চাও, আমি তোমাদেরকে রিযক দেব। তোমরা প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু আমি যাকে নিরাপদে রেখেছি; সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করি এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যদি তোমাদের আউয়াল ও আখিরের, জীবিত ও মৃত ছেলে বুড়ো সবার যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেজগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর হয়ে যায়- এ আমার রাজ্যে একটি মাছির পালক পরিমাণও বাড়াতে পারবে না, আর যদি তোমাদের আউয়াল ও আখির, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা (ছেলেবুড়ো) সবার যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়, তাও আমার রাজ্যে মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না। যদি

www.pathagar.com

তোমাদের আউয়াল ও আখির, জীবিত ও মৃত যুবক ও বৃদ্ধ সবাই এক প্রান্তরে একত্রিত হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার নিকট চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে দান করি, তা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র কমাতে পারবে না। যেমন, যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রে পৌঁছে, আর তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে। [এতে যেমন সমুদ্রের পানি কমে না] অতঃপর তা উঠায়। এটা এ জন্যেই যে, আমি বড় দাতা, মহান দাতা ; আমি করি, যা ইচ্ছা করি। আমার দান হলো আমার কালাম মাত্র, আমার শাস্তি হলো আমার হুকুম মাত্র, আর আমার কোনো বিষয়ে হুকুম হলো, যখন আমি ইচ্ছা করি, আমি বলি, হয়ে যাও, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।'

তথ্যসূত্র : আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত, হাদি স নং ২২৪১, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

১৪. সিদজায় গিয়ে দু'আ করার জন্যে নবী (সা) এর নির্দেশ

রাসূল (সা) বলেন, বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজের (সিজদায় গিয়ে) খুব বেশি করে দুআ কর।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ১৪৯৮।

১৫. দু'আর বদলে 'বাইতুল হামদ' নামক জান্নাতে মহল তৈরি হয়।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কোনো বান্দার ছেলের ইনতিকাল হয়, তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার ছেলেকে নিয়ে নিয়েছো? ফেরেশতাগণ বলেন, জি হ্যাঁ আল্লাহ বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের পুষ্পটি ছিনিয়ে নিয়েছো? তারা বলেন, জি হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশতাগণ বলে, আপনার বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে ও ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্যে 'বাইতুল হামদ' নামের জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দাও।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৯২২।

১৬। দুর্বলের দু'আর ওসিলায় আল্লাহর সাহায্য ও রিয্ক প্রাপ্তি ঘটে

হযরত মুছআব (রা) হযরত সাদ (রা) নিজের সম্পর্কে মনে করলেন যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের চেয়ে তাঁর অধিক মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিদের ওসিলায় এবং তাদের দু'আয় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিয্ক দেয়া হয়।

তথ্যসূত্র : বুখারী, মিশকাত : নবম খণ্ড, হাদিস নং ৫০০৩।

১৭. আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা না করা আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য

হযরত সাদ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলো আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা বর্জন করা এবং এটিও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র : আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত, নবম খণ্ড, হাদিস নং ৫০৭৩।

১৮. দু'আ ইবলিসকে হতাশ করে

হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফার দিন বিকেলে আপন উম্মতদের (হাজীদের) জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তর দেওয়া হলো, অন্যের প্রতি অত্যাচার ছাড়া সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু আমি অত্যাচারীতদের পক্ষে তাকে পাকড়াও করবো। হুজুর (সা) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! যদি আপনি চান অত্যাচারীকে বেহেশত দিতে পারেন এবং (তার পরিবর্তে) অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু সেদিন বিকেলে এর উত্তর পাওয়া গেল না। রাবী বলেন, অতঃপর হুজুর (সা) যখন ভোরে উঠলেন পুনরায় সেই দু'আ করলেন এবং হেসে দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, মুচকি হাসলেন। এ সময় হযরত আবু বকর ও উমর বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক হুজুর। এ তো এমন একটি সময় যে সময় আপনি কখনও হাসেন না, আজ কেন হাসলেন? আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন। তখন হুজুর (সা) বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন, এবং আমার উম্মত হাজীদের ক্ষমা করেছেন। (তখন সে) মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল এবং বলতে লাগল, হায় আমার পোড়া কপাল! হায় আমার বদনসীব! তার এই অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ হলো।

তথ্যসূত্র : ইবনু মাজাহ, বায়হাকীর কিবাতুল বাছ, মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২৪৮৬।

১৯. দু'আ করার জন্যে আল্লাহ বান্দাকে উৎসাহিত করেন

যখন কোনো বান্দা বলে, 'হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! [তখন] আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার কাছেই আছি দু'আ কর, আমি কবুল করব।'

তথ্যসূত্র : সগীর, হাদিস শরীফ, পৃ. ২২৪, হাদিস, নং ২৩২।

২০. দু'আ বিপদগ্রস্ত ও বিপদমুক্ত উভয়ের জন্যে উপকারী

'যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারে দুআ' উপকারী। অতএব, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের দু'আ কবুল করা আমার কর্তব্য।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, তাফহীমুল কুরআন, : ১৩ খণ্ড, পৃ. ২০২।

২১. দু'আ সম্মানের বিষয়

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, ' আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে অধিক সম্মানের জিনিস আর নেই।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, তাফহীমুল কুরআন, ১৩ খণ্ড, পৃ. ২০২।

২২. দু'আ শত্রু থেকে রক্ষা করে এবং রিয্ক বাড়ায়

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হুজুর (সা) ইরশাদ করেন, 'আমি কি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দেব যা তোমাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদের রিযককে [স্রোতের ন্যায়] ভাসিয়ে দেবে। আর তা হচ্ছে এই যে, দিন রাত আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ চাইতে থাকে। কারণ, দু'আ হচ্ছে মুসলমানদের হাতিয়ার।'

তথ্যসূত্র : মুস্তাগফিরী, দাফে এফলাস।

২৩. দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

২৪. দু'আর মাধ্যমে নাফরমান সন্তান অনুগত সন্তানে পরিণত হয়

হযরত আনাস (সা) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যদি কারও মা বাবা মারা যায় এবং তাঁদের জীবিত অবস্থায় সে তাঁদের নাফরমান থেকে থাকে। [তারপর তাঁদের মৃত্যুর পর ঐ নাফরমানী সম্পর্কে তার চেতনা হয়], তবে সে যেন তাঁদের জন্যে বার বার দু'আ করতে থাকে, তাঁদের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করে দু'আ করতে থাকে। তা হলে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে মা-বাবার হুকুম মান্যকারীরূপে গন্য করে মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন।'

তথ্যসূত্র : বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, পথের সম্বল; পৃ. ৩৮. হাদিস নং ১৩৫, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৮৩।

২৫. দু'আর সুফল অবশ্যম্ভাবী

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলমান দু'আ করে এবং তাতে কেনো গুনাহের কথা বা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার হরণের কোনো কথা না থাকে তখন আল্লাহ এরকম দু'আ অবশ্যই মঞ্জুর করেন। হয় এই দুনিয়ায় তার দু'আ মঞ্জুর করে নেন, তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন; অথবা আখিরাতে তার জন্য জমা করে রাখেন। অথবা তার উপর আসন্ন কোনো বিপদকে ঐ দু'আর বদৌলতে সরিয়ে দেন। সাহাবাগণ বললেন, তাহলে তো আমরা খুব বেশি দু'আ করব। তিনি বললেন, ' আল্লাহও খুব বেশি দানকারী।'

তথ্যসূত্র : তারগীর, মুসনাদে আহমদ, পথের সম্বল, পৃ. ১৮৮, হাদিস নং ২৪৬, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৩।

২. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত : রাসূল (সা) বলেছেন, 'বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ হয় তখন তার প্রার্থিত জিনিষ তাকে দান করেন অথবা তার উপর সেই পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন, যদি সে গুহানের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ না করে।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, তাফহীমুল কুরআন : ১৩ খ, সূরা মুমিন-এর ৬নং আয়াতের ৮৪ নং টিকা।

২৬. সব রকম বিপদে আল্লাহর সাহায্য চাওযার জন্যে নবী (সা) এর নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা বিপদে,

www.pathagar.com

কষ্টে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির মন্দা এবং বিপদে শত্রুর উপহাস থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।'

তথ্যসূত্র : বুখারী, মুসলিম : শিকাত : ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২৩৪৪, পৃ. ২০৭, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৬।

২৭. দু'আ তাকদীর পরিবর্তনের একমাত্র উপায়

হযরত সালমান ফারসি (সা) বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলেছেন, দু'আ ছাড়া আর কোনো কিছুই তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে না।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, তাফহীমূল কুরআন : ১৩ খণ্ড, পৃ/ ২০০, মিশকাত, নবম খণ্ড, হাদিস নং ৪৭০৮, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ইং।

২৮. দু'আ আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানের বিষয়

[ক] হযরত সালমান ফারসি (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যিকর বা ইবাদাতসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা কোনো জিনিসই অধিক সম্মানের বিষয় নয়।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, মিশকাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৮ হাদিস নং ২১২৯।

২৯. দু'আ কারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জা বোধ করেন।

হযরত সালমা ফারসি (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দানশীল ও লজ্জাশীল। যখন কোনো বান্দা তাঁর সামনে দুই হাত পাতে তখন তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'

তথ্যসূত্র : আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, পথের সম্বল, পৃ. ১৮৮, হাদিস নং ২৪৭।

৩০. দু'আ ইবাদাতের সারবস্তু

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'দু'আ ইবাদাতের সারবস্তু।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, ৩৩৭১, দাওয়াত অধ্যায়, ইসলামী ওয়াযায়িফ, পৃ. ২২।

৩১. দু'আ না করলে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, তাফহীমুল কুরআন, ১৩ খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯ টিকা ১৪৪।

৩২. যে দু'আ করে না আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন

'যে ব্যক্তি দু'আ করে না আল্লাহ তাআলা [তার উপর অসন্তুষ্ট হন, রাগান্বিত হন] তাকে গযব দান করেন।'

৩৩. যে জান্নাতের জন্যে দু'আ করে, জান্নাতও তার জন্যে দু'আ করে

www.pathagar.com

হযরত আনাস (সা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত চায়, জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল করুন। আর যে তিনবার দোজখ হতে নিস্কৃতি চায়, দোজখ বলে, হে আল্লাহ! তাকে দোজখ হতে নিস্কৃতি দিন।'

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, মিশকাত, ৫ম খণ্ড হাদিস নং ২৩৬৪, পৃ. ২১৫, ২য় মুদ্রণ।

৩৪. দু'আ রহমতের দ্বার খুলে দেয়

হযরত ইবন্ উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার জন্যে দু'আর দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে [অর্থাৎ যাকে দু'আ করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে] তার জন্যে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নিকট যেসব দু'আ করা হয়, তার মধ্যে তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় দু'আ হলো আফিয়াত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য দু'আ করা।

তথ্যসূত্র : মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২১৩৪, পৃ. ৮০, দ্বিতীয় মুদ্রণ।

৩৫. নবী করীম (সা) এর দু'আর বরকতে তাঁর হিযরত নির্বিঘ্ন হয়

তথ্যসূত্র : বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ৩৩৪৭।

৩৬. দু'আ মিসকীনের দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একবার এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিকট এল এবং যখন দেখল, তারা ক্ষুধার্ত ও উপবাসরত, তখন সে (তা সহ্য করতে না পেরে) ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল, তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বাইরে চলে গেছে। তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আর এক পাটের উপর রাখল। অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রিযক দান করুন। এরপর সে চাক্কির নিচের তাগারিটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখল যে, তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে যেয়ে দেখল যে, সেখানে পাত্রটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারও নিকট থেকে কিছু পেয়েছে? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের নিকট থেকে পেয়েছি। অতঃপর সে চাক্কির নিকট গিয়ে পাটাটি খুলে রাখল। এ ঘটনাটি নবী (সা) এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, যদি সে চাক্কির পাটাটি না সরাত, তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত ঘুরতে থাকত।

তথ্যসূত্র : মিশকাত, নবম খণ্ড, হাদিস নং ৫০৮০।

৩৭. দু'আ বালা মুসীবতে উপকারী এবং তা প্রতিরোধকারী

হুজুর (সা) বলেছেন, তকদীরকে ভয় করা এবং তা থেকে বাঁচার যে কোনো চেষ্টা করা নিষ্ফল; অবশ্য দু'আ এমন বালা মুসবিতের মধ্যেও উপকারে আসে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং এমন মুসবিতেও উপকার সাধন করে যা এখনও অবতীর্ণ হয়নি এবং এমনও হয়ে

www.pathagar.com

থাকে যে, মুসবিত অবতরণকালে দু'আ তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর উভয়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত মুকাবিলা হতে থাকে [এবং মানুষ দু'আর ওসিলায় বিপদ হতে বেঁচে যায়]।

তথ্যসূত্র : হিসনে হাসীন, প্রথম অধ্যায়, পৃ.৪।

৩৮. আগে সালামকারী আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী

আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী যে আগে সালাম করে।

তথ্যসূত্র : তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, হাদিস নং ৮৫৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০।

৩৯. দু'আকারী কখনও আকস্মিক বিপদে ধ্বংস হবে না

হুজুর (সা) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করতে অক্ষম হয়ো না। কারণ দু'আ করতে থাকলে কোনো ব্যক্তি কখনও [কোনো আকস্মিক বিপদে] ধ্বংস হবে না।'

তথ্যসূত্র : হিসনে হাসীন, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫।

৪১. সুসময়ের দু'আ বিপদ ও ব্যাকুলতা দূর করতে সহায়তা করে

হুজুর করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি এ কথা পছন্দ করে যে, বিপদ ও ব্যাকুলতার মধ্যে যেন আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেন, তবে তার উচিত, সুসময়ে অধিক পরিমাণে দু'আ করা।'

তথ্যসূত্র : হিসনে হাসীন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫।

৪১. দু'আর বরকতে স্বাভাবিক মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা দান করে

সাহল ইবনে হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত লাভের জন্যে দু'আ করে তাহলে সে (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দেন।

তথ্যসূত্র : মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ১৩২১, চতুর্থ মুদ্রণ।

৪২. দু'আ নিরাপত্তা দান করে

একবার হুজুর (সা) কিছু লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা কোনো এক বিপদে নিপতিত ছিল। তখন [তাদের অবস্থা দেখে] হুজুর (সা) বললেন, এরা কি আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্যে দু'আ করে না?'

তথ্যসূত্র : হিসনে হাসীন : প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬।

৪৩. দু'আ উপকারীর প্রশংসা ও প্রতিদানের উপায়

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির কিছু উপকার বা ভাল করা হয়। এবং এর জবাবে সে উপকারকারীকে বলে, জাযাকাল্লাহু খাইরান' [অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ভাল প্রতিদান দিন], সে পুরোপুরি তার প্রশংসা ও প্রতিদান করল'-ইমাম তিরমিযী এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ

www.pathagar.com

হাদিস ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, চতুর্থ খণ্ড, হাদিস নং ১৪৯৬, পৃ. ১৫।

৪৪. দু'আ মুজাহিদের শক্তি ও সাহস বাড়ায়

জারীর (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আমাকে যুল-খালাছাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন? এটা খাদুআম গোত্রের দেব-মন্দির বা ক'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত বা খ্যাত ছিল। জারির (রা) বলেন, অতঃপর আমি আহমাস গোত্রের একশত পঞ্চাশজন লোকের সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। তিনি (জারির) বর্ণনা করেন, (নবী করীম (সা) কে জানালাম যে) আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। একথা শুনে নবী (সা) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন যার কারণে আমি আমার বক্ষে তাঁর আঙ্গুলের চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! 'আপনি তাকে স্থির করে রাখুন। তাকে সৎ পথপ্রদর্শক ও সৎপথপ্রাপ্ত করে দিন। অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী জারীর) যুল খালাছাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেটাকে ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী করীম (সা) এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সংবাদ পৌছালেন। সংবাদবাহক তাঁর নিকট পৌছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটিকে ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর (রা) বলেন, তিনি [নবী করীম (সা)] আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্যে পাঁচবার দু'আর করলেন।

তথ্যসূত্র : বুখারী : ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ২৮৯৮, প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৯৮৮।

৪৫. দু'আ ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করে

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত : একবার জনৈক মুকাতাব ক্রীতদাস তাঁর কাছে এসে বলল, 'আমি নিজের আজাদীর জন্যে চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে সাহায্য করুন।' জবাবে তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যে কথাগুলো শিখিয়েছিলেন আমি কি সেগুলো তোমাকে শিখিয়ে দেব? যদি তোমার পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে তাহলে আল্লাহ তোমার থেকে তা আদায় করে দেবেন। বলো :

হে আল্লাহ! আপনার হারাম থেকে আপনার হালালকে আমার জন্যে যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন।- ইমাম তিরমিযী এই হাদিসটিকে উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদিস আখ্যা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র : রিয়াদুস সালেহীন; চতুর্থ খণ্ড, হাদিস নং ১৪৮৬, পৃ. ১০, প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৮৭।

www.pathagar.com

৪৬. কবরবাসী দু'আর কাঙ্গাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিগণ সাহায্যপ্রার্থী। পানিতে পড়া ব্যক্তির ন্যায় সে তার বাপ, মা ভাই বন্ধুর দু'আ পৌছার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট তা পৌছে, তখন তা তার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা কবরবাসীগণকে দুনিয়ার অধিবাসীদের দু'আর কারণে পর্বতের সমতুল্য রহমত পৌছান, আর জিন্দাদের পক্ষ হতে মুর্দার জন্যে হাদিয়া হলো, তাদের জন্যে ক্ষমা চাওয়া।'

তথ্যসূত্র : বায়হাকী, দাওয়াতে কবীর, মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২২৪৬, পৃ. ১৫০।

৪৭. শহীদ এবং মুজাহিদগণও দু'আর কাঙ্গাল

তথ্যসূত্র : বুখারী; ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ৩৯৮০।

৪৮. রসূলুল্লাহ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে দু'আর অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

তথ্যসূত্র : বুখারী ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ৪৪৫৮, বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ২৭১৯।

৪৯. অপরাধ মার্জনা করার জন্যে যে দু'আ করে আল্লাহ্ তার প্রতি খুশি হন

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি নিশ্চয়ই খুশি হন যখন সে বলে, হে রব! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে যে, আমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই।

তথ্যসূত্র : আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২৩২১।

৫০. দু'আর মাধ্যমে উত্তম প্রতিদান লাভ করা যায়

তথ্যসূত্র : হাদিস ৯২০, পৃ. ১৩, রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, হাদিস ৯২১

৫১. দু'আর মাধ্যমে কবর ও জাহান্নামের শাস্তি, কানা দাজ্জাল এবং জীবন ও মৃত্যুর কঠিন পরীক্ষা থেকে রেহাই পাওয়া যায়

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন, তোমরা বল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের শাস্তি থেকে, আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শাস্তি থেকে, আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।'

তথ্যসূত্র : মুসলিম, মিশকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৮৮০, পৃ. ৪১৭।

৫২. রুগ্নের দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর সমতুল্য

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তুমি কোনো রুগীর নিকট যাবে, তাকে তোমার জন্যে দু'আ করতে বলবে। কারণ তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর সমতুল্য।

তথ্যসূত্র : মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ১৫০২, পৃ. ৩২।

আল-কুরআনের দু'আ প্রসঙ্গ

পুরো কুরআন দু'আ ও শিফায় পরিপূর্ণ। কেউ যদি কুরআন চর্চায় নিমগ্ন থাকার কারণে

www.pathagar.com

দু'আ করার সুযোগ না পায় তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'আকারীর চাইতেও অধিক কল্যাণ দ্বারা বিভূষিত করবেন। রাসূল (সা) হাদিসে কুদসিতে বর্ণনা করেন-
যে ব্যক্তি কুরআন মজিদ পড়ার কারণে আমার যিকর এবং আমার কাছে দু'আ করার সুযোগ পায় না তাকে দু'আরকাররি চেয়েও অধিক দেব।
তথ্যসূত্র : তিরমিযী, ২৯২৬, ছাওয়াবুল কুরআন অধ্যায়, দারেমী ; ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২, বায়হাকী, মিশকাত, ইসলামী ওযাইফ, পৃ. ৪৮-৪৯।
দু'আ আল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দু'আর উদ্দেশ্য, অপরিহার্যতা, শর্ত, বরকত, পদ্ধতি, আদব, দু'আ শ্রবণকারী ও দু'আ গ্রহণকারীর গুণাবলী, দু'আ ও ইবাদাত, দুআ ও কাফির, দু'আ ও মুমিন, দু'আ ও রাসূল, দু'আ ও মাতা পিতা, দু'আ ও নেতৃত্ব, দু'আ ও মিথ্যা মা'বুদ, দু'আ ও দুনিয়া, দু'আ ও আখিরাত, দু'আ ও আমল, দু'আ ও জিহাদ, দু'আ ও ফেরেশতা, দু'আ ও মযলুম, দু'আ ও তাওবা, দু'আ ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যবহুল, প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনায় পুরো কুরআন সমৃদ্ধ।
আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস তো শুধু দু'আ এবং বান্দার আবেদন নিবেদনে পরিপূর্ণ। অবশিষ্ট ১১১ টি সূরার মধ্যে-
সূরা আল-বাকারার ২ : ৬৮-৭১, ১২৬-১২৯, ১৫২, ১৫৬-১৫৭, ১৮৬, ২০০-২০২, ২৫০, ২৬০ এবং ২৮৫-২৮৬ আয়াত।
সূরা আলে ইমরানের ৩ : ৮-৯, ২১, ২৬-২৭, ৩৫-৩৯, ৫৩, ১৩৪-১৩৬, ১৪৬-১৪৭, ১৫৯ এবং ১৯১-১৯৫ আয়াত।
সূরা আন নিসার ৪ : ১৭-১৮, ৩২, ৭৫, এবং ৭৭ আয়াত।
সূরা আল মায়িদার ৫, ৮৩, ১১৪-১১৫ আয়াত।
সূরা আল আন'আমের ৬ : ১৭-১৮, ৪০-৪১, ৫৩, ৬৩, ৭৯ এবং ১৬, ১৬২-১৬৩ আয়াত।
সূরা আরাফের ৭ : ১১-১৭, ২২-২৩, ৩৭-৩৮, ৪৭, ৪৯, ৫৫-৫৬, ১২৬, ১৪৯, ১৫১-১৫৩, ১৫৫-১৫৬, ১৮০, ১৯৪ এবং ১৯৭ আয়াত।
সূরা আন্‌ফালের ৮ : ৩৩ আয়াত।
সূরা আত তাওবার ৯ : ৮০, ১০৩-১০৪ এবং ১২৯ আয়াত।
সূরা ইউনুসের ১০ : ৩, ১০, ২২-২৩, ৬৬, ৮৫-৮৬, ৮৮-৮৯ এবং ১০৬ আয়াত।
সূরা হূদের ১১ : ৩, ৪১, ৪৫-৪৭, ৫২, ৬১, ৭৩, ৯০ এবং ১০১ আয়াত।
সূরা ইউসুফের ১২ : ২৩, ৩৩-৩৪, ৯২, ৯৬-৯৮ এবং ১০১ আয়াত।
সূরা আর রাদ ১৩ : ১৪ এবং ৩০ আয়াত।
সূরা ইবরাহিম ১৪ : ৩৫-৪১ এবং ৪৪ আয়াত।
সূরা আল-হিজরের ১৫ : ৩৬ আয়াত।
সূরা আন নাহলের ১৬ : ৯৮ আয়াত।
সূরা বানী ইসরাঈলের ১৭ : ২৪, ৮০, ১১০ আয়াত।

www.pathagar.com

সূরা আল কাহাফের ১৮ : ১০-১২ এবং ২৪ আয়াত।
সূরা মারইয়ামের ১৯ : ২-১০, এবং ৪৭ আয়াত।
সূরা তোয়াহার ২০ : ২৫-৩৫, ১১৪, ১২৫ এবং ১৩৪ আয়াত।
সূরা আম্বিয়ার ২১ : ৮২-৮৪, ৮৭-৯০, ১১৪ এবং ১১২ আয়াত।
সূরা মুমিনুনের ২৩ : ২৬-৩০, ৩৯-৪১, ৯৩-৯৫, ৯৭-৯৮, ১০৬-১১১ এবং ১১৮।
সূরা নূরের ২৪ : ৬১ আয়াত।
সূরা ফুরকানের ২৫ : ৬৩-৬৬, ৭১ এবং ৭৪ আয়াত।
সূরা শু'আরার ২৬ : ১২-১৪, ৮৩-৮৯, ১১৭-১২০ এবং ১৬৯-১৭২ আয়াত।
সূরা নামলের ২৭ : ১৫, ১৯, ৪০ এবং ৪৪-৪৯ আয়াত।
সূরা কাসাসের ২৮ : ১৪, ১৬-১৭, ২১-২২, ২৪, ৩৩-৩৪ এবং ৪৭ আয়াত।
সূরা আনকাবুতের ২৯ : ৩০ এবং ৬৫ আয়াত।
সূরা সাজদার ৩২ : ১২-১৪ এবং ১৬ আয়াত।
সূরা আহযাবের ৩৩ : ৪৩, ৫৬ এবং ৬৭-৬৮ আয়াত।
সূরা সাবার ৩৪ : ১৮-১৯।
সূরা সাফ্‌ফাতের ৩৭ : ১০০-১০১ এবং ১৮০-১৮২ আয়াত।
সূরা ছোয়াদের ৩৮ : ১৬. ৩৫-৩৮, ৬১ এবং ৭৯ আয়াত।
সূরা যুমারের ৩৯ : ৮, ৪৬ এবং ৪৯ আয়াত।
সূরা মুমিনের ৪০ : ৭-৯, ১১, ৪৪, ৪৭-৫০, ৬০, ৬৫ এবং ৭৪ আয়াত।
সূরা হা মী ম সাজদার ৪১ : ২৯ এবং ৪৯-৫০ আয়াত।
সূরা যুখরুফের ৪৩ : ১৩-১৪ এবঙ ৮৬ আয়াত।
সূরা দুখানের ৪৪ : ১২ আয়াত।
সূরা আহকাফের ৪৬ : ৬ এবং ১৫ আয়াত।
সূরা মুহাম্মাদের ৪৭ : ১৯ আয়াত।
সূরা ফাতাহ-এর ৪৮ : ১১ আয়াত।
সূরা তুরের ৫২ : ২৮ আয়াত।
সূরা কামারের ৫৪ : ১০ আয়াত।
সূরা হাশরের ৫৯ : ১০ আয়াত।
সূরা মুমতাহিনার ৬০ : ৪-৫ আয়াত।
সুলা মুনাফিকুনের ৬৩ : ৫-৮ এবং ১০-১১ আয়াত।
সূরা তাহ্‌রীমের ৬৬ : ৮ এবং ১১ আয়াত।
সূরা নূহের ৭১ : ৫-১০, ২১-২২, ২৪, ২৬-২৮ আয়াত।
এবং সূরা নাছরের (১১০) তৃতীয় আয়াতসহ কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং সূরায় দু'আ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ◆

www.pathagar.com

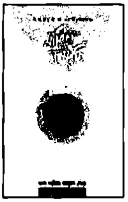

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ বা সুন্নাতে রাসূল

আবদুস শহীদ নাসিম

মানুষের হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল নিযুক্ত করেন। হিদায়াতের গাইডবুক হিসেবে তাঁর প্রতি নাযিল করেন আল কুরআন। কুরআন মানুষকে পড়ে শুনানো এবং বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি তাঁর রাসূলের উপর অর্পণ করেন। সুতরাং কুরআন বুঝিয়ে দেবার জন্যে কুরআনের ব্যাখ্যা দান করাও ছিলো রাসূলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আর ব্যাখ্যা তিনি নিজের মনগড়াভাবে দেননি। বরং সেটাও দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশেরই আলোকে। এ কারণে রাসূল (সা)-এর উপর কুরআন ছাড়াও আরেক ধরনের অহী নাযিল হয়েছে।

মানুষ কিভাবে কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে? কিভাবে সে তার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনা করবে? আর কিভাবেই বা সে কুরআনের আদর্শে নৈতিক কাঠামো এবং সমাজ ব্যবস্থা গড়বে? এ সকল বিষয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা দান করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এসব বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। জানিয়ে দিয়ে গেছেন। রাসূল হিসেবে আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করবার জন্যে তিনি কুরআন ছাড়াও যে জ্ঞান দান করে গেছেন, যে কর্মনীতি কর্মপন্থা জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এবং বাস্তবে যেসব শিক্ষা প্রদান করে গেছেন, সেগুলো হলো 'সুন্নতে রাসূল'। কুরআন মজিদে এই সুন্নাতে রাসূলকে 'হিকমাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই হিকমাহও যে আল্লাহর নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে, সে কথাও স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে :

'(হে নবী!) আর আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ নাযিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর

www.pathagar.com

অনুগ্রহ বিরাট।' (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১১৩)

তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলে গেছেন :

'জেনে রাখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেইসাথে দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটা জিনিস।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

এই 'হিকমাহ' এবং 'কুরআনের অনুরূপ' জিনিসটা কী? এ যে কুরআন থেকে পৃথক জিনিস, তাতো উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট। মূলত তা-ই হলো 'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাতে রাসূল'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনের মাধ্যমে উম্মাহকে তাঁর সুন্নাহ জানিয়ে, বুঝিয়ে এবং শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, যা আমাদের কাছে এখন হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সুসংরক্ষিত হয়ে আছে।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। যে অহীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে ইসলাম, তা হলো আল কুরআন। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল কুরআনের প্রচারক এবং একমাত্র শিক্ষক ও ব্যাখ্যাদাতা নিয়োগ করার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত আল কুরআনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা তথা সুন্নাতে রাসূল ও দীন ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। সুতরাং আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ-ই হলো দীন ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় মূল ভিত্তি।

এখন একথা পরিষ্কার, সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাই করা যায় না। ছাদ এবং দেয়াল ছাড়া শুধু পিলারকে যেমন অট্টালিকা বলা যায় না, তেমনি সুন্নাহ ছাড়া কেবলমাত্র কুরআন দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ হয়না। যেমন ধরুন, কুরআন পাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন নামায কতো রাকাত পড়তে হবে এবং নামায কিভাবে পড়তে হবে, তা কুরআন থেকে জানা যায় না। নামায পড়ার এসব নিয়ম কানুন সুন্নাহ থেকেই জানা যায়। এমনি করে কুরআন পাকে এমন অসংখ্য আয়াত আছে, সুন্নাহ ছাড়া যেগুলোর বাস্তব রূপ এবং ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়।

হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা) যে সুন্নাহ দিয়ে গেছেন, তা তাঁর মনগড়া কোনো কর্ম বা বক্তব্য নয়। কুরআন ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার অহী তাঁর প্রতি নাযিল হতো। মূলত সেগুলোই হাদীস আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। কুরআনে পাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে :

'মুহাম্মাদ নিজের ইচ্ছামতো কোনো কথা বলেনা। সে যা কিছু বলে সবই আল্লাহর অহী।' (সূরা আন নাজম : আয়াত ৩-৪)

এ জন্যেই সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা নির্মিত হতে পারেনা। সুন্নাহ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ। কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়টাই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার ভিত্। রাসূল (সা)-এর রেখে যাওয়া কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়টাকেই সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন :

'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছে তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ

www.pathagar.com

করেছে, তা তোমরা পরিত্যাগ করো।' (সূরা হাশর : আয়াত ৭)

সুন্নাহর গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন :

'তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে গেলাম– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

এ যাবতকার আলোচনা থেকে সুন্নাহর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। একথা সকলেরই জানা, ইসলামের মূল উৎস দুটি : ১। আল কুরআন এবং ২। সুন্নাহ বা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একথাও সকলেরই জানা যে, হাদীস ভান্ডারের মধ্যেই সন্নিবেশিত ও সংরক্ষিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। অর্থাৎ হাদীসে রাসূল থেকেই জানা যায় সুন্নাতে রাসূল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্পষ্টই বলে গেছেন, কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে একথাও জানিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন যে :

'হে নবী! তাদের বলে দাও : তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

রাসূলের অনুসরণ করতে হলে রাসূলের রেখে যাওয়া কুরআনকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর সুন্নাহকেও গ্রহণ করতে হবে। কারণ সুন্নাহ তো কুরআনেরই ব্যাখ্যা।

'আমি তোমার কাছে যিক্র (কুরআন) নাযিল করেছি, যেনো তুমি তাদের প্রতি যা নাযিল করা হলো, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।' (সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে :

'আল্লাহর আনুগত্য করো আর আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩২)

আরো বলা হয়েছে :

'যদি এ আনুগত্য পরিহার করো, তবে জেনে রাখো আল্লাহ এসব কাফিরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৩২)

আসলে রাসূলের কোনো ফায়সালা অমান্য করবার কোনো অধিকারই নেই কোনো মুমিনের : 'যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্ব (মতামতের) কোনো এখতিয়ার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা অমান্য করলো সে সুস্পষ্টভাবে বিপথগামী।' (সূরা ৩ আল আহযাব : আয়াত ২৬)

www.pathagar.com

রাসূলের ফায়সালা অমান্য করা যাবেনা, ব্যাপার কেবল এতটুকুই নয়, বরং রাসূলকেই ফায়সালাকারী মানতে হবে।

'তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনো মুমিন হতে পারবেনা যতোক্ষণ না তারা তাদের বিরোধ-বিবাদে তোমাকে সালিশ মানবে। শুধু তাই নয়, তুমি যে ফায়সালা দেবে, তাও নিঃসংকোচে গ্রহণ করবে এবং প্রশান্ত মনে মেনে নেবে।' (সূরা ৪ আননিসা : আয়াত ৬৫)

ব্যস্, রাসূলের আনুগত্য করা, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়াসালা গ্রহণ করা এবং রাসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। কিন্তু কিভাবে? রাসূলকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার পথ কী? এর একমাত্র পথই হলো কুরআনের সাথে সাথে হাদীসে বর্ণিত সুন্নাতে রাসূলকে জানতে হবে, মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে যেমন কুরআন মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে, তেমনি কুরআনের সাথে সাথে তাকে সত্যিকার মুসলিম হবার জন্যে সুন্নাতে রাসূলও জানতে হবে এবং মানতে হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, সুন্নাতে রাসূল হলো–

১. কুরআনে যা আছে তাই, কিংবা

২. কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অথবা

৩. কুরআনে নেই, অথচ মুমিনদের কর্তব্য এমন জিনিস।

এ কারণেই ইসলামী শরীয়ার উৎস হিসেবে সুন্নাতে রাসূলকে অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা পরিষ্কার :

'যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করলো।' (সূরা ৪ আননিসা : আয়াত ৬৯)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস আকারে রেখে যাওয়া তাঁর সুন্নাহ জানা ও শিখার এবং তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উৎসাহিত করে গেছেন। তিনি বলেছেন :

'ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ চিরসবুজ ও চিরসুখে তরতাজা করে রাখবেন, যে আমার বাণী শ্রবণ করলো, তা সংরক্ষণ করলো এবং অপরের নিকট পৌছে দিলো ।' ◆

www.pathagar.com

না'ত ॥ মতিউর রহমান মল্লিক

হয়তো সূর্য্য নেই সশরীর,
হয়তো সূর্য্য গেছে আড়ালে
তবু তার আলো নিয়ে পৃথিবীর
চাঁদ কত জুল্‌মাত তাড়ালে!

হয়তো সাগর নেই কাছেও,
হয়তো সাগর আছে সাগরে।
তবু তার গতি নিয়ে নাচে ও
বাঁচায় যে নদী গ্রাম আদরে।

হয়তো আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নই,
হয়তো আকাশ আছে নীলিমায়,
প্রতিদিন তবু তার যত্নই
জীবনের গান হয়ে বেজে যায়।

হয়তো রসূল নেই গোচরে,
হয়তো রসূল এই হৃদয়ে,
খুঁজে পায় শুধু তারে দোসরে
সত্যের নানাবিধ বিজয়ে।

হে রাসূল (সা) ॥ সোলায়মান আহসান

কোথাও মানুষ মরে, ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার
মানুষের বুকে বাজে হাহাকার, করুণ সানাই
পালাই পালাই করে দিন কাটে– সন্ত্রস্ত সদাই
হননের আয়োজন, চারিদিকে আর্ত চিৎকার–
এখন চলছে ধুম– মানবের সমাজ ভাঙ্গার।
দানবের আগমনে চলেছে বরণ উৎসব
'মানবতা' লাশ কাঁধে বুশ ও শ্যারন স্তূতি-স্তব
জাতিসংঘ বারান্দায় গেয়ে যায় প্রতিদিন তার।

www.pathagar.com

এমন যখন বিশ্ব মুসলিম (সার্কাসী শার্দুল)
মাথা কুটে মরে শুধু অবরুদ্ধ কাটে দিন বেলা–
তবুও কাটে না ঘোর– কাটে না আচ্ছন্নতা ও ভুল
বন্ধু নেই– সংঘ নেই– চলে শুধু রক্তে 'হোলি' খেলা
আজ তাই বেদনা জর্জরিত হৃদয় আকুল :
হে রাসূল! শাফায়েত যাচি হে নিমগ্ন একেলা।

কল্যাণ ও শান্তির আস্বাদ ॥ মহিউদ্দিন আকবর

আলোর দরজাগুলো ক্রমাগত অন্ধকারে যাচ্ছে ডুবে
আজকে মানুষ হয় টুকরো টুকরো লাশ!
নারী বলৎকার লুট রাহাজানি অবিরত ছড়াচ্ছে ত্রাস
চারিদিকে বিভীষিকা অবারিত শ্বেত সন্ত্রাস।

সুরেলা আজান ধ্বনি ভাঙায় না মদমত্তের ঘুম
সুদ ঘুষ দুর্নীতি বিজয়ের নিশান উড়ায়
অশ্লীল ও হীনতায় নারী ও পুরুষ যেন সমানে সমান
সত্য ভূলুণ্ঠিত মিথ্যাচারের জয় জয়াকার

এতো সে আরব যেন সেখানে ছিলোনা কোন মানবাধিকার
গেড়েছে আসন আজ হতাশারা স্থায়ী মচ্ছব
আরবে দাফন হতো যেই শিশু, তাদের আজ ডাস্টবিনে পাওয়া যায়
দয়া-মায়া বিবেচনা মরেছে প্রায়

এখানে শান্তি এখন সুদূর পরাহত মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়
হঠকারিতাই সবচে' সহজলভ্য এখন
আদব কায়দা কানুন সবকিছু মরে গেছে, বেঁচে আছে লাম্পট্য
দেশে দেশে ইবলিশী বোমার পাহাড়...

সভ্যতা দলে যায় দানবের ট্যাংক আর বোমারু বিমান
ঘাতকেরা দুনিয়ার প্রতি কোণে তৎপর
আলোর দরজাগুলো ক্রমাগত ঢেকে দিচ্ছে অন্ধকার
শোনা যায় আর্তের অন্তর্গত হাহাকার

www.pathagar.com

এই ঘন ঘোর বীভৎস জাহেলিয়া বিতাড়িত করে
কল্যাণ ও শান্তির পেতে আস্বাদ
সিরাজাম মুনীরা'র জীবনাদর্শে ফের দুনিয়া সাজাও
থাকবে না কালোমেঘ-নিকষ আঁধার।

ভালবাসার রঙ ॥ হারুন ইবনে শাহাদাত

মন যাকে ভালবাসে
তার রঙে রঙিন হয়।
সর্বশ্রেষ্ঠ রঙে
মন রাঙাতে পারে
কয়জন?

খুঁজে পেতে হবে সেই রঙ
তারপর না রাঙানোর পালা
সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ আল্লাহর রঙ
জেনেছেন সবার আগে
একজন।

তুমি যদি চাও সে রঙে
নিজেকে রাঙাতে
তাঁকে আদর্শ মানতেই হবে
আর কেউ নেই
শুধু তিনিই রঙ তুলির
সার্থক শিল্পী।

তাঁর মনে রঙের ছোঁয়া
জাগিয়েছে ভালবাসার যে ঢেউ
প্রতিধ্বনি তার
দোলা দিয়েছে শ্রেষ্ঠ রঙের সাগরে
উর্মিমালায় উঠেছে ধ্বনি
ইয়া হাবীব
আহমদ (সা)...

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা) ॥ নিজাম সিদ্দিকী

অবশেষে তৈরি হল কা'বা পুনর্বার। একমাত্র
হাজরে আসওয়াদ বসানো হলেই কাজ শেষ।
কে বসাবে পাথরটি? দ্বন্দ্ব শুরু এখানেই। যুদ্ধ
শুরু হল প্রায়। বলা যায় সংঘর্ষ অনিবার্য।

আবু উমাইয়া অতি বিচক্ষণ। সিদ্ধান্ত দিলেন
কাল ভোরে যে সবার আগে কা'বা ঘরে আসবেন
তার হাতে তুলে দেব বিচারের ভার। তারপর
সে যে ফয়সালা দিবে তা মেনে নেব সবাই। ঠিক।

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই; কে আসবে?
পারবে তো? ঐতো; ঐতো আসছে আল-আমীন। নেব,
মেনে নেব তার রায়। ব্যাপারটি বলা হল তাকে
রায় দাও মুহাম্মদ। তিনি চাদর বিছিয়ে তার
উপর পাথর রাখলেন। সবাই বহন করে
নিল সেটি। মিটে গেল বিবাদ, অনিবার্য সংঘর্ষ।

এখন ঈগলের পতন হবে ॥ মৃধা আলাউদ্দিন

প্রজ্ঞার পালিত ফুল সুন্দর পুরুষ– সত্য সাঁকো ~
আকাশের সর্বোজ্জ্বল রূপালী আপেল, চন্দ্র তুমি
তোমার আলোর উষ্ণতায় প্রাণ পেল মরুভূমি
পৃথিবীর পথ, বড় নদী-বৃক্ষ– সে কি তুমি দ্যাখো?

তুমি কি এটাও দ্যাখো– মানুষ রাতের অন্ধকারে
আলোর উত্তাপে, সন্ধ্যা– প্রাতে ডেকে যায় দ্রুতগামী
অশ্বের খুরের মতো?– বলে, হে রাসূল! তুমি দামী
পৃথিবীর সর্বোদামী, তুমি আমাদের ঘরে ঘরে–
বেঁচে আছো, বেঁচে রবে অনাদি অনন্তকাল ধরে।

তুমি তো আগেও ছিলে এখনও আছো, থাকবে– শুধু
হিংস্র হায়েনার মতো ঈগলেরা থাকবে না– ধু ধু

www.pathagar.com

হয়ে যাবে রুক্ষ বালু-নদীর মতোন খাটো ঘরে।

তুমি থাকো সর্বক্ষণ আমাদের আদত অন্তরে
যেন ঈগলেরা ভেঙ্গে যায় ঈগলেরই বালু চরে।

খোদার বন্ধু-স্বজন ॥ গোলাম নবী পান্না

উর্বর মাটিতে ফলে সোনার ফসল
কৃষক লাঙ্গল ঠেলে সাজান মাটি
গরুর জোয়াল সাথে করে খাটাখাটি
দু'য়ে মিলে এমন-ই জীবন সচল।

ধ্যানেরও জমিন হলে দরদ মাখা
ফলন মিলবে জানি ঐ আখেরাতে
নবীর নামের দরূদ পড়লে সাথে
পুরস্কার জানি সবার আছে রাখা।

তুমি-ই স্মরণে আছো হে প্রিয় রাসূল
মনোবলে নেই কোনো দুখের-ই ছায়া
উম্মত পেলে তোমার প্রবল মায়া
মুছে যাবে দোষে গড়া ভুলের মাশুল।

কারণ তুমি খোদার বন্ধু-স্বজন
তুমি ছাড়া আছে আর এমন ক'জন।

মুহাম্মদ (সা) নাম ॥ নাসিরুদ্দীন তুসী

আমিনার কোলজুড়ে এলো কেরে ওই
মরু আরবের বুকে আগমন কার,
নেমে এলো কেরে, আজ এই ধরাধামে
পৃথিবীতে এনে দিতে আলোর জোয়ার।

যে আরবে ছিল শুধু খুন, হানাহানি
সে আরবে এনে দিল শান্তির বাণী

www.pathagar.com

উড়ালো যে শান্তির শ্বেত পারাবত
ফুলশাখে পাখি ডাকে করে কানাকানি।

মরু আরবের বুকে আগমন কার
পৃথিবীতে এনে দিতে সুখের জোয়ার।

রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর আগমন
তাঁকে দেখে চাঁদ হাসে আকাশের গায়,
ফুল ফোটে, পাখি ছোটে, বয় সমীরণ
ঝিকিমিকি তারা জ্বলে দূর নীলিমায়।

'মুহাম্মদ' নাম তিনি ছেলে আমিনার
দূর হলো পৃথিবীর সকল আঁধার,
তাঁর আগমনে সব কালিমা যে টুটে
অবসান হলো যত ভয়-শংকার।

তাঁর নামে নদী বয়, ফোটে শতফুল
সৃষ্টি হয়েছে সব অন্ত আদির,
খোদার হাবীব তিনি পেয়ারে রসূল
কৈশোরে খ্যাতি পান সত্যবাদীর।

কোরানের আলো তিনি এলেন নিয়ে
এ ধরাতে নেই আর তুলনা যে ওঁর,
তাঁর মতো সবাইকে ভালবাসা দিয়ে
সৎ পথে চলি আজ এসো হে কিশোর।

যে আলোক এনে দিলো প্রীতিময় দিন
আমরা ও সে আলোকে হবো রঙিন।

আলোর পথিক ॥ হেলাল আনওয়ার

তপ্ত বালুর বক্ষ চিরে উট চলেছে জোরে,
খেজুর পাতায় লাগছে বাতাস হাসছে প্রাণ ভরে।
মরুর বুকে হিমেল হাওয়া গা জুড়িয়ে যায়
আলোর পথিক যাচ্ছে পথে আপন মহিমায়।

www.pathagar.com

আকাশ জুড়ে চাঁদের আলো তারা ঝিক মিক
ধরার দিকে নুয়ায় মাথা দৃষ্টি চতুর্দিক।
বলছে সবাই লওগো ছালাম ওগো দয়ার নবী
আঁধার ঘেরা এই দুনিয়ার তুমিই পুণ্য রবি।
চিনতে তোমায় ভুল করেছে মক্কা মরুর লোক
এই ধরাতে তাই নেমেছে সাগর সমান শোক।
যাচ্ছে রাসূল ঐ মদীনায় ছেড়ে জন্মভূমি
দু'হাত মেলে ডাকছে তারা তোমার নামটি চুমি।
ওগো নবী দয়ার নবী তোমার চরণ ধুলি
ধন্য হলো তোমায় পেয়ে সব ভেদাভেদ ভুলি।
দীনের চেরাগ জ্বালিয়ে দিলেন এই দুনিয়ায় এসে
সেই চেরাগে আঁধার ধরা উঠলো সবই হেসে।
মক্কাবাসী আরববাসী সব মানুষের জন্য
দু'হাত তুলে করেন দোয়া ধন্য জগত ধন্য।
সেই দোয়াতে নাজাত পাবে এই দুনিয়াবাসী
দয়ার নবী মহান নেতা তাইতো ভালবাসি।

হেরার আলো ॥ কামাল হোসাইন

আকাশ বাতাস কুল-মাখলুক
সৃষ্টি গো যাঁর জন্য–
এই দুনিয়ায় তাঁকে পেয়ে
আমরা হলাম ধন্য।
হেরার আলোয় উদ্ভাসিত
মানবতার মুক্তি;
তাঁর বাণী তো বিশ্ববাসীর
বাঁচতে শেখার উক্তি।

আরব যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত–
মাটির পুতুল বানিয়ে তাকে পূজা দিতো;
খুন-খারাবি মারামারির রাজ্যপাট
পরিমিত স্বার্থ নিয়ে যুদ্ধ খেলায় তপ্ত মাঠ!

www.pathagar.com

অমন অনেক পাপাচারে গোটা আরব জ্বলছিল
হিংসা এবং প্রতিহিংসা আগুন হয়ে গলছিল
আল কোরানের বাণী নিয়ে এলেন নবী মক্কাতে
পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ্ তাঁকে ওই অনাচার রক্ষাতে...

মুক্ত হলো আরব তখন সকল পাপের হাত থেকে
নবীর ছোঁয়ায় বাঁচলো মানুষ
ঘাত ও প্রতিঘাত থেকে।

না'তে রাসূল ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস

বন-মহুয়ার গন্ধে মাতাল
হল ভ্রমর অলি
মরুর বায়ে খুশির নাচন
ফুটলো ফুলের কলি ॥

দিকে দিকে শান্তির হাওয়া
করছে আজি আসা যাওয়া
সবার কানে খুশির খবর
করছে বলাবলি ॥

মা-আমিনার কোলে আজ
পূর্ণিমার চাঁদ এলো
সেই চাঁদেরই আলোতে সব
আঁধার কেটে গেল।
শান্তির গান গাইছে তাই
সকল বনমালী ॥

মরু ওয়েশীর বনে বনে
রহমতেরই আগমনে
জাহেলিয়াতের অবসানে
ঘুমন্ত এই আঁধার ভুবন
জাগলো আঁখি মেলি ॥

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ রাসূল (সা) ॥ মামুন সারওয়ার

আমেনার কোল জুড়ে ফুটে এক ফুল
আলোকে আলো হয় মরুর দু'কূল।

নিকষ কালোয় তখন সকল মানুষ
মারামারি করে হয় যে বেহুঁশ।

নূরে নূরানী হয় মরু চৌদিক
লোকালয়ে বহে আলোর ঝিলিক।

সত্যের দ্বীন এলো হয় কানাকানি
কেউ বলে এ হলো প্রভুর বাণী।

নূর নবী মুহাম্মাদ ॥ মুহাম্মদ ওমর আল ফারুকী

পাপ-পঙ্কিলে পৃথিবী যখন ডুবেছে তাবুত
মদ-শরাবে মানুষ যখন নাস্তানাবুদ।
অত্যাচারীর দম্ভ যখন বল্গাহীন
খুন-খারাবির বইতো নদী রাত্র-দিন।
হত্যা-জুয়া ধর্ষণ-লুট, ঘৃণ্য কাজ
এসব দেখে বনের পশুও পেত লাজ।
কন্যা শিশুর জ্যান্ত কবর দেয়া হত
খুনের বদল খুন লড়াইয়ে বছর যেত।
ধর্ম তখন অস্তপাটে হয়েছে লীন
মানবতার এতটুকু নেইকো চিন
জাহেল যুগের ঘোর আঁধারের সেই সময়
মঞ্জুর হল খোদার রহম বিশ্বময়।
বুলন্দ নসীব এই পৃথিবীর একটি প্রভাত
ছড়িয়ে দিল খোশ-খুশীতে সুসংবাদ।
আঠারো হাজার মাখলুকাতের রহমত
জন্ম নিলেন শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ।
ধূসর মরু বক্ষে লভি হল সুষম
পেয়ারা নবী মুহাম্মদের পাক কদম।

www.pathagar.com

শান্ত হল উৎপীড়িতের দগ্ধ দুঃখ
শিরিন সুধায় ভরলো ফের ধরার বুক।
আসমান-জমি পড়লো দরুদ, করে তাজিম
আরশে বসি পড়েন দরুদ হুয়াল আজিম।
আল আরবের আলোর প্রদীপ আল আমীন
পূর্ণ করে দিলেন ধরায় খোদার দীন।

রাসূলের সোহবত ॥ মাসউদুল কাদির

মানুষের মঙ্গলে অবিরাম
চলেছেন
সত্যের জয়গানে কতো কথা
বলেছেন।
আকাশের তারকারা মিটি মিটি
হেসেছে
আসমানে পেঁজা তুলো নিরবধি
ভেসেছে।
রাসূলের সোহবতে মানুষেরা
হাজারে
ছেড়ে দিলো অন্যায় মদ আর
গাঁজারে।

বারোই রবিউল আওয়াল ॥ আবদুল্লাহ যুবাইর হীরা

অন্ধকার ফুঁড়ে পাঁচশো সত্তর বছর পর
পুব আকাশে সূর্যের বদলে একি নূর
মিটি মিটি হাসে, বাসি-পচা সমাজে
হঠাৎ জাগে আলোড়ন তুমুল সুগন্ধে !
কা'বার তিনশো ষাটটি মূর্তি সিজদাবনত
হলো অকস্মাৎ– একি আচানক ঘূর্ণিঝড়
লাত-মানাতের হাঁটুতে তুলেছে কাঁপুনি !
দুমড়ানো-মোচড়ানো সমাজের সুশীল
চিত্রপট কোন চিত্রকরের আগমনী চিন !

www.pathagar.com

দক্ষিণা হাওয়ার মতো প্রশান্তি আসে নেমে,
ঊষার মরুর লু-হাওয়া হয় বিধ্বস্ত অসহায়!
একি চাঁদপানা মুখ, দেখেনি পৃথিবী কোনদিন
চিরগ্রীষ্মের দেশে জাগে বসন্তের কলতান
পাখীরা আত্মহারা হয়ে গায় সুনিপুণ গান!
মক্কা-তায়েফ, হেজাজ-নজদ-ইয়ামান
সাইমুম ঝড়, বিধ্বস্ত মরু, করে নিঝুম গুণগান!
আকাশ-বাতাস ফিসফিস প্রেমালাপ করে
কোন দিগ্বিজয়ী বিশ্বপ্রেমিকের কানে!
আমিনার ঘর ভাসে কোন নূর বানে!
আসমান থেকে নেমেছে কি প্রথম সৃষ্টির কায়া
ছোট্ট শিশু হাতে তার একরাশ প্রেম-প্রীতি-মায়া!
বারোই রবিউল আওয়াল এসেছো তুমি ফিরে পুনরায়
এতো প্রেম এতো প্রীতি খুন হয়েছে বলো কোন ছোঁয়ায়!!

এসেছে নবী ॥ মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন মৃধা

এসেছে নবী

এসেছে আনন্দ এসেছে আনন্দ রূপ
জেগেছে পৃথিবী
জেগেছে মানুষ জেগেছে সত্যস্বরূপ।
ফুটেছে ফুল– ফুটেছে তারা
ফুটেছে হাসি– হৃদয়ের আঙ্গিনায়
পেয়েছে ঠিকানা– পেয়েছে পথ
পেয়েছে শান্তি– মনের চিলেকোঠায়।
ভেঙ্গেছে ভ্রান্তি– ভেঙ্গেছে প্রাচীর
ভেঙ্গেছে পাপের কন্টক জোট
হেসেছে প্রকৃতি– হেসেছে শিশু
হেসেছে মায়ের কমনীয় ঠোঁট।
কেটেছে কুয়াশা– কেটেছে মেঘ
কেটেছে ভ্রান্তির শিকল
জ্বেলেছে আগুন– জ্বেলেছে প্রদীপ
জ্বেলেছে আত্মশুদ্ধির হোমানল।

www.pathagar.com

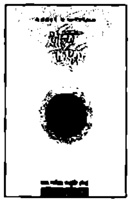

মহানবী আসছেন

আতা সরকার

১.

তীর্থ-উৎসব শেষ হল। দূর-দূরাগত তীর্থযাত্রী যারা এসেছিল তারা একে একে ফিরে যাচ্ছে। লোকজনের সমাবেশে সরগরম হয়ে উঠেছিল মক্কানগরী। এখন আবার তা ফাঁকা হয়ে আসছে। এ ক'দিন ছিল উৎসবের কল্লোল। এখন আবার তা জীবনযাত্রার গৎবাঁধা বৃত্তের আবর্তে পড়তে যাচ্ছে। কাফেলাগুলোর মধ্যে সাজ সাজ রব। স্বদেশ মুখে ফিরে যাচ্ছে মুসাফিররা। সব বিদায়ের মধ্যেই বিষণ্ণতা থাকে। মক্কায় এখন বিষণ্ণতার আবছা ছায়া পড়ছে।

ফিরে যাচ্ছে ইয়াসরিববাসীরাও। কিন্তু তীর্থভূমি থেকে ফিরে যাওয়ার যে বিষণ্ণতা দেখা দেয়ার কথা, তাদের মধ্যে তার লেশমাত্রও নেই। নেই স্বাভাবিকতাও। পঁচাত্তরজন পুরুষ-নারীর কাফেলায় দেখা যাচ্ছে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। তাদের মধ্যে কিছু একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে। তারা কেউ সরব নয়। কথা বলছে চুপি চুপি। মক্কা ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা প্রত্যাগমন করবে ইয়াসরিবে। কিন্তু এই ফিরে যাওয়াটাই যেন চূড়ান্ত নয়। তারা যেন অভাবিত কিছু পেতে যাচ্ছে। আর এ জন্যেই তাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। ফিরে চলেছে ইয়াসরিববাসীরা। চির বিবাদমান দুটি গোত্র যাচ্ছে পাশাপাশি। আওস ও খাজরাজ গোত্র। দু'টি গোত্রের প্রতিটি লোক লড়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। কিন্তু কী এক রহস্যময় কারণে এই দুই যুদ্ধমান গ্রোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা এবার হজ্জে এসেছিলেন। একই উত্তেজনা ও আবেগ নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছেন মক্কা থেকে। ইয়াসরিবের পথে যাচ্ছেন একই কাফেলায় শামিল হয়ে। তারা ইয়াসরিব যাচ্ছেন কি?

তারা মিনার পথ ধরেছেন। মক্কাবাসীদের কেউ কেউ হয়ত এদের পথ পরিবর্তনে অবাক হয়েছে। কিন্তু এটিকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি তেমন। এরাই সর্বশেষ বহিরাগত দল যারা মক্কা থেকে ফিরে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কাফেলা চলছে মিনার পথে। ঘোড়া আর উটের কাফেলা। দুজন মহিলা আর তিয়াত্তরজন পুরুষ। চলতে চলতে তারা কথা বলছে।

: কেউ কি ভেবেছিল, আওস আর খাজরাজ এই দুই গোত্রের মাথা মাথা লোকরা এক সাথে কাফেলা নিয়ে হজ্জ করতে আসবে?

: হ্যাঁ, আমারই কাছে অবাক লাগছে। জনম জনম দেখছি, এক গোত্রের লোক আরেক গোত্রের লোক দেখলেই তরবারি বের করে। দুই গোত্রকে কে কবে একসাথে দেখেছে?

: দেখেছে অনেকেই, বহুবার। দুই গোত্র এক হওয়া মানেই মুখোমুখি হওয়া, যুদ্ধ করা।

: হায়, আমাদের এমন কেউ নেই, যে আওস গোত্রের কোন না কোন লোকের হাতে আহত হয়নি।

: আমাদেরও এমন কেউ নেই, আপনাদের খাজরাজ গোত্রের কারো হাতে আহত হয়নি।

: আর এ সুযোগই নিয়েছে বজ্জাত ইহুদিগুলো।

: ওদের কম্মোই তো তাই।

: ইয়াসরিব আমাদের। কিন্তু ইহুদিগুলো মহাজন হয়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

: আরে, ওরা হল জাত মতলববাজ। ওদের তো জানাই আছে আমরা দুটো দল যদি ভাই ভাই হয়ে বাস করি, তাহলে ইয়াসরিবের ওপর ওরা কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে না। সুতরাং আওস আর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে লাগিয়ে দাও ধুন্দুমার যুদ্ধ।

: সে যুদ্ধ বলতে যুদ্ধ। একশ বছর ধরে চলেছে। থামার আর নাম নেই।

: বাক যুদ্ধ আমাদের দু'দলকেই পথে নামিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধে তোমরা আওস গোত্রই তো জিতে গেছ।

: সেইটে আবার জেতা! হারতে হারতে জিতে গেছি। জিতে দেখি সব হারিয়েছি।

: আসলে জিতেছে ঐ ইহুদিগুলো, কোন যুদ্ধ না করেই।

: এখন থেকে আর কোন যুদ্ধ নয়। দুই গোত্রকেই ভাই ভাই হয়ে থাকতে হবে। টিট করতে হবে ঐ হারামজাদা ইহুদিগুলোকে।

: ইয়াসরিব থেকে ওদের পাততাড়ি গুটিয়ে দিতে হবে।

: আরে, এজন্যেই তো বন্ধু আর সাহায্যকারী খুঁজতে মক্কায় আসা।

: পেলে কিছু? সব ব্যাটাই তো নিজ নিজ ধান্দা আর ফিকিরে ঘুরছে। এমন যদি একজন নেতা পেতাম যিনি আমাদের দুই গোত্রকে এক করে শান্তির রাজ্য কায়েম করতেন!

: নেতা তো পেয়েছিই।

: হ্যাঁ, আশা এবার পূরণ হবে।

যে ক'জন কথা বলছিলেন এবং যারা শুনছিলেন তাদের প্রত্যেকের চোখ আশায় জ্বল জ্বল করে উঠল।

www.pathagar.com

মিনার পথে ইয়াসরিববাসীদের কাফেলা মরুর ঐতিহ্যবাহী সুর তুলে গান ধরল। তাদের গানে নতুন জীবনের আশাবাদ ব্যক্ত হচ্ছে। কাফেলা মক্কা থেকে ফিরে যাচ্ছে। কোন এক সময় আবার ফিরে আসবে বলে।

আকাবা। পাহাড়ের নিচে তাবু গেড়েছে মুসাফির দল। সন্ধ্যার ছায়া গড়িয়ে যাচ্ছে রাতের দিকে। সবাই পরিশ্রান্ত। ঘোড়া আর উটগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। ক্লান্ত যাত্রীরাও বিশ্রামের আয়োজন করছে। কিন্তু প্রশান্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে রেখেছে তাদের সবাইকে। আকাশে দশমীর চাঁদ শ্রান্ত পথিকের উপর মোলায়েম পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা মরু হাওয়া সবাইকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাত জেগে আছে মুসাফিররা। তাদের কারুর চোখে ঘুম নেই। তাদের মধ্যে উত্তেজনা যেন আরো বেড়ে গেছে। সবাই জেগে বসে আছে। কারো অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে যেন।

এখানে এভাবেই কাটল তাদের তিনটি রাত।

তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ইয়াসরিবের ইহুদিরা তাদেরকে বলেছে যে তাদের মাঝে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। তারা তাকে অনুসরণ করবে। আর তখন ইয়াসরিবে কোন ইহুদির অস্তিত্ব থাকবে না। সেই দিনটিরই অপেক্ষায় আছে তারা। কুরাইশ বংশের আব্দুল্লাহপুত্র মুহাম্মদই কি সেই প্রতিশ্রুত নবী? এর আগে তাদের মধ্যে বারজন সেই নবীর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। এখন এসেছে আরো অনেকেই। প্রতীক্ষা করছে ইয়াসরিবের নাগরিকরা, অনাবিল শান্তি- রাজ্যের প্রত্যাশায়।

জ্যোৎস্না ধোয়া পথ ধরে তিয়াত্তরজন পুরুষ সমবেত হল আকাবার উপত্যকায়। চারপাশে গাছ-গাছালি। আকাশে চাঁদ। চরাচর আলোকিত। তারা অপেক্ষা করছে একজন নেতার জন্য।

দূরে দেখা গেল কয়েকজন লোকের ছায়া। এগিয়ে আসছে ছায়াগুলো। ছায়া মানুষের রূপ নিচ্ছে। আসছে কি শত্রু? ইয়াসরিববাসীরা তলোয়ারের বাটে হাত রাখল। মুসআব কয়েজনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন আগন্তুকদের পরিচয় জানতে। সতর্কতার সাথে পা ফেলেছেন তারা। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন আগন্তুকরা। মুসআব আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন: আল্লাহর নবী, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জলদগম্ভীর কণ্ঠের উত্তর এল: মুসলমানদের ভাই, তোমাদের উপরও শান্তি।

উপত্যকায় প্রতীক্ষারত ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মুহাম্মদ, আবু বকর, আলি ও আব্বাস।

মুহাম্মদ একটা উঁচু স্থানে বসলেন। কিছু দূরে বসলেন তাঁর সাথীরা। ইয়াসরিববাসীরা ঘিরে রাখল তাঁকে। তারা বিস্ময়ে দেখছে একজন পূতপবিত্র মহাপুরুষকে, তিনিই হবেন তাদের নেতা।

www.pathagar.com

আসাদ বিন জুয়ার বললেন : হে আল্লাহর নবী! গতবার আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আমাদের শহরে ইসলাম প্রচার করেছি। আজ এরা এসেছে আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে। আপনি এদেরকে কিছু বলুন।

আব্বাস : এর আগে আমার কিছু বলা প্রয়োজন। আপনারা এখানে মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে এসেছেন, কিন্তু কেন আপনারা আনুগত্য ঘোষণা করবেন, তা কি আপনারা জানেন?

ইয়াসরিববাসীগণ : হ্যাঁ, জানি।

আব্বাস বর্ণনা করলেন আনুগত্য ঘোষণার ফলে সবার উপর কি দায়িত্ব এসে পড়ছে। এর ফলে সত্যপন্থী জনতাকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হতে পারে। এ কাজে বাতিলপন্থীদের কাছে কখনোই কোন ধরনের আত্মসমর্পণ হতে পারে না। মহানবী হয়ত সত্যাশ্রয়ী জনতার আমন্ত্রণে ইয়াসরিবে যাবেন, সত্য হয়ত আরো প্রসারিত হবে। কিন্তু আত্মসমর্পণের কলঙ্ক কখনোই যেন সত্যপন্থীদেরকে স্পর্শ না করে। তিনি বললেন: শেষ পর্যন্ত আপনারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে আপনারা চিন্তা করুন। এরপর আপনারা মনস্থির করুন।

আব্বাস থামলেন। কিছুক্ষণের জন্য নেমে এল নীরবতা। ইয়াসরিববাসীরা কি থমকে গেল? ভাবছে তারা ভাবছে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে। যে দায়িত্ব তারা নিতে যাচ্ছে। মহানবী লক্ষ্য করছেন সবাইকে, যেন প্রত্যেকের মনের পাঠ নিচ্ছেন তাঁর গভীর অন্ত র্দৃষ্টি দিয়ে। কিছুক্ষণের নীরবতা ওদের মধ্যে আত্মগত সংহতি এনে দিচ্ছে।

বারা বিন মারুর তাকালেন মহানবীর দিকে। দেখলেন সমবেত লোকদেরকে। ধীরে ধীরে বললেন : হে আব্বাস, আপনার কথা আমরা শুনেছি। এ কথাগুলোর সাথে যদি কারো ভিন্ন মত থাকত, তাহলে এতক্ষণে তা জানা যেত।

কাব বিন মালিক। আল্লাহর নবীর প্রতি আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে। তাঁর জন্য আমাদের সব কিছু, এমনকি জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

ইয়াসরিববাসীরা কাব বিন মালিকের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করল। তারা আল্লাহর নবীর কাছে জানতে চাইল, সত্যের পথে তাদেরকে কি করতে হবে, আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর জন্যে কিভাবে তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলবে।

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে মহানবী সত্য-প্রত্যাশী ইয়াসরিববাসীদের সম্বোধন করলেন। তিনি তাদের সামনে আল্লাহর বাণী প্রকাশ করলেন। পৃথিবীর আবহমান সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যের বিজয়ের বর্ণনা শুনে ওরা স্বত:স্ফূর্তভাবে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন : ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ সত্য কথাই বলেছেন। অত:পর মহানবী ইয়াসরিববাসীদের প্রতি ইসলাম প্রচারে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে বললেন : আপনারা নিজেদের মত আমাকেও সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

ইবনে রাওয়াহা । আমরা কি পুরস্কার পাব এতে?

মহানবী : বেহ্শত।

জনতা : আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে প্রস্তুত।

মহানবী । আপনাদের এই আনুগত্য ভাল কাজের উপর হতে হবে এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ মানতে হবে। কুৎসা রটনাকারী ও নিন্দুকের কথায় দু:খ করবেন না। আপনারা আপনাদের সন্তান ও পরিবারের আশ্রয়ের জন্য যা করবেন, আমার জন্য তা-ই করবেন।

জনতা : আমরা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করছি।

বারা বিন মারুর (মহানবীর হাতে হাত রেখে) : আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে সত্যের পথিক ও পুণ্যবান করে পাঠিয়েছেন। আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যেভাবে আশ্রয় দিই আপনাকেও সেভাবে আশ্রয় দেব। আল্লাহর কসম, আমরা যোদ্ধা এবং তলোয়ার হাতে নেয়ার উপযুক্ত। আমরা দুটি গোত্রই পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে এই গুণ পেয়েছি। আবুল হায়শাম। হে আল্লাহর নবী, ইহুদি ও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি ও মৈত্রীবন্ধন রয়েছে। আমরা সেসব চুক্তি ও মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করার পর যদি আপনি বিজয়ী হন এবং আমাদের ছেড়ে আপনার লোকদের মধ্যে ফিরে যান, তখন আমাদের কি উপায় হবে?

মহানবী : আপনাদের রক্ত আমার রক্তের মত, আপনাদের পরিবার আমার পরিবারের মত- আপনারা আমার এবং আমি আপনাদের। আপনাদের শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং আপনাদের বন্ধুর সাথে আমি শান্তির মধ্যে রয়েছি।

অতঃপর ইয়াসরিববাসীরা একে একে এগিয়ে এলো আনুগত্যের ঘোষণা দিতে। তারা মহানবীর হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল সত্যের পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য।

তারা ঘোষণা করল : আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবো, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাস্য প্রভু মানব না। কাউকে আল্লাহর শরীক করব না। আমরা চুরি ডাকাতি বা অন্য কোনপ্রকারে পরস্ব অপহরণ করব না। আমরা ব্যাভিচারে লিপ্ত হব না। আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা, বধ বা বলিদান করব না। আমরা কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না বা কারো চরিত্রের প্রতি অপবাদ দেব না। আমরা প্রবঞ্চনা বা চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হযরতের অনুগত থাকব- কোন ন্যায্য কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি সত্যপন্থীদের শপথ ঘোষণায় মুখরিত হয়ে উঠল। আকাশের চাঁদের উজ্জ্বলতা প্রত্যেকের চোখে চোখে। আলোকিত হয়ে উঠছে তাদের হৃদয়ও।

অকস্মাৎ দূর থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার : মক্কাবাসীগণ হে মিনার জনগণ! তোমরা

www.pathagar.com

ঘুমাচ্ছ! আর এদিকে হতভাগাটা তার দলবল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে।

চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা গেল আকাবার উপত্যকার সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে। মহানবী আগের মতই শান্ত ও স্থির। বললেন : ঐ শয়তানটাকে চিৎকার করতে দিন। ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। এখন সবাই নিজ নিজ জায়গায় চলে যান।

আব্বাস : আমাকে অনুমতি দিন, আমরা কালই নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মিনা আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দিই।

মহানবী : না, আল্লাহ্ আমাদেরকে এ ধরনের আদেশ দেননি। শান্তিপূর্ণভাবে আমরা এখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করব।

আকাশে মেঘদলের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে জিলহজ মাসের রূপালি চাঁদ।

২.

কাউন্সিল হল। সমবেত হয়েছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের সবার মধ্যে উদ্বেগের ছাপ। তারা নিজেদের মধ্যে কলগুঞ্জন করছে। এ সময় ঘরে ঢুকল এক ব্যক্তি। পরনে তার নোংরা গরম কাপড়। এক ধরনের বিশ্রি হাসি ঝুলে আছে তার ঠোঁটে। সবার কাছেই লোকটিকে চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু কেউই তার সঠিক পরিচয় দিতে পারল না। লোকটি নিজেই তার পরিচয় দিল : আমি নজদ্-এর একজন শেখ। শুনতে পেলাম, আপনারা মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে বেশ অসুবিধায় আছেন। আমারও বিশ্বাস, তাকে বাড়তে দিলে জগতব্যাপী আমাদের সনাতন ধর্মগুলো সর্বনাশ হবে। সুতরাং, অঙ্কুরেই তার বিনাশ প্রয়োজন। আজকের সমাবেশ নিশ্চয়ই এজন্যেই। আমি হয়ত আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারব।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আগন্তুককে স্বাগতম জানাল। শুরু হল তাদের আলোচনা। প্রথমে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হল। ইয়াসরিবে নতুন ধর্ম ইসলাম অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে। মক্কার ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা একে একে চলে যাচ্ছেন। ইয়াসরিবেই তারা বসবাস করবেন বলে স্থির করেছেন। এখন মক্কায় রয়েছেন মহানবী, আবু বকর, আলী ও কয়েকজন অনুসারী মাত্র। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই তারাও মক্কা ত্যাগ করবেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ভাবছে : কিছুতেই অঙ্কুরকে মহীরুহে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। যে করেই হোক, মুহাম্মদকে থামিয়ে দিতে হবে। একবার মুহাম্মদ হাত ছাড়া হলে তাঁর সঞ্চিত শক্তির মুকাবিলায় মক্কার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করল মুন্নাবা বিন হাজ্জাজ। আকাবায় ইয়াসরিববাসীদের সাথে মহানবীর যোগাযোগ ও শপথ অনুষ্ঠান, মুসলমানদের একে একে মক্কা ত্যাগের সুযোগ দেয়ার জন্য নেতাদের সমালোচনা করে সে বলল : তোমরা

www.pathagar.com

মক্কার হোমরা-চোমরা নেতা। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই মহাভীতু লোক। মুহাম্মদের যে মনের জোর রয়েছে তার এতটুকুও তোমাদের মধ্যে নেই। আগে তোমরা ভয় পেতে তাঁর আল্লাহকে। এখন ভয় পাও তাকেই আর তার সঙ্গী-সাথীদের।

যুবায়ের! তুমি অন্যায় কথা বলছ। আমরা কাউকে ভয় পাই না- না তার আল্লাহকে, না তাকে। আসলে আমরা আলাপ আলোচোনার মাধ্যমে এর সমাধান করতে চেয়েছিলাম।

একজন : এ আলোচনার ফল কি হয়েছে? মুহাম্মদ দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যারাই তার সাথে আলাপ করতে গিয়েছে তারাই মুসলমান হয়েছে। ও তো জাদু জানে।

অন্যজন : যুক্তিতর্কে কে কবে মুহাম্মদকে হারাতে পেরেছে! যুক্তিতর্কের জালে সে আমাদেরকেই আটকে ফেলেছে।

অন্যজন : আসলে এজন্যে দরকার ছিল মুহাম্মদের সাগরেদদের এক একটাকে ধরে ধরে আচ্ছামত পিটুনি লাগানো। তাহলে আল্লা খোদার নাম একদিনে ভুলে যেত।

অন্যজন : ব্যাপারটা কি এতই সোজা? চেষ্টা তো কম হয়নি! মক্কার রাজপথগুলোতে এজন্য মুহাম্মদের শিষ্যদের রক্ত লেগে আছে। মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়ালে বাতাসে এখনো বেলালের আহাদ আহাদ আর্ত চিৎকার শোনা যায়।

অন্যজন : মুহাম্মদকেও তো কম শায়েস্তা করা হয়নি। আমাদের উৎপাতে পালিয়ে গেল তায়েফে। সেখানেও কম নাস্তানাবুদ হয়নি। ধৈর্য বটে। রক্তে শরীর ভাসিয়েও আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে : তারা অবুঝ, না জেনে অপরাধ করেছে, তুমি মাফ করে দাও।

অন্যজন : ওরা বলে, নবীরা হলেন আগুনে পোড়া সোনার মত, দুঃখ কষ্টে তাঁদের যাচাই করা হয়।

অন্যজন : খুব যে মুহাম্মদপ্রীতি দেখছি, মুহাম্মদী হবে নাকি?

অন্যজন : মুহাম্মদ আমাদের যত বড় শত্রুই হোক, তার গুণগুলো তো আর আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

হারিস : তেমনি বানিয়েছে সে তার অনুসারীদের।

নজদ্ শেখ : এর পরও সে আমাদের শত্রু। সবচাইতে বড় কথা, সে আমাদের সারা জীবনের জানের শত্রু হয়ে থাকবে। তারগুণগুলো ধ্বংস করতে হবে। তার অনুসারীদের ধ্বংস করতে হবে। তা না হলে আমাদের সবার ধ্বংস অনিবার্য। আসলে আমরা তো ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। যদি মুহাম্মদকে খতম করা না যায়, তাহলে আমরাই পড়ে যাব ধ্বংসের অতল খাদে।

আবু সুফিয়ান : এসব কথা দিয়ে আর কি হবে! এখন আমাদের একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা কি জান আবুবকর দুটি তাজা উট কিনেছে? শীঘ্রই ওরা মক্কা ছাড়ছে। এজন্য আমাদের যা কিছু করার আজ কালের মধ্যেই করতে হবে।

আবুল বখতারী : না, মুহাম্মদকে পালাতে দেয়া যায় না। এখনি তাকে ধরে এনে একটা

www.pathagar.com

ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। আমরা তাকে রুটি পানি কিছুই দেব না। এভাবে সে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।

আসওয়াদ : মুহাম্মদ কি করবে জানা আছে। ও ব্যাটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অত কিছু নেই। যাক ব্যাটা যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। আপদ বিদেয় হোক। আরেক শহরে গিয়ে তার জাদুর খেলা দেখাক, তার খোদার নামাজ পড়ুক।

নজদ শেখ : এসব প্রস্তাবের কোন মানেই হয় না। আবোল-তাবোল না ভেবে আমাদেরকে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সকলে : তাহলে আমরা কি করব? আমাদের কি করা উচিত?

নজদ শেখ ও আবু জেহেল : মুহাম্মদকে হত্যা করে তার উৎপাত বন্ধ কর। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একবাক্যে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল।

উতাবা : লাঠির এক আঘাতে আমি মুহাম্মদের মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দেব।

জামাইয়া : আমার এই নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে আমি তার মুণ্ডু কেটে নিয়ে আসব।

হাকাম : আমি তার জাদুমাখা চোখদুটো উপড়ে নেব।

আবু সুফিয়ান : যাই করো, সবাই সাবধানে থেকো। কেউ ভয় পেয়ো না। কাজ করতে গিয়ে তোমাদের হাত যেন এতটুকু না কাঁপে। মনে রেখো, মুহাম্মদ একজন রক্ত মাংসেরই মানুষ, আমাদের মতই মানুষ। তাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ থেকে কোন সেনাবাহিনী নেমে আসবে না. তেমনি এই মাটির পৃথিবীতে তার কোন বাহিনী নেই গুটিকয়েক অপদার্থ অন্ধ ভক্ত ছাড়া।

নজদ শেখ : তার কি আছে না আছে, সেইটে বড় কথা নয়। তোমরা সাবধান থেকো। মুহাম্মদ যেন কোনক্রমেই আগামীকালের সূর্যোদয় না দেখে।

সকলে : তাই হবে।

নজদ্ শেখ : তবে তোমরা কেউ এককভাবে মুহাম্মদের হত্যার দায় নিতে যেয়ো না। তাহলে তোমাদেরকে তার লোকজন ও আত্মীয়স্বজনের সাথে দীর্ঘ দিনের রক্তপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।

আবু জাহেল : শেখ ঠিকই বলেছে। একা কেউ তাকে হত্যা করলে তার গোত্রের উপর চড়াও হয়ে রক্তপণ চাইবে। এজন্য আমার মতে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সাহসী সম্ভ্রান্ত যুবক বেছে নিতে হবে। এরা সবাই ধারালো তলোয়ার নিয়ে মুহাম্মদের অনুসরণ করবে। সুযোগ পেলেই সবাই একই সাথে আঘাত করে তাকে হত্যা করবে। এতে আমাদের কোন গোত্রই দলছাড়া হতে পারবে না। আর মুহাম্মদের গোত্রের লোকরা আমাদের সবার সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। তারা যদি রক্তপণ দাবিই করে তাহলে না হয় আমরা সবাই ভাগ করে তা দিয়ে দেব।

নজদ শেখ : চমৎকার প্রস্তাব।

www.pathagar.com

সকলে : তাই হোক।

আবু সুফিয়ান : আজ রাতেই এ কাজ সারতে হবে। আমি খবর পেয়েছি, মুহাম্মদ এখন তার বাড়িতেই রয়েছে। আমার লোক তার উপর নজর রাখছে। দুপুরে সে তার বন্ধু আবু বকরের বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমরা সবাই সন্ধ্যায় তার বাড়ি ঘেরাও করব।

নজদ শেখ : আজ রাতই হবে তার শেষ রাত। মুহাম্মদের রক্তের উপর কাল সূর্যোদয় হবে।

পরামর্শ সভা শেষ হল। একে একে সবাই চলে গেল। নজদ এর শেখ বেরিয়ে এল মক্কার রাজপথে। আনমনে একা একা হাঁটছে সে। ঠোঁটে ঝুলানো তার কুৎসিত হাসি। আনমনে ভাবছে সে : চমৎকার রক্তের খেলা শুরু হচ্ছে। আমি কি কুরাইশদের সাথে থাকব? কোথায় যাব আমি? আমি তো বরাবর ওদের সাথেই রয়েছি।

নজদ-এর শেখের ছায়া ঘনায়মান সন্ধ্যার সাথে বড় হচ্ছে। রাত নামার সাথে সাথে তার ছায়া পুরো ঢেকে ফেলল মক্কা নগরীকে।

৩.

কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের বাছাই করা যুবকরা ধীরে ধীরে এসে জমায়েত হল মহানবীর বাসভবনের সামনে। তারা ঘিরে রাখল তাঁর বাসভবন। বেরুনোর সবগুলো পথের উপর তার তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল। এমনকি গলি পথেও বসাল পাহারা। বাসভবনের কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে আবু জেহেল ও উতাবা,কিছু দূরে আবু সুফিয়ান।

বাসভবনের ভেতরে কেউ আছে কি নেই বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে ঘাতক দল। তাদের চোখে রক্ত তৃষ্ণা। তারা উল্লাস বোধ করছে, আর কিছুক্ষণ পরেই তাদের তলোয়ার সিক্ত হবে তাদের চরম শত্রুর রক্তে। আবু জেহেল চাপা উল্লাস নিয়ে ফিস ফিস করছে উতবার সাথে। এগিয়ে এল আবু সুফিয়ান। আবু জেহেল বলল : মুহাম্মদের বাগাড়ম্বর তো তোমরা জান। সে নাকি তার সঙ্গীদের নিয়ে আরব ও পারস্যের উপর তার ধর্মের প্রভাব বিস্তার ঘটাবে। আধিপত্য কায়েম করবে। সে বলে, মৃত্যুর পর সবাই আবার বেঁচে উঠবে। তারা বেহেশতের বাগিচায় প্রবেশ করবে। তাকে যারা অনুসরণ করে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমরা যখন আবার বেঁচে উঠবে তখন তোমাদেরকে দোযখের আগুনে পোড়ানো হবে।

এ সময়ই খুলে গেল বাসভনের দরজা। বেরিয়ে এলেন কেউ একজন। রাতের আঁধারে তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। মনে হয়, তিনি মহানবীই। এসে দাঁড়ালেন আবু জেহেলের মুখোমুখি। বললেন : হ্যাঁ এই কথা আল্লাহ ও আমি বলেছি।

তিনি আবু জেহেলের মুখমণ্ডলে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিলেন। আর্তনাদ করে উঠল আবু জেহেল। সমস্ত পৃথিবীটাই তার সামনে দুলে উঠল। জ্বলছে চোখ। সে চোখ ডলতে

www.pathagar.com

লাগল। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে চলে যাচ্ছেন। জ্ঞানময় কুরানের কসম, নিশ্চয় তুমি প্রেরিত রাসূলগণের অন্তর্গত, সরল পথে আছ। মহাশক্তিমান দয়াময় এটি নাযিল করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করে পথ দেখাও যাদের পূর্ব পুরুষদের নসিহত করা হয়নি, ফলে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। নিশ্চয় এদের অনেকের বিরুদ্ধে আল্লাহর কথা ঠিক হয়ে গেছে, সুতরাং এরা ঈমান আনবে না। নিশ্চয়ই আমি এদের ঘাড়ে মোটা বেড়ি রেখেছি। তা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, ফলে তারা মাথা উঁচু করে রয়েছে। আর আমি এদের সম্মুখে ও পেছনে বেড়া দিয়ে এদেরকে ঘিরে রেখেছি, ফলে এরা দেখতে পায় না। বলতে বলতে তিনি দূরে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান ও উতবার এগিয়ে এসে আবু জেহেলের চোখের ধুলো ঝেড়ে দিল।

আবু সুফিয়ান : লোকটি কি মুহাম্মদ?

আবু জেহেল : আরে না। গলার স্বরটা ওর মুহাম্মদের মত, তবে সে মুহাম্মদ নয়।

আবু সুফিয়ান : তোমাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। একবার তুমি কাবা ঘরে মুহাম্মদের মাথা ফাটাবে বলে পাথর তুলেছিলেন তখন তোমার হাত কেঁপে গিয়েছিল। এবারও তুমি কিছু করতে পারলে না। বরং তোমার আর্তনাদ শুনে আমাদেরকে দৌড়ে আসতে হল তোমাকেই রক্ষা করতে।

আবু জেহেল : ঘরের দরজা যখন খুলে গেল তখন লোকটিকে দেখতে পেলাম। আমার মনেই হয়নি যে লোকটি মুহাম্মদ। অচেনা লোককে আঘাত করে আমাদের আসল দুশমন মুহাম্মদকে সতর্ক করে দেয়া আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করিনি।

উতবা : আমি দেখলাম লোকটা মুহাম্মদই । কিন্তু আমার মনে হল, আমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমার হাত যেন পাথর হয়ে গেছে।

জামাইয়া : ব্যাপারটা দেখছি রহস্যময়। তাকে নিয়ে আর তার চলে যাওয়া নিয়ে আমাদের কারুর কথার সাথে কারুর কথা মিলছে না। সে হতে পারে মুহাম্মদ কিংবা নয়। কিন্তু ব্যাপারটাই কেমনই যেন ভয় জাগানো মনে হচ্ছে। এটা কেমন করে সম্ভব?

আগন্তুক : তোমরা এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছ?

আবু জেহেল : মুহাম্মদের জন্য।

আগন্তুক। মুহাম্মদ চলে গেছে। সে যেখানে যেতে চেয়েছিল এতক্ষণে বোধ হয় সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে।

এ সময় কয়েকজন সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মহানবীর ঘরে উঁকি দিল। তারা দেখতে পেল সবুজ আলখেল্লায় আপাদমস্তক ঢেকে কে যেন মহানবীর খাটে শুয়ে আছে। তারা ঘরে ঢুকল।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান : আরে এই তো! এই আলখেল্লাটাই তো মুহাম্মদ গায়ে দিত অহি নাযিল হওয়ার সময়।

আবু জেহেল : এবার বাছাধন খাঁচার মধ্যে আটকা পড়েছে।

ঘুমন্ত ব্যক্তির গা থেকে আলখেল্লা সরে গেল। উঠে দাঁড়ালেন আলী। বললেন : তোমরা এখানে কেন?

ঘাতকরা হতভম্ব হয়ে গেল। বলল : আরে এ যে আলী ইবনে আবু তালিব! তাহলে মুহাম্মদ কোথায়?

আলী : আল্লাহর নবীকে পাহারা দেয়ার জন্য আমি কি তোমাদের পাহারাদার?

আবু সুফিয়ান : মুহাম্মদের খাটে তুমি ঘুমিয়ে ছিলে কেন?

আলী : আল্লাহর নবীর হুকুমে। তাঁর কাছে গচ্ছিত জিনিসপত্র প্রকৃত মালিকদের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য আমি এখানে রয়ে গেছি।

আবু জেহেল : সে কথা থাক। চলো আবু বকরের বাড়ি যাই। সেখানে আমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মদকে ধরতে পারব।

ঘাতকরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গভীর রাত। আবু বকরের বাস ভবনে মহানবীকে দেখে আয়িশা ও আসমা বিস্মিত হলেন। শব্দ শুনে আবু বকর কক্ষাভ্যন্তর থেকে এলেন। এত রাতে মহানবীকে দেখে বিস্মিত হলেন।

আবু বকর : আল্লাহর নবী, এত রাতে আপনি! নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে?

মহানবী : ঘর থেকে সব চাকর আর অন্য সবাইকে চলে যেতে বলুন।

আবুবকর : তাহলে আপনার সাথে আমিও যাব।

মহানবী : হ্যাঁ আমার সফরসঙ্গী হবেন আপনিই।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা বাসভবনের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাতের অন্ধকারে তাঁরা পাড়ি জমালেন দীর্ঘ পথ।

খানিক পরেই আবু বকরের বাসভবনের সদর দরজায় করাঘাত হল। আয়িশা ও আসমা দরজা খুলে দিলেন। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ঘাতক দল। তারা বাসভবনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথাও মহানবী বা আবু বকরের হদিস করতে পারল না। তারা দুবোনকে জিজ্ঞেস করল: মুহাম্মদ আর আবু বকর কোথায়? দু বোন জবাব দিলেন : তাঁরা বাড়িতে নেই।

আবু জেহেল আসমার ঘাড় ধরে ভয়ংকর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : তোমার আব্বা কোথায়? আসমা জবাব দিলেন আমি জানিনা।

আবু জেহেল আসমার মুখে ঘুষি মারল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন : আবু জেহেল তোমার হাত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক।

www.pathagar.com

বালিকার অভিশাপে আবু জেহেল বুঝি বা একটু কেঁপে উঠল।

৪.

মক্কার পথে পথে নকীবগণ ঘোষণা করল : আমাদের প্রধান শত্রু মুহাম্মদ ও আবু বকর পালিয়েছে। তাদেরকে যে বা যারা ধরে দিতে পারবে- জ্যান্ত কিংবা মৃত তাকে বা তাদেরকে কাবাঘরে রক্ষিত দেব দেবীদের পক্ষ থেকে একশ উট পুরস্কার দেয়া হবে। দেবতা হুবল আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি বিজয়ী ও পুরস্কৃত বীরের প্রার্থনা শুনবেন ও মঞ্জুর করবেন। আরবের প্রত্যেক সাহসী পুরুষকে এই পুরস্কার লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র প্রচারিত হল এই লোভনীয় পুরস্কারের খবর। চারদিকে ঘাতকদল বেরিয়ে পড়ল সত্যপন্থী দুজন নিরস্ত্র মানুষের সন্ধানে।

সওর পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন মহানবী ও আবু বকর।

জনবিচ্ছিন্ন গুহায় তাঁদের রাত ও দিন কাটছে। আবু বকরের ছেলে আব্দুল্লাহ তাঁদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করছেন। তিনি রাতে লোক-চোখের আড়ালে গুহায় এসে দুজনকে জানিয়ে যান বাইরের জগতের খবর, কুরাইশদের তৎপরতার হালচাল।

আবু বকরের ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রা। ইসলাম গ্রহণের পর এখন মুক্ত মানুষ। আবু বকরের ছাগল ও মেষপাল চরানোর কাজ নিয়েছেন তিনি। ছাগল ও মেষ চরাতে চরাতে তিনি রাতের দিকে গুহার কাছাকাছি আসেন। ছাগ ও মেষের দুধ দিয়ে যান গুহা আশ্রিত মহানবী ও আবু বকরকে দুধ পান করেই তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এছাড়া তাঁরা সাথে করে তিন দিনের খাবার নিয়ে এসেছেন। উমাইয়া বেরিয়েছে তাঁদের খোঁজে। পায়ের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে সে তাঁর দল নিয়ে সওর পর্বতের সেই গুহার কাছে এসে উপস্থিত হল। তার ধারণা এই গুহাতেই ইয়াসরিবগামী পথিক দু'জন আশ্রয় নিয়েছেন। পায়ের চিহ্ন সে গুহার প্রবেশ পথও আবিষ্কার করে ফেলে। এই গুহাতেই কেউ লুকিয়ে আছেন কিনা তাই নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ দেখা দেয়। একজন গুহার ভেতরে প্রবেশ করল।

গুহার বাইরে শত্রুপক্ষের শব্দ শুনে আতংকিত হয়ে উঠলেন আবু বকর। তাঁর মনে হতে লাগল, এই বুঝি এখুনি তাঁরা ধরা পড়ে যাবেন।

আবু বকর : ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। ওদেরকে তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে রহম করো।

মহানবী : শান্ত হোন, চিন্তা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

আবু বকর : হে আল্লাহর নবী, তারা এখানেই, ঐ একজন গুহার মাধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমরা এখন কোথায় যাবো?

www.pathagar.com

মহানবী : (আবৃত্তি করেন) এবং স্মরণ কর, যখন কাফেররা তোমাকে বন্দি করেন কিংবা খুন করার কিংবা তোমাকে নির্বাসন দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা প্রতারণা করছিল এবং আল্লাহও কৌশল করেছিলেন এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

গুহায় অনুপ্রবেশকারী (হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করে) সাপ!

উমাইয়া (গুহার বাইরে থেকে) : সাবধান! গুহায় সাপ থাকতে পারে। এমন বিপজ্জনক গর্তে মুহাম্মদ থাকতেই পারে না। পালানোর ইচ্ছাই যদি তার থাকত, তাহলে মক্কায় লুকানোর জন্য তার কোন বাড়ির অভাব নেই। মরতে সে এমন জায়গায় আসবে না।

অনুপ্রবেশকারী : হুবলের কসম! ওরা এখানেই এই গুহায় রয়েছে। ঐ তো ওদের পায়ের ছাপ। এই গুহায় এসেই মিশে গেছে। এখান থেকে তাদের পায়ের ছাপ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? পাখি হয়ে কি তারা উড়ে গেছে?

আবুবকর : হে আল্লাহর নবী, আমরা ধরা পড়তে যাচ্ছি। আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না। আমার সব দুশ্চিন্তা আপনাকে নিয়ে। আমরা মাত্র দুজন।

মহানবী : আমরা দুজন লোক এখানে রয়েছি, আর আমাদের সাথে রয়েছেন মহান আল্লাহ। ওরা যদি এদিক দিয়ে ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ গুহার উল্টো দিকের মুখ আমাদের জন্য খুলে দেবেন।

আবুবকর উল্টোদিকে তাকালেন। দেখা যাচ্ছে আকাশ ছুঁয়েছে সাগরকে। উল্টোমুখেই অপেক্ষা করছে পাল তোলা নৌকা। আবুবকর বিস্ময়ে বলে উঠলেন? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ মহান।

উমাইয়া গুহায় প্রবেশদ্বার পরীক্ষা করে দেখল, এর মুখেই মাকড়সার জাল। ঠিক মধ্যিখানে ঝোপ ডান পাশে একটা কবুতর ও তার ডিম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এখানে ওরা কেউ নেই।মাকড়সার জাল আর ঝোপ আর কবুতরের ডিম দেখেও কি তোমরা কিছু বুঝতে পারছ না? চলো, অন্য কোথাও গিয়ে ওদের খোঁজ করি। চলো, হুনায়ন পর্বতের দিকে ওদের পাওয়া যেতে পারে।

ঘাতকদল গুহা থেকে ফিরে চলল।

৫.

সোমবার সকাল। গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। তাঁদের কাছে খবর পৌঁছেছে কুরাইশরা এ পথে আপাততঃ তাঁদের খোঁজার কাজ থেকে বিরত রয়েছে। তিন দিন তিন রাত গুহায় বসবাসের পর মহানবী মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশেই তাঁর তিন সফর সঙ্গী আবু বকর আমেরও আবদুল্লাহ ইবনে উরিকাত। আবু বকরের মেয়েরা খাবার দিয়েছেন সাথে। দূর পথ পাড়ি দেয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে তিনটি উট। এরমধ্যে দুটি উট আবু বকর এই সফরের কথা ভেবেই কিনেছেন। মহানবী

www.pathagar.com

বললেন। এই উট কার?

আবু বকর : এদের একটির উপর আপনি বসবেন।

মহানবী : দান হিসেবে আপনি আমাকে দিচ্ছেন?

আবু বকর : মনে করুন তাই।

মহানবী : তা হয় না। দানের উটে আমি উঠতে পারি না।

আবু বকর : আল্লাহর নবী, বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে আপনি এটি গ্রহণ করুন।

মহানবী : তবুও নয়। আমি আপনাদের নেতা ও পরিচালক। সব ধরনের লোভ থেকে আমাকে মুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমার এই উটের প্রয়োজন। এ জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, এই উট আপনি আমার কাছে বিক্রি করবেন।

আবু বকর : আল্লাহর নবী যা ভাল বোঝেন তাই হোক।

মহানবী উটের পিঠে উঠে বসলেন। তিনি তাকালেন তাঁর জন্মভূমির দিকে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, হে মক্কা, পৃথিবীতে আমার সব চাইতে প্রিয় স্থান তুমি, আমার কাছে তুমি সুন্দর। এরপরও তোমাকে আমি ছেড়ে যাচ্ছি। তোমার লোকজন আমাকে তাড়িয়ে না দিলে আমি কখনোই তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

অত:পর তিনি আবৃত্তি করলেন : "যিনি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছেন তিনি আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।"

সত্যপন্থীদের কাফেলা রুক্ষ পর্বত প্রান্তর থেকে এগিয়ে চলল নতুন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। ইয়াসরিবের পথে মহানবীর কাফেলা পর পর কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। ঘটনার কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়।

১। সুরাকা : মহানবী ও আবুবকরকে ধরিয়ে দিতে পারলে কুরাইশরা একশত উট দেবে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ-পুরস্কার আমিই পাব। বসেছিলাম এক আড্ডায়। এমন সময় এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল? একটা ছোট্ট কাফেলা সমুদ্র উপকূল দিয়ে যাচ্ছে। তার বিশ্বাস, সেইটেই মহানবীর কাফেলা। তার কথা শুনেই আমি বুঝতে পারলাম, সে ভুল দেখেনি। একশ' উট বুঝি বা হাতছাড়া হয়ে যায়। তাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করার জন্য বললাম : এ খবর ঠিক নয়। আমি নিজেই জানি, এ কাফেলায় মহানবী নয় অন্য সব লোকজন যাচ্ছে। সবাই আমার কথা বিশ্বাস করল। সেইটেই আমি চেয়েছিলাম। আমি কিছুক্ষণ পরেই বাড়ি ফিরে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটালাম কাফেলার খোঁজে। দুদিন দুরাত বিরতিহীন ছুটে আমি তাদের দেখতে পেলাম। উত্তেজনায় আমি ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলাম। আমার ঘোড়া হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এই অলক্ষুণে দুর্ঘটনা কেন। আমি তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। জবাব এল, না। কিন্তু পিছু হটি কি করে? আবার ঘোড়া ছুটালাম। শুনতে পেলাম, মহানবী কুরআন আবৃত্তি করছেন, কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। লোভে তখন আমার চোখ চিকচিক করছে।

www.pathagar.com

যখন আমি বর্শা তুলেছি তখনি হটাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পাদুটো বালিতে প্রোথিত হয়ে গেল। আমার ভেতরটা ধক করে উঠলো। তীরের পরীক্ষায় আবার আমি নেতিবাচক জবাব পেলাম। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমার আর কোন সংশয় রইলো না যে মহানবীর জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি চিৎকার করে ডাকলাম : হে মক্কার আরোহীগণ! একটু দাঁড়ান। আমি সুরাকা, আমার কিছু কথা আছে, কোন অনিষ্টের ভয় নেই, আমি মহানবীর কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করলাম। আমি তাঁর কাফেলাকে আমার উট, খাবার ও অস্ত্র দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, পথে অন্য কোন ঘাতক দল দেখলে আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, মহানবীর কাফেলার সন্ধান দেব না। অত:পর আমি মহানবীর নিকট থেকে একটি পত্র নিলাম। যা একদিন আমার কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাফেলা দিগন্ত প্রসারিত মঞ্জিলের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

২। উম্মে মাবাদ : তাঁকে দেখলাম। এমন অনিন্দ্য সুন্দর পুরুষ আমি কখনো দেখিনি। উজ্জ্বল মুখ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। সদাচারণ ও ভদ্র। মুখ লম্বাও নয়। গোলও নয়। তাঁর চুল কাল, তাঁর মেরুদণ্ড সোজা ও লম্বা। ঘন দাড়ি। সহজভাবে হাঁটেন। দেখলে মনে হয় খুব ভারী নন। নীরব থাকার সময় তাঁকে গম্ভীর দেখায়। যখন কথা বলেন, যেন আদেশের ভঙ্গিতে কথা বলেন। তাঁর আচরণ এমনই যে, সবাই তাঁকে মান্য করতে চায়। তাঁর কথা দীর্ঘও নয়। আবার কমও নয় তাঁর সঙ্গীরা সব সময়ই তাঁকে বেষ্টন করে থাকেন। তাঁর কথা সাগ্রহে শোনেন এবং তাঁর হুকুম উৎফুল্ল চিত্তে পালন করেন।

তিনি তাঁর কাফেলা নিয়ে এলেন আমাদের তাঁবুতে। আমার স্বামী তখন বাইরে। তিনি তাঁর ও তাঁর সাথীদের জন্য খাবার চাইলেন। তখন ঘরে কোন খাবারই ছিল না। একটা ভেড়া দেখে তিনি জানতে চাইলেন, ওটি দুধ দেয় কিনা। আমি না বললে তিনি ভেড়াটিকে দোহন করার অনুমতি চাইলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম : ওর তো দুধই নেই। তিনি বিসমিল্লাহ বলে ভেড়ার বটে হাত রাখলেন। আর কী আশ্চর্য! ভেড়াটি দুগ্ধবতী হয়ে গেছে। তিনি প্রথম দুধের পাত্রটি আমাকে দিয়ে বাকি দুধ তাঁর সাথীদের নিয়ে খেলেন। অত:পর তাঁরা চলে গেলেন। আমার স্বামী ফিরে এলেন। তাঁকে আগন্তুকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা বললে আমার স্বামী বললেন : মক্কায় যে ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা লোকে বলে এবং যে নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করে, এই লোকটি নিশ্চয়ই সেই লোক। আমি দু:খিত যে, আমি নিজে উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর সাথেই যাত্রা করতাম।

৩। বারিদা : কুরাইশদের পুরস্কার ঘোষণার কথা শুনেছি। আর শুনেছি, মহানবী মদিনায় আসছেন। সত্তরজন অনুচর নিয়ে ওঁৎ পেতে রইলাম। দেখতে পেলাম, ছোট কাফেলা এগিয়ে আসছে। আমার সত্তরজন অনুচর নিয়ে মার-মার কাট কাট বলে এগিয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

অবাক হয়ে দেখি, মহানবী ভয়শূন্য। তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যময়। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। কেঁপে উঠলাম আমি। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার দেহ-মন। কী এক ভাবরসে আপ্লুত হয়ে পড়লাম আমরা সবাই। মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন : পথিক, তুমি কে? কি চাও?

বললাম : আমি বারিদা। আসলাম গোত্রপতি।

তিনি বললেন : আসসালাম- শান্তি, শুভ কথা।

জিজ্ঞেস করলাম : আর আপনি কে?

বললেন : আমি মক্কার অধিবাসী, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। আল্লাহর নবী। তাঁর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। পাষাণ-হৃদয় দস্যু দল আমরা। আমরা লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আমাদের সত্য পথের সন্ধান দিলেন। আমি এবং আমার সত্তরজন অনুচর তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনীর মত আমরা নাঙ্গা তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে চললাম। আমি ঘোষণা করতে করতে চললাম : শান্তির রাজা আসছেন। মুক্তির কর্তা আসছেন। সন্ধির স্থপতি আসছেন। ন্যায় ও বিচারে পৃথিবীতে বেহেশতী রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা আসছেন। জগতবাসীর নিকট এই আনন্দ সংবাদ। যুগ যুগ ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী আসছেন। জগতবাসীর জন্য সুসংবাদ। কালের পথ পাড়ি দিয়ে তিনি আসছেন। মহাকালব্যাপী তাঁর এই শ্রান্তিহীন বিরতিহীন যাত্রা। জগতবাসীর জন্য আনন্দ সংবাদ! ◆

www.pathagar.com

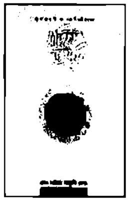

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

বংশ পরিচয়

মহানবী (সা) আদি মানব হযরত আদম (আ) এর পঞ্চাশতম অধঃস্তন পুরুষ। হযরত আদম (আ) পর্যন্ত উর্ধদিকে যে বংশ-পরম্পরা পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :[১] হযরত মুহাম্মাদ (সা), তদীয় পিতা আবদুল্লাহ্, তদীয় পিতা আবদুল মুত্তালিব (আবদুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম শায়বা), তদীয় পিতা হাশিম (প্রকৃত নাম আমর), তদীয় পিতা আবদে মানাফ (প্রকৃত নাম আল মুগীরা), তদীয় পিতা কুসাই (প্রকৃত নাম যায়েদ), তদীয় পিতা কিলাব, তদীয় পিতা মুররাহ্, তদীয় পিতা কা'ব, তদীয় পিতা লুসাই, তদীয় পিতা গালেব, তদীয় পিতা ফিহ্‌র, তদীয় পিতা মালেক, তদীয় পিতা নাযার, তদীয় পিতা কিনানা,[২] তদীয় পিতা খুযাইমা, তদীয় পিতা মুদরিকা (প্রকৃত নাম আমের), তদীয় পিতা ইলিয়াস অথবা আলইয়াম, তদীয় পিতা মুযার, তদীয় পিতা নিযার, তদীয় পিতা মা'আদ, তদীয় পিতা আদনান,[৩] তদীয় পিতা উদ্, তদীয় পিতা মুকাওয়াম, তদীয় পিতা নাহুর, তদীয় পিতা তাইরাহ্, তদীয় পিতা ইয়া'রুব, তদীয় পিতা ইয়শজুব, তদীয় পিতা নাবেত, তদীয় পিতা ইসমাঈল (আ), তদীয় পিতা ইবরাহিম (আ), তদীয় পিতা তারেহ (অপর নাম আযর) তদীয় পিতা নাহুর, তদীয় পিতা সারুগ, তদীয় পিতা রাউ, তদীয় পিতা ফালেখ, তদীয় পিতা উবায়ের, তদীয় পিতা আরফাখশাদ, তদীয় পিতা সাম, তদীয় পিতা নূহ (আ), তদীয় পিতা লামক, তদীয় পিতা মুত্তাওশালাখ, তদীয় পিতা আখনুখ (ঐতিহাসিকদের মতে তিনি হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম), তদীয় পিতা ইয়ারদ, তদীয় পিতা মাহলীল, তদীয় পিতা কাইনান, তদীয় পিতা ইয়ানিশ, তদীয় পিতা শীস, তদীয় পিতা হযরত আদম (আ)।

ইবনে মাসউদ (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) উভয়ে বলেন, আদনানের উপরে যারা বংশতালিকা বয়ান করে তারা মিথ্যা বলে। হযরত উমর (রা) বলেন, নসবনামা (বংশতালিকা) শুধু আদনান পর্যন্ত বয়ান করা উচিত। তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং বালাযুরীর আনসাবুল আশরাফে স্বয়ং নবী পাকের (সা) এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি

www.pathagar.com

মায়াদ বিন আদনান বিন উদাও পর্যন্ত বংশ তালিকা বয়ান করার পর বলেন, পরবর্তী উর্ধতন বংশতালিকা বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী। কিন্তু উর্ধমুখী বংশ তালিকা সংরক্ষিত না থাকার অর্থ এই নয় যে, ইসমাঈল সন্তানদের মধ্যে আদনানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ রয়েছে। সমগ্র আরববাসী এ ব্যাপারে একমত যে, আদনান বনী ইসমাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আরবরা এ ব্যাপারে একমত হওয়া তার সত্যতার অনস্বীকার্য প্রমাণ। কারণ আরববাসী কুলজীর বড়ো গুরুত্ব দিত। বংশানুক্রমে ক্রমাগত চলে আসা বর্ণনা পাওয়া না গেলে কারো বংশ সম্পর্কে একমত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০)

মহানবীর (সা) মাতৃকুলও একই কুরাইশ বংশ-সম্ভূত। যেমন, মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরাহ ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহির ইবনে নাদার। মা আমিনার মাতা বারা বিনতে আবদুল উয্যা ইবনে উসমান ইবনে আবদুদদার ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নাদার।[৪]

এভাবে দেখা যায়, মহানবী (সা) পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আদি মানব থেকে মহানবী (সা) পর্যন্ত বংশানুক্রমিক ধারার বিবরণ ইতিহাসে যেমন সংরক্ষিত, তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ও তেমনি সযত্নে লিপিবদ্ধ।

মহানবীর (সা) আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই মহান স্রষ্টা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, যাতে মানবজাতি তাঁর আগমন সম্পর্কে সজাগ হয় এবং যথাযথ মর্যাদায় তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর সকল বড় বড় ধর্মগ্রন্থে তাঁর আগমনের পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদে, বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, তৌরাত (যা বর্তমানে Old Testament নামে খ্যাত) এবং ইঞ্জিলে (বর্তমানে যা বাইবেল বা New Testament নামে পরিচিত) বিভিন্ন প্রসঙ্গে মহানবীর (সা) আবির্ভাবের পূর্বাভাষ এবং তাঁর অতুলনীয় মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।[৫]

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে যেমন পূর্বাহ্নেই সে খবর প্রচারিত ও সার্বিক প্রস্তুতি গৃহীত হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির আগমনের পূর্বেও তেমনি মানবজাতিকে যথাযথ অবহিত করা হয়। ফলে তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় মানবজাতি সাগ্রহে অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিল। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিশারদ অনেক মনীষীই তাঁকে দেখে অথবা তাঁর পরিচিতি শুনেই তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

জন্মের পর মা আমিনা পুত্রের নাম রাখেন মুহাম্মাদ। দাদা আবদুল মুত্তালিব আদর করে ডাকতেন আহমদ। পরবর্তীতে এ দুটো নামেই তিনি পরিচিত হন। মহাগ্রন্থ আল-

www.pathagar.com

কুরআনেও রাসূলুল্লাহকে (সা) এ দু'টি নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আরো জনশ্রুতি আছে যে, গর্ভাবস্থায় মা আমিনা স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর ভেতর থেকে এমন একটা আলো বিচ্ছুরিত হলো যা দিয়ে তিনি সিরীয়া ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদসমূহ দেখতে পেলেন।[৬]

ইয়ামনের পরাক্রান্ত শাসক আবরাহা যে বছর তার হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিযান করে আল্লাহর কুদরতে আবাবীল পাখির আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেই স্মরণীয় বছর অর্থাৎ ৫৭০ সালের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সুবহে সাদিকের শুভ মুহূর্তে মহানবীর জন্ম হয়। আরবের প্রখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবিত বলেন, ঐ দিন জনৈক ইহুদী মদীনার একটা দুর্গের উপর উঠে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো 'ওহে ইহুদী সমাজ! আজ রাতে আহমাদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।'[৭]

জন্মের পর তৎকালীন আরব দেশের প্রথানুযায়ী শিশু মুহাম্মাদের প্রতিপালনের জন্য ধাত্রীর তালাশ করা হয়। কিন্তু শিশু পিতৃহীন একথা শুনে কেউ তাঁকে নিতে রাজি হয় না। অবশেষে হালীমাকে ধাত্রী হিসাবে পাওয়া গেল। এতিম শিশুর কথা শুনে তিনিও প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে অন্য কোন শিশু না পাওয়ায় অগত্যা খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এতিম শিশুকেই নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। শিশুকে কোলে নেওয়ার সাথে সাথে কুদরতীভাবে হালীমার বুক দুধে ভরে ওঠে। শিশু মুহাম্মাদ তৃপ্তির সাথে দুধ-মায়ের ডান স্তন থেকে দুধ পান করে বাম স্তনটি তাঁর দুধ-ভাইয়ের জন্য রেখে দেন। পরবর্তী সব সময়েই তিনি তাই করতেন, দুটি স্তনের দুধ তিনি কখনো পান করতেন না। এভাবে জন্মের পর থেকেই তিনি ইনসাফ বা সুবিচার কায়েমের সুস্পষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেন। এ ভাবে, তিনি যে এক অসাধারণ শিশু তা জন্মের পর থেকেই প্রতিটি কাজে ও আচরণে তিনি প্রমাণ করেছেন।

শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে হালীমা তাঁদের রুগ্ন-শীর্ণ উটনীর নিকটবর্তী হয়ে দেখলেন পালান ভর্তি দুধ। হালীমার স্বামী দুধ দোহন করে স্বামী-স্ত্রীর দু'জনেই পেট ভরে সে দুধ পান করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আসার পথে যে শীর্ণ-দীর্ণ উটনী সবার পিছে পিছে কোনক্রমে চলছিল, ফেরার পথে সে উটনী শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে সবাইকে পিছে ফেলে দ্রুত এগিয়ে চললো। হালীমা ও তাঁর স্বামী উভয়েই বুঝতে পারলেন তাঁরা এক মহাকল্যাণময় শিশুর লালন-পালনের মহাসৌভাগ্য হাসিল করেছেন। এভাবে শিশু মুহাম্মাদ যতদিন পর্যন্ত তাঁদের কাছে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের সংসারে অভাবিতপূর্ব সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য বিরাজমান ছিল। ফলে নিজের সন্তানের চেয়েও অনেক বেশী আদর-যত্নে তাঁরা শিশু মুহাম্মাদকে লালন-পালন করেন। হালীমার গৃহে থাকাকালেই একদিন আল্লাহ তা'য়ালা ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীবের সীনা চাকের (বক্ষ-বিদারণ) ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। অতঃপর তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের অপত্য স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হন। কিন্তু তাঁর বয়স আট বছর পূর্ণ হলে তাঁর দাদাও ইন্তিকাল করেন। পরে চাচা আবু তালিব তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। এর কিছু দিন পর চাচা আবু তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করলে বালক মুহাম্মাদও তাঁর অনুগামী হন। পথিমধ্যে বসরা নামক স্থানে 'বাহীরা' নামে এক প্রাজ্ঞ খ্রীস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। পাদ্রী বালক মুহাম্মাদকে দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং তাঁর সম্পর্কে সবিস্তার অবগত হবার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, তৌরাত ও ইঞ্জিলে যে আখিরী নবীর বর্ণনা রয়েছে, এ বালক মুহাম্মাদই সেই প্রত্যাশিত মহামানব। তাই চাচা আবু তালিবকে তিনি অবিলম্বে ঘরে ফিরে গিয়ে বালক মুহাম্মাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার উপদেশ দেন। তাঁর কথামত চাচা আবু তালিব ভাতিজাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে যান।

কৈশোর ও যৌবনের অবস্থা

মহানবী (সা) যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, সে সমাজের লোকেরা মূর্তিপূজা করতো। তাদের নৈতিকতা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, মদ্যপান, নাচ-গান, ব্যভিচার, চুরি ডাকাতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি নানা অন্যায় ও পাপ কার্যে সমাজের লোকেরা লিপ্ত ছিল। কিন্তু সেই সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও আশৈশব তিনি এ সকল অন্যায়-অবৈধ কাজ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কখনো কোন মূর্তির পূজা করেননি এবং কোনরূপ খারাপ ও অশোভন কাজে লিপ্ত হননি। বরং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণতঃ এক অসাধারণ, ব্যতিক্রমধর্মী, অনন্য ব্যক্তিত্ব। ফলে ছোটবেলা থেকেই সকলে তাঁকে বিশেষ স্নেহ ও সমীহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এ বয়সেই তিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি কতিপয় উদ্যোগী তরুণকে নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে এক সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। সমাজের দুর্বল, নিরীহ, দরিদ্র, বিধবা ও অসহায় লোকদের সাহায্য করা, অন্যায়-দুষ্কর্ম প্রতিরোধ করা সর্বস্তরে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। নবুওত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তেইশ বছর কাল এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি সমাজ সংস্কার ও কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মহানবীর (সা) সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চরিত্র-মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত বিধবা ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা তাঁকে তাঁর ব্যবসার ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করেন। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবসা পরিচালনার ফলে তাঁর ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি ঘটে। খাদীজা তাঁর প্রতি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁকে পতিত্বে বরণ করে নেয়ার প্রস্তাব দেন। পরে অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন মহানবীর (সা) বয়স ছিল পঁচিশ এবং

www.pathagar.com

খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ। এ বয়সে ধনাঢ্য রমণীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পূর্বের ন্যায় অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতে লাগলেন। সমাজের গরীব-দুখী মানুষের সাহায্যার্থে তাঁর ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিলেন, সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। সেকালেও কুরাইশগণ বছরে একটি মাস মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে রোজা উপবাস, নিভৃত তপস্যা ইত্যাদি নানা ইবাদতে নিমগ্ন হতো। মহানবীও (সা) এভাবে বছরের একটি মাস হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্নভাবে কাটাতেন। এক মাস পূর্ণ হলে তিনি পর্বত-গাত্র থেকে অবতরণ করে প্রথমে এসে পবিত্র কা'বা সাত বার তওয়াফ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

নবুওয়াত লাভ

চল্লিশ বছর বয়সকালে রমযান মাসে হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা অবস্থায় এক মুবারক রজনীতে তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। হযরত জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী পাঠ করালেন : "ইকরা বিইস্‌মি রাব্বিকা...।" তিনি নবুওত প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু এ অত্যাশ্চর্য ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে হযরত খাজীদা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তৌরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞানে ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি খাদীজার নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে অতি আবেগের সাথে অত্যন্ত প্রত্যয়দীপ্তভাবে ঘোষণা করলেন যে, বস্তুত মুহাম্মাদ আল্লাহর নবী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এবং তাঁর কাছে হেরা পর্বতের গুহায় যিনি এসেছিলেন তিনি মহাপবিত্র ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) ছাড়া আর কেউ নন। ওয়ারাকা নিজে মহানবীর (সা) নিকট গিয়ে তাঁর মুখে সবিস্তারে সব শুনে বললেন, 'তুমি নিশ্চিতই এযুগের মানবজাতির নবী। তোমার নিকট যে দূত এসেছিলেন, তিনি মূসার নিকটও আসতেন।' এ বলে তিনি অগ্রসর হয়ে মহানবীর কপালে চুমু খেলেন।

এভাবে দেখা যায়, কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁকে দেখা বা তাঁর সম্পর্কে শুনা মাত্রই তাঁকে আখিরী নবী হিসাবে সম্যক চিনতে পারেন। চেহারা, স্বভাব, আচরণ ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে তিনি ছিলেন এমনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

মহানবীর (সা) স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন মহানবীর চাচাতো ভাই দশ বছরের বালক হযরত আলী বিন আবু তালিব। অতঃপর ইসলাম কবুল করেন খাদীজার (রা) কৃতদাস মহানবীর আযাদ করা পালক পুত্র যায়িদ ইবনে হারিসা ইবনে শুরাহবিল ইবনে কা'ব ইবনে আবদুল উয্‌যা। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন মহানবীর ঘনিষ্ঠতম সাথী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর ইবনে কুহাফা। তাঁর আসল নাম ছিল আতীক। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এবং অন্যদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন।

মহানবীর (সা) চারিত্র্য

মহানবীর (সা) চরিত্র ছিল অতুলনীয়। সৌন্দর্যময় চন্দ্রের কলঙ্ক আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু মহানবীর (সা) চরিত্রে সামান্যতম কালিমা আবিষ্কার করাও সম্ভব নয়। মানব জাতির সামনে তিনি ছিলেন এক নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের চির মহিমাময় আলোক-রশ্মি। তিনি চিরদিনই তাই আছেন এবং থাকবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা জীবন অতিবাহিত করেছেন এ প্রসঙ্গে তাঁদের কয়েক জনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। নবুওয়ত লাভের পর নবুওয়তের গুরু দায়িত্ব পালনে মহানবী (সা) যখন নানাভাবে অসহায়ত্ব বোধ করতেন, তখন তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদান করে বলতেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে আপনি কখনো বঞ্চিত হবেন না, কারণ আপনি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে থাকেন, দরিদ্র-অসহায় ব্যক্তিদের আপনি সাহায্য করেন, অতিথি-মেহমানদের আপনি উদারভাবে আপ্যায়িত করেন এবং আপনি সর্বদা ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন ও মজলুমের সহায়তা করেন।"

মহানবীর (সা) চাচা আবু তালিবের পুত্র হযরত আলী (রা) শৈশব কাল থেকে মহানবীর (সা) নিকট প্রতিপালিত হয়েছেন। কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। মহানবী (সা) সম্পর্কে তিনি বলেন : "মহানবী (সা) ছিলেন অতিশয় উদার, মহানুভব ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সর্বাবস্থায় তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ালু স্বভাবই প্রতিভাত হতো, কঠোরতা তিনি পরিহার করে চলতেন। তাঁর মুখ দিয়ে কখনো খারাপ ও অশ্রাব্য বাক্য নির্গত হতো না। তিনি কখনো অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতেন না। যদি এমন কোন অনুরোধ তাঁর নিকট পেশ করা হতো, যা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে তিনি যেমন তা অনুমোদন করতেন না, আবার সরাসরি তা নাকোচও করে দিতেন না। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁরা সহজেই এর অর্থ অনুধাবন করতে পারতেন। তিনি এটা এ জন্য করতেন যেন অন্যের অনুভূতিতে এতটুকু আঘাত না লাগে অথচ অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কাজ থেকেও সে নিবৃত্ত হয়।"

মহানবীর (সা) স্ত্রী খাদীজার (রা) পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হিন্দ (রা) মহানবী (সা) সম্পর্কে বলেন : "তিনি ছিলেন অতিশয় মহানুভব ব্যক্তি। তিনি কখনো কারো মনে আঘাত দিতেন না। অথবা এমন কোন কথা কখনো বলতেন না যাতে কারো আত্মমর্যাদায় এতটুকু আঘাত লাগতে পারে। কেউ তাঁর প্রতি সামান্যতম অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেও তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারেই তিনি কখনো

www.pathagar.com

রাগান্বিত হতেন না বা প্রতিশোধ নিতেন না। তবে ন্যায় ও হকের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন, যে কোন মূল্যে তা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

মহানবীর (সা) চেহারা মুবারক

মহানবীর (সা) চেহরা মুবারক ছিল অতিশয় আকর্ষণীয়, দীপ্তিময়। অনেকেই তাঁর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দান করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পেশ করেছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব। তাঁর বর্ণনা মতে : "তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না বরং তিনি উচ্চতায় ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর চুল অত্যধিক কুঞ্চিত ছিল না, আবার একেবারে অকুঞ্চিতও নয়, বরং তা ছিল ঈষৎ কোঁকড়ানো। তিনি খুব বেশী স্থূল বা মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকার ও ক্ষুদ্র ছিল না। চোখদুটো ছিল কালো। লম্বা-ভ্রু-যুগল, গ্রন্থির হাড়গুলো ও দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী হাড়টি ছিল উচুঁ ও সুস্পষ্ট। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল হালকা লোমে আবৃত। হাত ও পায়ের পাতা ছিল পুষ্ট, চলার সময় পা দাবিয়ে দিতেন না, মনে হতো যেন কোন নিম্নভূমিতে নামছেন। কোন দিকে ফিরে তাকালে গোটা শরীর ঘুরিয়ে নিতেন। তাঁর দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওতের সীল বা মোহর লক্ষণীয় ছিল। বস্তুত তিনি ছিলেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, একান্ত সত্যবাদী, সর্বাধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। প্রথম নজরে তাঁকে দেখে সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়তো।"[৮]

অন্য আর একটি বর্ণনা মতে, "মহানবীর (সা) উচ্চতা ছিল মাঝারী গড়নের চেয়ে সামান্য উঁচু। তাঁর শরীর ছিল মজবুত গড়নের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল দীর্ঘাকৃতির এবং নখাগ্রভাগ ছিল ক্রম-সরু-আকৃতির। তাঁর মথার চুল ছিল দীর্ঘ ও ঘন এবং সামান্য কোঁকড়ানো। তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত ও আকর্ষণীয়, তাঁর ভ্রূ-যুগল ছিল ঘন-দীর্ঘ, তাঁর নাসিকা ছিল কিছুটা ঢালু, তাঁর মুখ ছিল খানিকটা বৃহৎ এবং তাতে মুক্তো-সদৃশ দন্তরাজি ছিল সুশৃংখলাবদ্ধ। তাঁর চিবুকদ্বয় ছিল হালকা এবং তাঁর হাসি ছিল মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ। তাঁর দীর্ঘায়ত চোখদুটো ছিল কিছুটা পিঙ্গলাভা যুক্ত কালো বর্ণের। তাঁর দাড়িগুলো ছিল ঘন এবং তাঁর ইন্তিকালের সময় সেখানে সতেরটি দাড়ি পাকা দেখা যায়। তিনি ছিলেন প্রশস্ত বুক ও স্কন্ধের অধিকারী। তাঁর মাথার চুল প্রায়ই স্কন্ধদেশ আবৃত করে রাখতো। তাঁর ঘাড় বুক জুড়ে ছিল হালকা, মসৃণ লোম। তাঁর গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল এবং সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক অতিশয় সুদর্শন ব্যক্তি।

"তাঁর পদ-চালনা ছিল দৃঢ়তাব্যঞ্জক এবং তিনি এমন দ্রুত হাঁটতেন যে, অন্যদের পক্ষে তাঁকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়তো। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সৌম্যকান্তির। তিনি যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন তখন তাঁর মুখে দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করতো। তিনি নিজেকে

www.pathagar.com

সর্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত রাখতেন। তিনি সর্বদা অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকতেন এবং তাঁর কথা ছিল সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ও ভণিতারহিত। কখনো থেমে থেমে, পুনরুক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য-বিষয় সুস্পষ্ট করে তুলতেন। তিনি স্মিত হাসি হাসতেন, কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন না। তিনি তাঁর আবেগ-অনুভূতি সর্বদা সংযত রাখতেন, উদ্বেগ-মুহূর্তে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতেন অথবা নিশ্চুপ থাকতেন আর আনন্দের মুহূর্তে চক্ষুদয় অবনত করে আল্লাহর প্রশংসায় নিরত হতেন।

"তাঁর পোশাক বলতে ছিল সাধারণ একটা কোর্তা, একটি তহবন্দ, একটি রুমাল যা দিয়ে তিনি স্বীয় স্কন্ধদ্বয় আবৃত করে রাখতেন এবং একটি পাগড়ী।"[৯]

মহানবীর (সা) বাল্যবন্ধু এবং চির অন্তরঙ্গ সুহৃদ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মহানবীর চেহারা মুবারক বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উচ্ছ্বসিত কবিতা লেখেন, তার বাংলা তরজমা হলো নিম্নরূপ :

"পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন নিষ্কলঙ্ক
চির-শুভাকাঙ্ক্ষী মুস্তফা তেমনি জ্যোতির্ময়।" ◆

তথ্য নির্দেশ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম; প্রকাশক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ. ১৭
২. কিনানার উপাধি ছিল কুরাইশ। তাঁর থেকেই এ বংশের উৎপত্তি। দ্রষ্টব্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রণীত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬১
৩. আদনানের উপরের বংশ তালিকা সম্পর্কে মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' গ্রন্থের কিদংশ উল্লেখযোগ্য।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৫. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আমার প্রণীত মহানবী (সা.), পৃ. ২৭-৩১
৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৯-৪০
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম অবলম্বনে
৯. Prohphet Mohammad and His Mission, by S. Athar Hussain.

www.pathagar.com

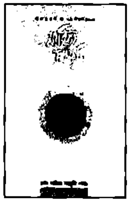

মহানবীর (সা) চরিত্র গঠন পদ্ধতি

আবদুল কাদের মোল্লা

চরিত্র বলতে কি বুঝায়

১. চরিত্রবান ও চরিত্রহীন কথা দুটো প্রায়ই আমরা উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু অনেকসময়ই এ কথা দুটোর সামগ্রিক অবস্থা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে না। কোন সময় শুধু অর্থনৈতিক দিকে কারো সততা অসততার ভিত্তিতে চরিত্রবান বা চরিত্রহীন আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কোন সময় মিথ্যা আচরণের জন্যেই শুধুমাত্র কারও চরিত্র খারাপ বলে আমরা মন্তব্য করে থাকি। কোন সময় শুধু মাত্র যৌন অপরাধ করলেই কাউকে চরিত্রহীন বলে সমাজের লোকেরা পাকড়াও করে।

২. চরিত্রের মৌলিক উপাদানের ক্ষেত্রে সমাজের নৈতিক চেতনা এবং মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই এমনটা হয়ে থাকেথ- সে কথা বালাইবাহুল্য। যে সমাজে যৌন অপরাধকে আইন সম্মত করার ব্যবস্থা আছে সেখানে এই অপরাধকে তেমন গুরুত্ব দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। যে সমাজের অধিকাংশ লোকের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস সে সমাজে মিথ্যা বলাকে অতটা অন্যায় মনে করা হয় না যতটা যৌন অপরাধকে মনে করা হয়। শক্তির দাপটে জুলুম নির্যাতনকে তো আজকাল চরিত্রের জন্য নেতিবাচক বলে ধারণার ক্ষেত্র থেকে প্রায় বাদই দেয়া হয়েছে। মোটকথা মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, দৈনন্দিন কাজ-কারবার এবং আচার-আচরণ যে নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত, চরিত্রের ধারণা সেই সমাজে তেমনই। যারা জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তাদের কাছে চরিত্রের ধারণাও অনেক প্রসারিত।

৩. কিন্তু আমরা মানবসভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এর একটা বিপরীত চিত্রও পাই। বাহ্যিক আলাপ আলোচনায় চরিত্র সম্পর্কে যত সংকীর্ণ ধারণাই পোষণ করা হোক না কেন বিবেকের কাছে চরিত্রের সামগ্রিক ধারণাটা মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল। মহানবী (সা) যে যুগে আরবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে আরবের মানুষ প্রায় প্রতিটি কুঅভ্যাসেই অভ্যস্ত ছিল। জেনা-ব্যভিচার, হত্যা-লুট, জুলুম-নির্যাতন, মদ্যপান-এমন কোন খারাপ কাজ নেই যা তারা করত না। কিন্তু ঐ সমাজেও তারা আল-আমীন

www.pathagar.com

বা আমানতদার অথবা আসসাদেক বা একমাত্র সত্যবাদী বলে আখ্যা দিয়েছিল এমন এক ব্যক্তিকে যিনি সমাজের কোন একটি অপকর্মের সাথেও জড়িত ছিলেন না। বরং খারাপ কাজ-কারবারের বিপরীতে প্রতিটি গুণই তাঁর চরিত্রকে উন্নত করেছিল। প্রতিটি সভ্যতার উন্নতির পর্যায়েই ইতিহাস থেকে চরিত্রের একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে যে সমাজের লোকদের অধিকাংশের বিভিন্ন দিকে অধঃপতন ঘটে, তারা মানব-চরিত্রকে খণ্ডিত করে তাদের দ্বারা কৃত সেই অপরাধী চরিত্রের মৌলিক উপাদান থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে। এ অপচেষ্টা শুরু হয় প্রধানতঃ সমাজের কর্তা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকেই। পরে ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই অপরাধ প্রবণতা সংক্রমিত হতে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্র কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডে কাউকে চরিত্রবান মনে করার অর্থ হল– তিনি প্রতিটি কাজই ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে করেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি কাজের জন্য ভিন্ন মানদণ্ড নেই। এখানে একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে মিথ্যা কথা ব্যক্তিগত জীবনে অন্যায় হলেও সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে অথবা দেশ ও জাতির স্বার্থে তা বলার সুযোগ আছে। ইসলামের ধারণায় এমন কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে লোকটির আচার-আচরণে বেয়াদবী প্রকাশ পেলেও চরিত্র ভাল। ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্রের ধারণা এতটা ব্যাপক যে চোখের সামনে কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিয়ে কোন ব্যক্তি চরিত্রবান থাকতে পারে না। শক্তি দিয়ে বাধা দিতে না পারলে চরিত্রবান হওয়ার জন্যে কমপক্ষে মুখে প্রতিবাদ করতে হবে। তা না পারলে কমপক্ষে অন্তরে ঘৃণা করতে হবে। নইলে বুঝতে হবে চরিত্র বা ঈমান কোনটারই অস্তিত্ব ঐ লোকের মধ্যে নেই। সুতরাং বর্তমানে সামাজিক দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও চাকুরীতে যা খুশী তাই করে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ-রোজা, দান-সদকা আর হজ্জ-যাকাত আদায় করে অথবা সমাজের অন্যায় ও জুলুমকে উৎখাত করে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ না করে নির্দিষ্ট কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত করে বিশেষ ধরনের পোষক-আশাক আর চেহারা ছুরতে চরিত্রবান হওয়ার যে ধারণা আমাদের সমাজে বিশেষ করে তথাকথিত ধর্মীয় মহলে চালু আছে এর সাথে ইসলামী ধারণার কোন মিল নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্রের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সংগত কারণেই চরিত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ ইসলামের মানদণ্ডে চরিত্রবান না হলে ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য গণ্য করা মুশকিল। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে খেলাফতের যে দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে তাতে চরিত্রবান না হলে কারো পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

চরিত্রবান ব্যক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করে নীচের হাদিসটি লক্ষ্যণীয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হল তাঁরা, যাদের চরিত্র সকলের অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী-মুসলিম।)

ঈমানদার ব্যক্তির দাঁড়িপাল্লায় কিয়ামতের দিন যে উত্তম চরিত্রই সবচাইতে ভারী হবে তিরমিযী শরীফের একখানা হাদীসের বর্ণনাতে তা পাওয়া যায়। ঘৃণিত ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে নবী করিম (সা) তিরমিযী শরীফের অন্য এক হাদীসে চরিত্রহীন লোকদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

আবু দাউদ এবং দারেমীতে একই ভাষায় বর্ণিত অন্য একখানা হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন, 'ঈমানদারদের মধ্যে তাঁর ঈমানই পূর্ণাংগ যে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র সকলের অপেক্ষা উত্তম।'

অনুরূপ আরো বহুসংখ্যক হাদীসে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি রাসূল করীম (সা)-এর দুনিয়ায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মুয়াত্তা-ইমাম মালেকের' একখানা হাদীসে নবী করিম (সা) বলেন,

'আমাকে নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই পাঠানো হয়েছে।'

চরিত্রের ভিত্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্র হলো কাজ বা আমল। কাজ না দেখলে চরিত্র পরিমাপ করার অন্য কোন মানদণ্ড নেই। বাস্তব কাজ ছাড়া আন্দাজ অনুমান বা ধারণার ভিত্তিতে চরিত্র পরিমাপ করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি কথাই বলেনা তার সত্যকথা বলার গুণ অর্জিত হতে পারেনা। যে ব্যক্তি হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়বিক্রয়ের কাজের সাথে জড়িত নেই, তারপক্ষে 'সঠিকভাবে ওজন কর'–কালামে পাকের এই বাক্যটি প্রযোজ্য নয়।

মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে না। প্রথমে মানসিকভাবে উদ্দেশ্যকে ঠিক করে নেওয়ার পরই যে কোন ব্যক্তি কাজে হাত দেয়। উদ্দেশ্য যেমন হবে কাজও তেমনি। সুতরাং উদ্দেশ্য বা নিয়ত যেহেতু কাজের ভিত্তি, সেহেতু উদ্দেশ্য বা নিয়ত চরিত্রেরও ভিত্তি। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে দুনিয়ায় মানসম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভের জন্য যে দান-খয়রাত করে আর আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করে–দুয়ের কাজের মধ্যে আসমান জমীন পার্থক্য। সহীহ আল বুখারীর পয়লা হাদীসখানায় এজন্যেই উদ্দেশ্য (নিয়ত) অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার পর কাজের পদ্ধতি এবং উপায় উপকরণের পার্থক্য ঘটে। কম্যুনিজমের দৃষ্টিতে 'নির্বাচিত কাজে' লেলিনের ভাষায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধোঁকা প্রবঞ্চণা, প্রতারণা, মিথ্যা, ইত্যাদি কুকর্ম কোন অপরাধই নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কাজের উদ্দেশ্য, উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি সবটাই নৈতিক মানদণ্ডে উন্নত হতে হবে। মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত, ইত্যাদি দ্বারা কোন ভাল কাজ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ইসলাম যাবতীয় কাজের উদ্দেশ্য রেখেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। মানুষ বিনা দরখাস্ত আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ায় এসেছে। পাঠানো হয়েছে তাকে বিশেষ কিছু দায়িত্ব দিয়ে। আর সে দায়িত্বের নামই খেলাফত। সুতরাং মানুষের জন্য লাগামহীনভাবে জীবন-যাপন করার কোন সুযোগ নেই। যিনি পাঠিয়েছেন, তাকে সন্তুষ্ট করতে হলে তার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব তারই অনুমোদিত পন্থায় পালন করতে হবে।

মহানবীর (সা) চরিত্র গঠনে স্বাভাবিক পদ্ধতি

মানুষের চরিত্র আসমানে তৈরী হয় না। দুনিয়াতে এমন কখনও হয়নি যে কিছু লোককে মে'রাজের মারফতে নবীগণ আসমানে নিয়ে বিশেষভাবে তালিম তরবীয়ত দিয়ে তারপর দুনিয়ায় ফিরিয়ে এনে চরিত্রের মহড়া দেখিয়েছেন। বরং মানবসমাজে স্বাভাবিক কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে মহানবী (সা) সহ সকল নবীই উন্নত চরিত্রের লোক তৈরী করেছেন। মহানবীর (সা) সাহাবাদের জীবনে স্বাভাবিক কর্মসম্পাদন, সাফল্য, ব্যথতা, ভুলক্রুটি ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাফল্যলাভ করলে আল্লাহর প্রশংসায় তাঁরা শুকরিয়া আদায় করতেন, ভুল হলে বিনা বাক্য ব্যয়ে ভুল শোধরানোর জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করতে সিজদাবনত হতেন।

চরিত্রগঠনের জন্য মহানবীর (সা) প্রথম কাজ

প্রথমেই নবী করীম (সা) মানুষের ঈমান-আকীদা ঠিক করার সাথে সাথে প্রত্যেক মুমিনের জীবনোদ্দেশ্য ঠিক করে দিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব-পত্র মৃত্যুর পর আখেরাতে সেই আল্লাহর কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে যিনি সবকিছুই দেখেন এবং শুনেন। কোনকিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। রোজা থেকে গোপনে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে যে আল্লাহ দেখতে পান, অফিস আদালতে ঘুষ গ্রহণ করার সময় নিঃসন্দেহে সেই আল্লাহ ঘুমিয়ে থাকেন না। নামাজের মধ্যে কোরআনের আয়াত না পড়লে যেই আল্লাহ বুঝতে পারেন, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায় না করে জমানো টাকার একাধিক বার হজ্জ করলে সেই আল্লাহ সন্তুষ্ট না হওয়ারই কথা। সারা বছর ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক জীবন যাপন না করে বৎসর শেষে কোন বিশেষ মাজার, দরবার অথবা খানকায় বড় রকমের ভেট দিয়ে ঐ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়, যে আল্লাহর কাছে বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপ রেকর্ড করা আছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন যাপন না করে ঐ আল্লা কে সন্তুষ্ট করার কোন পথ নেই, যে আল্লাহর কাছে মজলুমের ফরিয়াদ কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি পৌঁছে যায়। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে চরিত্রের মূলভিত্তি ধরে রাসূলে পাক (সা) যে পয়লা কাজ শুরু করেছেন–এটা সহজ কথা নয়। আল্লাহ এবং পরকাল সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হলে আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্ত কাজ করা হলে নিঃসন্দেহে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কাজ

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান আনার পরপরই রসূলে করীম (সা) আদেশ করেছেন নামাজ কায়েমের জন্য। আর নামাজ কায়েমের অর্থ যে শুধু নামাজ পড়া নয় তা আপনাদের সকলেরই জানা কথা। নামাজ কয়েম করা বলতে প্রধানতঃ নামাজ আদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো কাজ বুঝায়। সময়মত নামাজ পড়ার জন্য ঠিকমত ওজু করা, জামায়াতের সাথে আরকান আহকামসহ আদায় করা, নামাজী চরিত্রের বিপরীত কাজ না করা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে অগ্রসর হতে হতে এমন এক পরিবেশ এবং সমাজ তৈরী করা যেখানে নামাজ আদায় না করলে তাকে ভাল মানুষ তথা মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য গণ্য কর হয় না। এই পরিবেশের কারণেই মহানবীর (সা) জামানায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মত মুনাফিকও রীতিমত নামাজ আদায় করতে বাধ্য হয়েছিল। সত্যিকথা বলতে কি সমাজের সার্বিক পরিবর্তন ছাড়া পরিবেশ তৈরী করা আদৌ সম্ভব নয়।

তৃতীয় কাজ

এরপর অন্যান্য মৌলিক ইবাদত করারও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। রোজা পালন, অতঃপর সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য যাকাত প্রদান করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক লোভ-লালসার কারণে মানুষ দুনিয়ার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা যে আল্লারই দান একথা স্মরণ করে– আল্লাহর হুকুমে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায়ের বিধান সচ্ছল ব্যক্তিদের উপর স্থায়ীভাবে জারী করা হয়েছে। এখানে একটি কথা স্মরণ করার মত, তা হলো যাকাত দান-খয়রাত নয়, মৌলিক ইবাদত বা কর্তব্য। নিজেদের সহায় সম্পদকে পবিত্র করতে হয় এই ইবাদতের মাধ্যমেই। নচেৎ গোটা সহায় সম্পদই হারাম মাল হিসাবে বিবেচিত হবে। এছাড়া স্বাভাবিক দান-খয়রাত, সদকাহ এবং ভাল কাজে খরচ করার ব্যাপারটা তো আছেই। আয়ের ব্যাপারে ও ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত হারাম রাস্তা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম করা হয়েছে। হজ্ব পালনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও শারীরিক দুই ইবাদতই সামিল।

চতুর্থ কাজ

চতুর্থ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে রাসূল (সা) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জিহাদ ফি সাবিলীল্লাহর কাজে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। রাসূল (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার সাথীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পবিত্র কালামে পাকের বহু জায়গায় জান মাল দিয়ে জিহাদ 'ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর পথে ইসলামী আন্দোলন' করার জন্য হুকুম করেছেন। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি। তা হলো জামায়াত বা সংগঠন

www.pathagar.com

কায়েম করা, নেতার আদেশ শুনা, আনুগত্য করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং হিজরত করা।' পাঁচটি কাজের মধ্যে চতুর্থ কাজটি অর্থাৎ আল্লাহর পথে ইসলামী আন্দোলন করতে গেলে সংগঠন কায়েম করে সুসংগঠিত জীবন যাপন করা, কাউকে নেতা নির্বাচন করে তাঁর আদেশ শুনা এবং মানা, অতঃপর আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরপর 'চূড়ান্ত জিহাদ' বা প্রয়োজনে 'সশস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহ' এবং দেশত্যাগেরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে তাঁর সংগী সাথীরা প্রথম পর্যায়ে মানুষের কাছে ইসলামী আদর্শের দাওয়াত পৌছালেন। দাওয়াত পৌছাতে গিয়ে তাদের মধ্যে আদর্শের জ্ঞানবৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর কালামকে গভীরভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার জন্য নিজেদের আমল আখলাক সংশোধনের জন্য তাঁদেরকে সর্তক হতে হল। সামষ্টিকভাবে কাজ করার জন্য সংগঠিত জীবন যাপনের মহান গুণাবলী উন্নত হতে থাকলো। সুসংগঠিত আল্লাহর দল হিসাবে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা তাঁরা দেখাতে সমর্থ হলেন। বাতিলের পক্ষ থেকে নানা ধরনের প্রতিরোধ আসার কারণে আদর্শিক বন্ধুরা আপন ভাইয়ের চাইতেও বেশী আপন হয়ে গেলেন। এমনকি একজনের প্রয়োজনের জন্য অন্যজনে জীবন পর্যন্ত দান করতে দ্বিধা করলেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অব্যাহতভাবে একই কাজ করতে গিয়ে তাঁদের চরিত্রে 'ছবর' বা ধৈর্যের মত মহৎ গুণের আগমন ঘটলো।

বাতিলের সাথে সংগ্রামের আগুনে পুড়ে পুড়ে তাঁরা খাঁটি সোনায় পরিণত হতে থাকলেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর নৈকট্যলাভ করার বাসনা তাদেরকে পাগল করে তুললো। আল্লাহর মহব্বতে তাঁরা রাত্রি জাগরণ করে ঘন্টার পর ঘন্টা নফল নামাজ আর কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হতে থাকলেন। মানুষের প্রেমে অধীর হয়ে মানুষের কল্যাণ কামনায় এতটা অগ্রসর হলেন যে শত্রুর কাছ থেকে আঘাত খেয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদেরই হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে গিয়ে চোখের পানিতে বক্ষ ভেজাতে থাকলেন। নিজের প্রাণ গেলেও ইসলামী নৈতিকতার সীমানার বাইরে শত্রুর ঘাড়ে একটি আঘাত যেন না লাগে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করলেন। এতকিছুর পরেও তারা বাতিলের সাথে আপোষ করলেন না।

পঞ্চম কাজ

সাধারণ নিরীহ এবং গুণগত দিক থেকে কিছুটা দুর্বল লোক আছে যারা পরিবেশ অনুকূল না হলে নৈতিকভাবে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে না। মহানবীর দ্বারা আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান অর্থাৎ দীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম হয়ে যাওয়ার পর মানব জাতির প্রতিটি সদস্যই সুযোগ পেল পরিচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন করার। জীবনের উদ্দেশ্যকে তাঁরা পরিবেশের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত পাল্টাতে বাধ্য হলেন। যে আরবের লোকেরা নারীর ইজ্জত হরণ করাকে গৌরবের ব্যাপার মনে করতো সেই দেশেই 'সানা থেকে হাদরামাউত' পর্যন্ত কোন সুন্দরী মহিলা অলংকার সজ্জিত হয়ে

www.pathagar.com

গেলেও তাঁর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর কোন লোক রইল না। লুটতরাজে অভ্যস্ত জাতির মধ্যে এমন লোকের অভাব রইল না যাঁরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মহামূল্য মণিমুক্তা গোপনে সেনাপতির কাছে জমা দিলেন। সেই সমাজে এমন লোকও পাওয়া গেল, যিনি শয়তানের প্ররোচনায় গোপনে জেনা করার পর নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শাস্তির জন্য নিজেই নিজেকে পেশ করলেন। অথচ এই অধঃপতনের সময় দুনিয়ার আর কেউ তাঁকে দেখেনি।

উপরোক্ত পাঁচটি কাজ পর্যায়ক্রমিকভাবে নয়, বরং একসাথেই তিনি শুরু করলেন। একই

সাথে ঈমানের ভিত্তিতে জীবনোদ্দেশ্য ঠিক করা, নামাজ কায়েম করা, আল্লাহর রাস্তায় অর্থনৈতিক কোরবানী করা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করা– সবই চলেছে।

শেষ কথা

আমাদের চরিত্র গঠন পদ্ধতিও রাসূলে কারীমের (সা) অনুরূপ হওয়া উচিত। আল্লাহর নবীদের চিরন্তন সুন্নাতের স্বাভাবিক পন্থা বাদ দিয়ে বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক তরীকায় অথবা নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে জাতিকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জীবনকে পূর্ণাঙ্গ একটি অবিভাজ্য সত্তা হিসাবে না দেখে খণ্ডিত করে জীবনের একেকটি অধ্যায় এককভাবে পালন করার মধ্যে কোন বলিষ্ঠ চরিত্র তৈরি হওয়ার কোন আশা নেই। এতে কিছু সুবিধাবাদী মানমানসিকাতার লোক তৈরী হওয়াই সম্ভব। সমাজ পরিচালনার বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বের চাবিকাঠিতে যারা বসে আছেন আমি এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমরা যদি মহানবীর (সা) অনুকরণে চরিত্র গঠনের পদ্ধতি অনুসরণ করি তবে আমাদের সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও মানবতার কল্যাণ এবং নিরাপত্তার আশ্রয়স্থলে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু বিকল্প কোন পথ অথবা আলাদীনের প্রদীপের মত শর্টকাট কোন রাস্তা এক্ষেত্রে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। ◆

www.pathagar.com

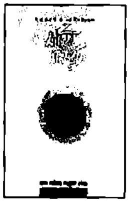

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণে মুসলিম অবদান

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ১২০৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হয়। এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে ইসলাম প্রচারক আলিম ও সূফী-দরবেশগণ এ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও আচরণের পুনর্গঠন করেন। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের নব রূপায়নে যত্নশীল ভূমিকা পালন করেন। বিজয়ী ও বহিরাগত মুসলমানরা ছিলেন উদ্যোগী, সাহসী এবং নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ। মুসলমানদের ইতিবাচক সক্রিয় অবদানের ফলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে।

বাংলায় ইসলামের আগমন ও মুসলিম বিজয়ের ফলে এখানে সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শের বিকাশ ঘটে। ইসলামী আদর্শের সারল্য, সমাজ ব্যবস্থার সাম্য, জীবনযাত্রা-প্রণালীর শালীনতা বাংলার জনজীবনকে প্রভাবিত করে। এর ফলে দেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

মুক্ত চর্চার নতুন দিগন্ত

মুসলিম শাসনের ফলে এবং দেশের সাধারণ মানুষের সাথে মুসলমানদের একাত্মতার কারণে সমাজে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য খর্ব হয়। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের অধীনতা, কর্তৃত্ব ও দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, পেশা, তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্ত চর্চা উৎসাহিত হয়। ফলে তাদের মাঝে এক নতুন আশাবাদ ও কর্মস্পৃহা জেগে ওঠে। বিভিন্ন পেশার লোকেরা এ যুগে তাদের আত্মবিকাশ ও প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে।

শিক্ষানুরাগী মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দরবারে বিদ্যান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে আহবান

www.pathagar.com

জানাতেন। ফলে হিন্দু সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা মুসলিম শাসক ও আমীর-ওমরাহদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। শতাব্দীর পর শতাব্দী জনগণের যে বিরাট অংশ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাদের মনোজগতে এ সময় বিরাট বিপ্ল-ব দেখা দেয়। মুসলিম সংস্পর্শ ও সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্ট আলোড়ন ব্রাহ্মণদেরকেও তাদের আত্মপ্রসাদ, দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, জবরদস্তি দক্ষিণা আদায় ও ভোগ স্পৃহার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। জনগণের সে বিপ্লবী চেতনারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় সে যুগের প্রখ্যাত কবি চণ্ডিদাসের কবিতায় :

'চণ্ডিদাস কহে, শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

এভাবেই সে সময় অসাম্য ও বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে খোদ হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই আওয়াজ উঠতে থাকে। চণ্ডিদাসের মতো সচেতন সাধারণ হিন্দুরা মানবীয় ভ্রাতৃত্বের আদর্শে নিজেদের সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের দাবি জানাতে থাকেন। হিন্দু সমাজের বিপরীতে চণ্ডিদাস মুসলিম সমাজের প্রশংসা করে লিখেছেন : 'সপ্ত মুসলমান একই পাত্র থেকে এবং একই জায়গায় বসে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে।'

নৈতিক উন্নতি

মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের আমলে মন্দিরের সেবার জন্য দাস-দাসী ও যুবতী ব্রাহ্মণী বিধবাদের নিয়োগ করা হতো। এ ব্যবস্থা উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষমতাবান হিন্দুদের ভোগের একটি আয়োজন ছিলো। এমনি ধরনের অনাচারের ফলে হিন্দু সমাজের উঁচু কোঠায় নৈতিক ধস নেমেছিলো। বাংলায় মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে এবং ইসলামের উন্নত নৈতিকতামূলক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবে হিন্দু সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়। মুসলিম সমাজ তাদের সামনে মার্জিত ও পবিত্র জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। উন্নত নৈতিক বোধের অধিকারী আলিম ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকের বাস্তব জীবনের বিরাট প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী সমাজের ওপর। ফলে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে শুধু নয়, ব্রাহ্মণদের জীবনেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর হাসান জামান লিখেছেন : 'ইসলামের প্রভাবে বাঙালী হিন্দুর আত্মিক উন্নতি হয়, চিন্তাধারা মানবতা দ্বারা সজীব ও সমৃদ্ধ হয় আর চিন্তাও গভীর এবং বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক দিকে হিন্দুরা যথেষ্ট লাভবান হয় ... সমাজে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব পাকাপাকিভাবে শিকড় গজিয়ে বসে।'

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ব্যাপক আগ্রহ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুদের মাঝে গভীর প্রভাব

www.pathagar.com

ফেলে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম.এ রহীম লিখেছেন : 'মুসলমানদের পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে কোন প্রকারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিলো। ... মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার দরুন সুবিধাভোগী হিন্দুদের কবল থেকে ভাগ্যহত ও বঞ্চিত হিন্দুরা মুক্তি লাভ করে এবং চিরকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলমান শাসনাধীনে অব্রাহ্মণদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের আর কোন ভয় ছিলো না, কেননা এই শাসন ব্যবস্থা মুসলমান-অমুসলমান, উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট পার্থিব, আধ্যাত্মিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির জন্য সমান সুযোগ এনে দেয়। এভাবে মুসলমান আমলে হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয় এবং বঞ্চিত ও অবহেলিত লোকেরা বিদ্যার্জন করে জীবনে উন্নতি করার সমান সুযোগ পায়।'

মুসলিম শাসনামলে বিরাট সংখ্যক আলিম ও ইসলাম প্রচারক বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানার্জনের বহু বিখ্যাত কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বাংলার মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে গৌড় নামে পরিচিত লাখনৌতি এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে দরসবাড়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলার মহিসুন বা মহিসন্তোষ ও বাঘা মুসলিম শাসনামলের উচ্চ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিলো। শায়খ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা তেরো শতকে সোনারগাঁও-কে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। সাতগাঁও বা ত্রিবেনী, বীরভূম-এর নগোর, মান্দারন মুসলিম শাসনযুগে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিলো। সে যুগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পাণ্ডুয়া ছিলো শায়খ জালালউদ্দীন তাবরিযী, আঁখি সিরাজউদ্দীন, শায়খ আলাউল হক ও নূর কুত্ব-উল-আলম-এর মতো প্রখ্যাত মনীষীগণের কর্মকেন্দ্র। শিক্ষাকেন্দ্ররূপে রংপুরের নাম এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকেই জানা যায়। চট্টগ্রাম মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। শায়খ ও আলেমদের প্রভাবে এবং তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে বাংগালী মুসলমানগণ উন্নত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তেরো শতকের সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের সময় ত্রিবেনীর মাদ্রাসায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেঃ 'তোমরা জ্ঞানার্জন করো, কেননা জ্ঞানার্জনই প্রকৃত আত্মনিবেদন, এর অনুসন্ধানই ভক্তি এবং এর চর্চাতেই পরম গৌরব।'

মুসলিম আমলের শিক্ষা ও জ্ঞান গরিমা নানাভাবে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে তোলে। ফলে দেশে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ দেখা

www.pathagar.com

দেয়। মুসলমানরাই এদেশে প্রথম বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস প্রবর্তন করেন এবং তারাই এদেশে কাগজের প্রচলন করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদানের প্রশংসা করে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন : 'প্রথম যুগের হিন্দু লেখকরা যখন তাদের নিজেদের সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে পছন্দ করতেন সেই যুগে পুস্তক নকল করার ও তা প্রচারের দ্বারা মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথা প্রচলন করেছেন, এজন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী।'

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা খুবই সুলভ ছিলো। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিলো যথেষ্ট উন্নত। শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হতো। ধনী পিতা-মাতার সন্তানকে চার বছর বয়সে কুরআনের একটি আয়াত উৎকীর্ণ করা পাথর বসানো শ্লেট দিয়ে একজন শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হতো। আর গরীব পিতা-মাতার সন্তানকে মৌলবীদের দ্বারা পরিচালিত মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো। প্রতিটি মসজিদের সাথেও একটি মক্তব ছিলো। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য বিষয়রূপে কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষি, জ্যামিতি, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাসন কৌশল, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করানো হতো। মুসলিম শাসনামলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাংলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। উইলিয়াম এডাম উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বাংলার মাদ্রাসাগুলিতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন চালু ছিলো দেখেছেন। তিনি তাঁর ১৮৩৫ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী বিষয়াদি ছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক দর্শন ও সাধারণ দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাদির সাথে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমীর জ্যোতিষ শাস্ত্র মাদ্রাসাগুলিতে পড়ানো হতো। এ আলোচনা থেকে তখনকার মুসলিম শিক্ষার ব্যাপ্তি ও উদারতার কথা জানা যায়।

মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে এন.এন.ল. মন্তব্য করেন: 'ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।'

সাংস্কৃতিক জীবন গঠন

সমসাময়িক বাংগালী কবিদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখনকার মুসলিম সমাজে ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো। কোরআন-হাদীসের আলোকে মুসলমানদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো। ইসলামী বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান তাঁরা মেনে চলতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে তাঁরা নিজেদের ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেন। তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরে মুকুন্দরাম লিখেছেন: 'তারা প্রভাতে ঘুম থেকে ওঠে এবং লাল পাটি বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। ... তাদের

www.pathagar.com

দশ-বিশজন একত্রে বসে কিতাব-কোরান আলোচনা করে। ... তারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। প্রাণ গেলেও তারা রোজা ত্যাগ করে না।'

'ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ। ...
দশবিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরান।
বড়ই দানিশমন্দ কাহাকে না করে দ্বন্দ্ব
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।'

কবি বিপ্রদাস 'মনসা মঙ্গল'-এ লিখেছেন : '... সকল সৈয়দ, মোল্লা ও অন্যান্যরা আল্ল-াহর নাম জপ করে এবং সারাক্ষণ কোরান-কিতাবের উল্লেখ করে। তারা হিন্দুদের নিকট কলেমা পাঠ করে এবং তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়। তারা প্রত্যহ ওজু ও নামাজ শিক্ষা দেয় ও মক্তবের কাজে নিয়োজিত থাকে।'

কবি মুকুন্দরাম লিখেছেনঃ 'মুসলমানরা মাথায় কোন কেশ রাখে না, কিন্তু বুক পর্যন্ত দাড়ি রাখে। তারা সর্বদা নিজস্ব রীতি-পন্থা অনুসরণ করে। তারা মাথায় টুপী পরে। ...তারা ইজার-পায়জামা পরে এবং তা তাদের কোমরের সাথে শক্ত করে বাঁধা থাকে। ... তারা জ্ঞানী ও বিদ্বান। কপটতা ও ফাঁকিবাজি তাদের কাছে অপরিচিত।

পনেরো শতকের গোড়ার দিকে চীনা পর্যটক মাহুয়ান লিখেছেন যে, লোকেরা তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং মাথায় সুতী পাগড়ী ব্যবহার করে। তারা বন্ধনীযুক্ত লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরে এবং মাথায় শিরাবরণ ব্যবহার করে। চীনা দূত সি-হুয়া চৌ কুং তিয়েন লু লিখেছেনঃ বাংলার অধিবাসীরা ভালো স্বভাবের লোক। তারা ধনী ও সৎ। তারা এরূপ সৎ ছিলেন যে, সর্বদা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি মেনে চলতেন। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কখনো তারা এ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করতেন না। সে চুক্তিতে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার লেন-দেন হলেও এ নিয়ে পরে তারা কোন কথা তুলতেন না।

মুসলমানদের সহজ-সরল জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের সামাজিক সাম্য, ঐক্য ও ন্যায়বিচার, তাদের ধর্মীয় জীবনের পবিত্রতা, নৈতিক জীবনের শূচিতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে উন্নত সংস্কৃতির ছাপ ও উন্নত রুচিবোধ এবং তাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পালনে দৃঢ়তা প্রতিবেশী সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ দেশে মুসলিম আগমনের আগে হিন্দুরা পবিত্রকরণ বা শুদ্ধিকরণের জন্য গোবর-গোচুনা ব্যবহার করতেন। মুসলমানরা এসে বাহ্যিক পবিত্রতার জন্য পানি আর অন্তরের পবিত্রতার জন্য তওবার রীতি প্রবর্তন করেন। বাংলার সাধারণ জনজীবনের মতোই এখানকার হিন্দু সমাজের উঁচুকোঠায় মুসলিম প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। হিন্দু রাজকর্মচারী ও ভূস্বামীরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান ও শিষ্টাচারের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের অনুসরণ করতেন এবং নিজেদের দরবারী জীবন মুসলিম দরবারগুলির অনুকরণে গড়ে তুলতেন। হিন্দু রাজন্য ও জমিদার-ভূস্বামীরা মুসলিম দরবারের ঐতিহ্যই শুধু অনুসরণ করেননি, তাঁরা অনেক মুসলিম উপাধিও ধারণ করেছেন।

বাংলা, বাংগালী ও বাংলা ভাষা

মুসলিম বিজয় বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে। এ সময়ই বাংলা ও বাংগালীর ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়। এ সময় বাংলার সব ক'টি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে, শাসন পদ্ধতিতে ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে এবং ভাষা, শিক্ষা, শিল্প-কলা ও সংস্কৃতিতে ঐক্য এনে দেয়। মুসলিম শাসনের আগে এ দেশের অধিবাসীদের জন্য 'বাংগালী' পরিচয় কিংবা তাদের ভাষার 'বাংলা' নামকরণ হয়নি। মুসলমান শাসকরাই বাঙলার সবগুলি অঞ্চলকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে সংহত করেন এবং এই নব-সংগঠিত অঞ্চলের 'বাংলা' নাম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সাধারণ ভাষারূপে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে 'বাংলা' ও 'বাংগালী' নাম দু'টি ইতিহাসে স্থান পেতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সেন ও বর্মনদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে 'সদ্যজাত বাংলা ভাষা'র অবস্থা ছিলো জীবন্মৃত। মুসলমানগণ সে ভাষাকে গৌরবজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম অবদানের উল্লেখ প্রসঙ্গে ডক্টর হাসান জামান লিখেছেন: 'মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজির পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংগে সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদরের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলে ইসলামের তওহীদ ও সাম্য-নীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম, স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ।' ডক্টর হাসান জামানের মতে : 'উত্তর ভারতে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান যেমন উর্দু ভাষা, তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান হলো বাংলা ভাষা।' যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ দেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত

www.pathagar.com

থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত-প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।

বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জনগণের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি শৃংখলমুক্ত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুরা দেখতে পায় যে, মুসলমানদের কুরআন-হাদীস সকলের জন্যই উন্মুক্ত। এ সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা আয়ত্ত করার ব্যাপারে কারো জন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। এ নবলব্ধ অভিজ্ঞতা হিন্দু সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ যুগে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করার সুযোগ পায়। মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রামায়ণ-মহাভারতসহ হিন্দুদের বহু ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়ে জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়। মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রাষ্ট্র ও সমাজে এবং রাজ-দরবারে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : 'হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজ-দরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেতো না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমির-ওমরাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও বাংগালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।' এ সময়ে হিন্দু সমাজের ধোপা, নাপিত ঝাড়ুদার গোয়ালা, মালী প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগনে নিজেদের খ্যাতিমান করার সুযোগ পায়।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যের নব-নির্মাণ

মুসলিম শাসনামলের বাংলা সাহিত্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হলো বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য। প্রাচীন বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছিলো বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু ছিলো। ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের মুখে বৌদ্ধরা মুসলিম শাসনকে দু'বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলো। 'নিরঞ্জনে রুষ্মা' নামক কবিতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলিম ঐতিহ্যের সৃষ্টিলগ্নে হিন্দু ঐতিহ্য ছিলো একান্তভাবে পৌরাণিক দেবদেবী ও অতিপ্রাকৃতিক অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। অশ্লীল ও কদর্য কাহিনীতে ভরপুর হিন্দু পুরাণগুলিই ছিলো বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যের উৎস। এসব অতিপ্রাকৃত বিষয়-সম্পৃক্ত হিন্দু ঐতিহ্যের মুকাবিলায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ মর্ত্যের সাধারণ মানব-মানবীকে তাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য করে তাঁদের মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, রোমাঞ্চ, শক্তিমত্তা ও বীর্যবত্তা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম ও বিরহকে সাহিত্যে স্থান করে দেন। মুসলিম কবিগণ শিশু-প্রায় বাংলা সাহিত্যকে তাঁদের বিষয়বস্তু, ঐশ্বর্য ও মানবিক চিন্ত াধারায় বিশিষ্ট করে তোলেন। হিন্দু ঐতিহ্যের অশ্লীল ও অতিমানবিক ধারার বিপরীতে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে উন্নত নৈতিকতা ও মানবিকতা যুক্ত করেন। মুসলিম কবি-

www.pathagar.com

সাহিত্যিকগণ তাঁদের প্রেমকাহিনীসমূহে নায়ক-নায়িকার নৈতিকতা ও সতীত্ব সর্বপ্রযত্নে অক্ষুণ্ন রাখেন। মানবীয় গুণাবলী, জীবনের গৌরব ও শুদ্ধচিত্ততার প্রতীকরূপে প্রেমকে তাঁরা উপস্থাপন করেন।

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-এর সমসাময়িক প্রতিভাশালী মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ইউসুফ জুলাইখা'তে ইসলামের ধর্মীয় কাহিনী যুক্ত করে বাংগালী কবিদের জন্য নতুন বিষয়বস্তুরূপে মানবীয় রম্য উপাখ্যানের ধারা প্রবর্তন করেন। কবি দৌলত উজীর বাহরাম খান তাঁর 'লায়লী মজনু' প্রেমকাব্যে নায়িকার জন্য নায়কের প্রেমকে উন্নত নৈতিকবোধে উন্নীত করেন।

মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যেরও পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁদের রচিত 'রসুল বিজয়', 'গাজী বিজয়', 'গোরক্ষ বিজয়' প্রভৃতি বিজয়-কাব্য বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যধর্মী একটি নতুন ভাষা ও আঙ্গিকে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেন। বাংলা সাহিত্যের এ মুসলিম ঐতিহ্য বাংলা ভাষাকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে।

চৌদ্দ শতকের শাহ মুহাম্মদ সগীর, পনেরো শতকের কবি মুজাম্মিল, ষোল শতকের ফয়জুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ইসলামী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জনগণের মুখের ভাষায় লেখা ইসলামী শিক্ষার এ সব প্রাথমিক গ্রন্থ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিলো।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ বস্তু-বিষয়ক ঐতিহ্যও স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাঁদের ভাষা-ভিত্তিক ঐতিহ্য। সমৃদ্ধ আরবী ও ফারসী ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ, প্রবাদ, ভাষারীতি বাচ্যরীতি আমদানী করে বাংলা ভাষাকে তাঁরা সম্পদশালী করে তোলেন। সেই ঐতিহ্যের প্রভাব ভারত চন্দ্র ও কবি কঙ্কনসহ অনেক হিন্দু কবির লেখায়ও স্পষ্ট। সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ একটি নতুন ঐতিহ্যের ধারা প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে ধারা সবদিক দিয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। এ ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

স্বাধীন সুলতানী আমলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন, তাঁদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যে সব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।' ◆

www.pathagar.com

উদ্‌ভ্রান্ত বজ্রে ॥ শাহাদাত বুলবুল

অপার মহিমা যাঁর
ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি,
তাঁকে কি ফেরানো সম্ভব আজ
উদ্ভ্রান্ত বজ্রে!
নূরের কল্লোল থেকে
ফুটেছে আযান ধ্বনি,
রূহের উদ্ভাস ছেঁকে ঝরছে
জীবন জ্যোতি।
অসীমের ভ্রূ-অধর
যে ছোঁয়, সেতো অমর,
দোহাই, তাঁকে অপবাদে কেউ
বিদ্ধ করো না।

সে তো সূর্যের উৎসে, আজীবন
সে তো চন্দ্রের উৎসে, ধূলি-কাদা জলে
ঘাসে সে তো কল্লোলমুখর
সমুদ্রের বন্ধু...

ইয়া নবী ॥ আহমেদ কায়সার

তুমি তো নূরেরও ছবি
তুমি তো কবিরও কবি
তুমি না এলে ধরাতে
আঁধারে ডুবিতো সবি ॥
ইয়া নবী সালামু আলাইকা...

তোমাকে চিনেছে যারা
তোমাকে পেয়েছে তারা
তুমি না হলে সৃজন
পানিও পেতো না ধারা ॥

www.pathagar.com

ইয়া নবী ...

তোমাকে দেখারও তরে
বসে আমি আছি যে ঘরে
তোমাকে না দেখে আমি
যেতেও চাই না যে মরে ॥
ইয়া নবী ...

দুটি না'ত ॥ আসাদ বিন হাফিজ

১.
কালো কোকিল তুই ডাকিস না, কুঞ্জবনে বসে
মন যে আমার ডুবে আছে, রাসূল প্রেমের রসে ॥
আমার নবী আল-আমীন
দিল আমার সত্য দ্বীন
তোর কুহু ডাক এই হৃদয়ে, কেমন করে পশে ॥

আমার নবী প্রেমের ছবি, শত্রু করে বশ
তার প্রেমের টানে খুনীর মনে, নামে ফাটল, ধস ॥
নবী আমার ভাঙে যত ভুল
আমার মনে ফোটায় প্রেমের ফুল
পাপ অনাচার খারাপ চিন্তা যায় পড়ে সব খসে ॥

কালো কোকিল তুই ডাকিস না, কুঞ্জবনে বসে
মন যে আমার ডুবে আছে, রাসূল প্রেমের রসে ॥

২.
কোকিল ডাকে কুহু কুহু ওই যে দূরের বনে
এমন সময় কার কথা রে পড়ল আমার মনে ॥
সে যে আমার প্রেমের ফুল
ধনের সেরা ধন অতুল
তাঁরই কথা হৃদয় মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে ॥

www.pathagar.com

মানবতার বন্ধু তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন
তাঁর হৃদয়েই পায়রে খুঁজে প্রেমপিয়াসী প্রেমের চিন্ ॥
তাঁর মত নেই বন্ধু স্বজন
তাঁর মত নেই কেউরে আপন
তাঁর প্রেমে মন ডুব দিয়াছে একলা সংগোপনে ॥

কোকিল ডাকে কুহু কুহু ওই যে দূরের বনে
এমন সময় তার কথা রে পড়ল আমার মনে ॥

তাঁর ইশারা ॥ আবদুল হালীম খাঁ

তাঁর ইশারায় আকাশের চাঁদ
দ্বিখণ্ডিত হয়ে আসে হাতের কাছে
পারস্য সম্রাটের পাষাণ প্রাসাদ কেঁপে ওঠে
হাজার বছরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভে যায়
ইয়াসরিববাসীরা ঘরবাড়ি ভাগ করে দেয়
তাঁর জন্য বুক পেতে দেয়–
ভালোবাসা কাকে বলে ভালোবাসা কাকে বলে!

জিহাদ ময়দানে ওক্কার লাঠি তরবারি হয়ে যায়
সাওয়া নদী শুঁকিয়ে যায়
পাহাড় বুকে দেয় আশ্রয়
কেউ ইশারা বুঝে কেউ ইশারা বুঝে না।
বনের হরিণী কথা বুঝে
বৃক্ষ কথা বুঝে
ডাক দিলে কাছে আসে
কিছু মানুষ ডাক দিলে দূরে সরে যায়
ভালোবাসা কাকে বলে?
ভালোবাসা কাউকে বুঝানো যায় না।

www.pathagar.com

তাঁর পদ পরশে পৃথিবীর মাটি হয়ে গেছে সোনা
আলোকিত হয়ে গেছে আঁধার পৃথিবী
মানুষের বুক ভরে গেছে ভালোবাসায়
অমানুষ তাঁর ইশারা বুঝে না।

পরশ পাথর ॥ আনোয়ারুল ইসলাম

ধূসর মরুতে গোলাপ ফুটেছে আঁধার হয়েছে দূর
তাইতো কা'বাতে আযান ধ্বনিছে অতিশয় সুমধুর।

একদা সেথায় পাপাচার ছিলো নিত্যদিনের সাথী
মনের মিনারে জ্বালেনি তো কেউ সত্য ন্যায়ের বাতি।
জালিমের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ
শিরক্ ও বিদা'তে সকলে বেহুঁশ চোখ থাকিতেও অন্ধ।
শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দিতো সব নরাধম
সেই শরমেতে লুকাতো যে মুখ চন্দ্রিমা অনুপম।
কা'বা ঘর জুড়ে প্রতিমা পাষাণে পূজা দিয়ে হররোজ
ঈমানী-মাণিক হারালো কোথায় রাখেনি যে তার খোঁজ।

এমনি যখন, তখন মরুতে উঠলো ফুটে সে ফুল
তার সুরভিতে জগত উতলা মেতে ওঠে বুলবুল।
সেই ফুলে হলো গাঁথা মনিহার ধ্যানের জ্ঞানের ছবি
নিরাশার আলো তিনি তো সবার, শেষ জামানার নবী।
তাঁহার পরশে কঠিন পাথরও স্বর্ণ হয়েছে তাই
তিনি শোনালেন– মানুষের চেয়ে বড় কিছু আর নাই।
আজিকে তাঁহার জন্ম লগনে দরুদ হাজারো বার
পুণ্য আলোতে জীবন সাজাতে নিয়েছি অঙ্গীকার।

www.pathagar.com

হেরা ও মহামানব ॥ তমিজ উদ্‌দীন লোদী

বৃক্ষহীন রুখোমাটি ছড়ানো ছিটানো কাঁকর-পাথর
রোদে ঝলসাচ্ছে হাওয়া ফাটলে ফাটলে হুহু ধ্বনি
কে বাজাচ্ছে দফ হাওয়া ঘিরে অদৃশ্য খানি
রোদ চিরে ডানা ঝাপটায় মরু-পাখি, রোদের আদর।

কে তবু নীরবে ডিঙ্গায় দুপুর হাওয়ার ঝাপট
গোমট পেরিয়ে কে যায় ওখানে পাথরের ঢালে
কে যায় পর্বতে চূড়োয় অথবা নিরেট পাতালে ?
যদি বলো গুহা তবে তাই- অপার সহিষ্ণু দৃশ্যপট।

কে তিনি ধ্যানস্থ গুহাবাসী, কোন ঐশী আকর্ষণে
ঝরে ঘাম। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে খুঁজে পান নিশ্চিত আশ্রয়!
খুঁজে পান পরিত্রাণ অলৌকিক পথের সন্ধান।
অতঃপর শান্তি নেমে আসে রুখোমাটি, খর্জুরের বনে
নেমে আসে ঐশী বাণী, মানবের নিত্য বরাভয়
পৃথিবীতে নেমে আসে প্রাণবন্ত অশেষ আযান।

রসূলে মকবূল (সা) ॥ গোলাম মোহাম্মদ

এমন দরদীজন পাবে না পৃথিবী আর পাবে না
পুষ্পময় হাত তার সুবাসিত মন
আলোকিত হৃদয়ের মুক্তিদূত সেই প্রিয়জন
মানুষের বেদনায় কাঁদে তার চোখ অবিরাম
তার হাতে পুণ্যময় অবারিত প্রেমের আঞ্জাম।

যে চোখে আঁধার ছিলো- পুঞ্জিভূত কালো- রাত্রিময়
সে চোখে দিলেন তিনি- দীপ্তিময় অলৌকিক পথের নির্ণয়
মানুষ মানুষ হলো, প্রেমময় হলো জনপদ
অনাবিল সুখধারা বয়ে গেলো হেজাজের কলহের ঘরে
'কেউ ছোট-বড় নয় সবাই সমান
সম্মানিত তিনি বেশী খোদাপ্রেমে যিনি পুণ্যবান'

www.pathagar.com

ক্রোধ-জ্বালা মুছে গেলো, মানুষে-মানুষে ভাই হলো
প্রশান্তির জোছনায় মুখরিত হলো আর
বাসন্তী বাতাস যেন বয়ে গেল পল্লবিত বনানী শাখায়।

পাহাড় প্রমাণ তিনি প্রতিবাদে কঠোর কঠিন
আকাশের চেয়ে উঁচু, সমুদ্র থেকেও বহমান–
গোলাবের চেয়ে তাঁর সুঘ্রাণ স্নিগ্ধতা
পৃথিবীর ইতিহাস অবাক বিস্ময়ে ভাবে,
সেইজন কত বড়, উদার-মহান?
মুক্তির দূত যে তিনি– জান্নাতের ফুল
হাজার সালাম তাঁকে– হৃদয়ের প্রেম তিনি রসূলে মকবুল

নামের কোরাস ॥ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

যখন প্লাবন আসে যখন প্লাবন
ভেসে যায় ঘাস-লতা ভেসে যায় বন।
প্রলয়ের জঙ্গে নাচে বারিধির বুক
পশু-পাখি প্রকৃতিরা হয়ে উৎসুক
চেয়ে দেখে কোথা হতে এল এই ধারা
কোথা হতে এল এই অবিনাশী সাড়া!
দূর হতে আসে কোন্ নাড়ি-ছেঁড়া সুর
শিহরণে কাঁপে দেহ মধুর-বিধুর।

বিরান-বিরহী মরু বিয়াবানে ওই
জেগে ওঠে প্রাণময় সবুজের সই।
আকাশে বাতাসে কার সজীব স্বনন
পাহাড়-সাগর জুড়ে নব অনুরণ।
মর্ত ও পাতাল হতে দূর নভোতলে
'মুহাম্মদ' নামের শুধু কোরাস চলে।

www.pathagar.com

চেতনা ॥ আতিক হেলাল

সীরাতের চেতনা
শহীদের খুন ছাড়া
বিস্তার পেতো না।

তবে সেই খুন
দেবো না এখন আর,
ঝরাবো দ্বিগুণ।

কিন্তু সে কাজ
পারবো কি পারবো না,
ভাবি ব'সে আজ।

ফোরাতের কূলে
আজও খুনী তোলে মাথা
আমারই ভুলে।

বাটোয়ারা পেলে
আরবরা মেতে থাকে
পানীয় বা তেলে।

চেতনাতে ঘূণ।
কী হবে, তা ভেবে বুকে
জ্বলছে আগুন।

সীরাতের চেতনা
আজ ঠিকই ফল দিতো.
ঝিমিয়েও যেতো না--

ঈমানটা দৃঢ় হলে
মুসলিম প্রতি পদে
এতো মার খেতো না।

www.pathagar.com

আকাশ বাতাস মুখরিত আজ ॥ জাকির আবু জাফর

তখন রাতের সমাপ্তিক্ষণ আকাশে আলোর আভা
গভীর আঁধার ছড়িয়ে রেখেছে তমসার কালো থাবা।
তখনো জাগেনি ভোরের মিনার তখনো জাগেনি পাখি
আগমোড়া ভেঙে তখনো গাছেরা খোলেনি সবুজ আঁখি।

ঘুমের ভেতরে ঘুমের শিশুরা বিভোর স্বপন বনে
বিজন মরুর তারারা তখনো খেলছিলো নিরজনে।
হঠাৎ মরুর আকাশে কী অদ্ভুত নূর ভেসে
রাতের আঁধার সরায়ে দু'হাতে নেমে এলো অবশেষে।

অবাক পৃথিবী শিরায় শিরায় বিজলি ঝিলিক খেলে
দোল খেয়ে খেয়ে দাঁড়ায় পৃথিবী অলসতা পায়ে ঠেলে।
সমবেত হলো তামাম পাখিরা সমবেত সব ফুল
আজ বুঝি হবে নতুন গানের স্বরলিপি নির্ভুল।
আজ বুঝি গান গানের ভেতরে নিজেকে হারাবে নিজে
আজ বুঝি সুর সুরভিত হবে জোছনার দহলিজে।

আকাশ বাতাস মুখরিত আজ মুখরিত মরুবন
আজ পৃথিবীতে জমেছে মধুর জান্নাতি আয়োজন।
মরুর বাতাসে ডানা ঝাপটায় সেই বেহেশতি গান
গোটা দুনিয়ার সব মানুষের বেড়ে গেলো সম্মান।

তিনি প্রিয়নবী খোদার হাবীব শ্রেষ্ঠ মানব তিনি
গোটা জগতের সকল সৃষ্টি তাঁর অবদানে ঋণী।

www.pathagar.com

তোমারই জন্য ॥ ওমর বিশ্বাস

এই ধ্যান জ্ঞান এই দেহ মন সব
এই হৃদয়ের গভীর দেশের বাস
এই ভালোবাসা আশা প্রত্যাশা সান্নিধ্য
ভিতর বাহির থেকে থেকে যত আনচান সব
ঝুঁকে থাকে তোমারই প্রেমে।

২.
কেউ না করুক প্রশংসা আমি করে যাব
কেউ না ডাকুক নিত্যদিন আমি ডেকে যাব
কেউ না বলুক বারেবারে আমি বলে যাব
কেউ ভুলে যাক তবু স্মরণের পেয়ালায়
আমি চাই তুমি সকল সময় কাছে থাকো।

৩.
তোমাকে কখনো ভুলে থাকা যায় না আমার
তৃষ্ণার পেয়ালা হাতে তবু ঘুরে যাই
নীল আসমান আর সবুজ মৃত্তিকা দেখ
আকাশের ভিতরের আরো অজস্র আকাশ
শিখিয়েছে তুমি আছ হৃদয় গভীর থেকে চারপাশ।

৪.
এই সব প্রশংসা সবি তোমার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি
এই সব ভুল বাদে সব জড়ো কর প্রেমের খাতায়
এই সব আশা তুমি আরশের সিঁড়ি কর
এই সব ভুল পুড়ে পুড়ে আশার প্রাসাদ
সবকিছু আমি প্রশংসার খাতায় দিলাম।

৫.
ঘুরে ফিরে তোমার কথাই বলে যাই
ঘুরে ফিরে ভুলতে পারি না এতটুকুও তোমাকে
যত দেখি তোমার উপমা সৌরভই ছাড়ে
কত নিশানের পর বুঝে গেছি আমি
তুমিই তো জুড়ে আছো আমার সকল ধ্যানে।

www.pathagar.com

প্রশান্তির দরোজা খোলা ॥ আল হাফিজ

সাড়া পেয়ে ঈগলের গা থেকে খসে বুঝি বিবস্ত্রবোধ
খসে বুঝি মানবতারবর্জিত বুলেট বারুদ
আখেরি বারের মতো যদিওবা শাদা বাড়ি নগ্ন প্রহর
ফুসে ওঠে প্রযুক্তির লালাঝরা গোয়েন্দা চোখ।

দিকে দিকে আলো তবু ফুল ফুল ধ্বনি
মৌমাছি গুন গুন সুরভি ছড়ায়
ভোর বেলা ভোর দেখে রাত্রি হাওয়া
উধাও ব্যথার গান, নিপীড়িত দাগ...

আমাদের সামিয়ানা গাছের পাতায়
জাজিমের ব্যবহারে বিমুগ্ধ ঘাস
ইশারায় সমুদ্র ঢেলে দেয় লবনসোহাগ
পাহাড়ের বুক জুড়ে পুরোপুরি সুখ।

সাড়া পেয়ে ফূর্তিতে বিনীত আকাশ
বাতাসের কানে কানে মানুষের গুণ
আলোর সেবায় আহা সেরে ওঠে কালের অসুখ
প্রশান্তির দরোজাখোলা তাতা থৈ থৈ...

প্রিয় নবী একটি ফুল দিও আমাকে ॥ মনসুর আজিজ

বিষাক্ত পৃথিবী
বিষাক্ত জনপদ
              মৃত্তিকা ফুপিয়ে কাঁদছে
ঝর ঝর করে কাঁদছে বৃক্ষ
কাঁদছে সমুদ্রের নোনাজল
বারুদের তীব্র গন্ধে কাঁদছে শিশুরা

মানুষেরা আজ কান্না ভুলে গেছে
শুধু দানবের হাসির শব্দ গেছে বেড়ে

www.pathagar.com

ঝন ঝন করে হাসছে ধাতব হাসি
হাতুড়ির আঘাতে ফেটে যায় মধ্যপ্রাচ্যের পাঁজর
মস্তক খসে পড়ে ধড় থেকে
মায়ের কোল থেকে খসে পড়ে নবজাতকের লাশ
বোনের বুক থেকে খসে পড়ে ভাইয়ের ভালবাসা
শুধু দানবের হাত ফসকে খসে পড়ে না ধাতব হাতুড়ি

প্রিয় নবী–
আপনি একটি ফুল দিন আমাকে; সাদা ফুল
বেহেশতের পবিত্রতম স্থান হতে
আর দিন এক মুঠো পবিত্র মাটি
আমি সাদা ফুলের বাগান করি বিষাক্ত পৃথিবীতে।

নস্টালজিয়া ॥ পথিক মোস্তফা

কেনো যেনো কালো কালো সীমান্তে আমার শতায়ু ভালোবাসা বাঁধা পায়। তারের মধ্যে বিনা-তারের সারগাম তুলি হৃদয় থেকে হৃদয়ে। সেখানে আমার বসতি নেই। আমি শুধু কারো যেনো কান্না শুনি– কারো যেনো ক্ষোভ শুনি। তবু আমাকে পেঁচিয়ে ধরে অনাবিল আকুতি। আমি জানি না সরষেফুলের দোলন লাগা বাতাসের আকিঞ্চন। চাঁদকেও বিগলিত সৌন্দর্যের পালকি সাজাতে দেখি না। কেবলি প্রিয় এক নাম শুনি। ৫৭০ এর কোন রাতের অবারিত শান্তির দ্বার খুঁজি আমি। আমি ইথারে কান পেতে রাখি। যদি কোন একদিন ঘুরতে ঘুরতে আমার শ্রুতিবদ্ধ হয় 'তলাআল বাদরু আলাইনা– মিনছানি ইয়াতিল বি'দা।' এমনও হতে পারে– মক্কা নগরীর কোন এক ঘরে আমিনার পবিত্র কোলে প্রথম কান্না শুনতে পারি আমি। ইনসাফের পরাকাষ্ঠা নিয়ে বেড়ে ওঠা কোন এক শিশুর মেষ চড়ানো, কিংবা খেলা করতে গিয়ে বক্ষ বিদীর্ণ করে উদগীরণ করা অমাবশ্যা সন্ধ্যাও আমার নস্টালজিয়া। হেরার বেহেশতী কামরায় প্রতিদিনকার বসবাস আমার সুখময় ঐতিহ্যের বিহগ।

হ্যাঁ ! শেষ পর্যন্ত তোমাকেই বেহেশতী-পাল্লায় ওজন করি আমি। মনে মনে স্বপ্ন রুই– ভালোবাসা চাষ করি। প্রান্তরে প্রান্তরে জ্বলে ওঠে আমার অযুত মশাল। আমি জ্বালাই কৃষাঙ্গী-অন্দরে– ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। সবখানে পৌঁছে দেই তারবার্তা 'ইয়া নবী সাল্লামু আলাইকা'।

www.pathagar.com

আমায় ক্ষমা করো হযরত ॥ খাতুনে জান্নাত কনা

লালসার রাহুগ্রাস আচ্ছন্ন করে রাখে
নিয়ত ধাবিত হই কন্টকিত
পথের উপর দিয়ে
হিসাব করে পথচলা
বড়ই কঠিন।

হে রাসূল !
এ কোন্ তমসার মাঝে
ডুবে থাকা পৃথিবীতে
আগমন আমার।
কঠিন, ইস্পাত দৃঢ়তা
ঠিক কতটা মজবুত ?
হতে চাই আরও বেশী
বরফ কঠিন–
তোমার দৃঢ়তাকে লক্ষ্যে রেখে।
অথচ–
পংকিলতায় আবর্তিত এ সমাজ
অগ্নিসম সূর্যতেজে
গলিয়ে দেয় সমস্ত দৃঢ়তার
আবরণ।
কষ্ট হয় ভীষণ কষ্ট–
কোমল হৃদয় নিয়ে
নির্যাতীতের পাশে গিয়ে
দাঁড়াতে চাই যখন
সেখানেও সন্দেহ খুঁজে ফিরে আমায়।
বুঝতে চায় তথাকথিত পলিটিক্স
কতটা গভীরে গেঁথে নিয়েছে
আমাকে।
সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে
চলতে চাই গভীর আগ্রহ নিয়ে।
তবু–
নিয়তই বাধাগ্রস্ত হই।
মুসলিম দুনিয়ায় নিক্ষেপিত

www.pathagar.com

শেল আর বোমা-বারুদের মত
অসংখ্য বিঘ্ন বাধা
পথ আটকে ধরে।
তাইতো আকুল হয়ে বলি
আমায় পথ দেখিয়ে নাও।
দুর্গম, বন্ধুর-পথের দিশারী হয়ে
আর–
অযুত নিযুত–যত ভুলের তরে
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো হযরত।।

অগ্রগামী ঘোড়ার সহিস ॥ শাহনাজ পারভীন

বারই রবিউল সোমবার সুন্দর দিনে
আরবের অন্ধকারে পাথরের হেরার গুহায়
সভ্যতার প্রোজ্জ্বল পরিক্রমা শুরু হয় শুরু হয়
দূর হয় অত্যাচার নির্যাতন জুলম সকল।

রাসূলের আবির্ভাবে জগতের চিন্তাস্রোতে
তমসাচ্ছন্ন বালুকাস্তূপ স্ফুলিঙ্গে ঝলমলে আলো
সে স্ফুলিঙ্গে বিস্ফোরক বারুদের দ্যুতি
দিল্লী হতে গ্রানাডার প্রদীপ্ত আকাশ
জয় হলো জয়ী হলো
আবির্ভূত সুসংবাদ দাতা মানব জাতির
পরিবার প্রকাশ্য জীবনে ছিলো সংগতি তাঁর
আচরণে শুদ্ধতম 'আল আমিন' যিনি
কমনীয় স্বামী ছিলেন প্রাণান্ত বন্ধু ছিলেন আদর্শ পিতা ছিলেন তিনি
তারই বর্ণাঢ্য জীবন ছিলো সহজ সরল।

আরবের অধিপতি
অথচ কর্মাদি করেছেন কত
কতদিন গেছে খাদ্যের অভাবে কত অর্ধাহারে কেটে গেছে দিন
কালো দুটি খেজুর আর সুস্বাদু পানি খেয়ে
পেটেতে পাথর বাঁধা সবরে নত হওয়া করেছে বিলীন।
অথচ পৃথিবী তাহারই হাতের মুঠোয় ॥

www.pathagar.com

একেকটা সোনাঝরা দিনের শেষে
ঘুমহীন খেজুরের মাদুরে শুতেন
অথবা বিনিদ্র রাত প্রার্থনায় কেটে গেছে কত
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন বৃক্ষের মত
যে ঘরটি বিশ্বে ছড়িয়েছে আলো
কেরোসিনের অভাবে ছিলো ঘন অন্ধকার
প্রজ্বোলিত আলোক শিখা ভেতরের আকার করেছে বিলীন
বিলোড়িত সময়ের স্রোতে সে আকাশে উজ্জ্বল আলোক মিছিল..

অগ্রপথিক ॥ আমিন আল আসাদ

পৃথিবীর তিনি অ'রূপ সৃষ্টি
তাঁর নামে ঝরে দরূদ বৃষ্টি
মহানবী তিনি শান্তির দূত
আহবানে তাঁর অন্যায় ভূত
দূরীভূত হয়, নাস্তা নাবুদ
হয়ে যায় যত সমাজের খুত।

মঙ্গলহীন সব রীতিনীতি
রক্তচক্ষু সব ভয়ভীতি
ম্লান হয়ে যায়, পরাভূত হয়
পালিয়ে আঁধার হয় আলোময়।

আরবের বুকে সত্যের নদী
গতি ফিরে পায় বয় নিরবধি
আশান্তিকামী লোকগুলো তাই
শক্রতা ছেড়ে হয়ে যায় ভাই
মহানবী তিনি অগ্রপথিক
শুধু তাঁর পথে মুক্তি সঠিক
আর সর পথে ভ্রান্তি কুহক
শুধু তাঁর পথে শান্তি ও হক।

www.pathagar.com

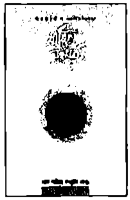

অপূর্ব উপহার

নয়ন রহমান

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ডাক পিয়ন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। রেজিস্টার্ড চিঠি। আমাদের ডাকপিওনটি দারুন বিশ্বস্ত। কর্তব্য নিষ্ঠ। এই বর্ষায় বাড়ি বাড়ি চিঠি পৌছবার দায়িত্ব পালন না করলেও কেউ তাকে দোষারোপ করত না। আমি মোহাম্মাদ সিদ্দিকউল্লাহ মোহাম্মাদপুর টাউন হলের পেছনে ছোট দু'কামরার বাসিন্দা। বায়তুল মোকাররমের ফুটপাতে পুরনো কাপড় নিয়ে বসি। অনিশ্চিত ব্যবসায়। বৃষ্টি বাদলে তো খোলা আকাশের নিচে বসার উপায় নেই। সাহসী দু'চারজন যে প্লাস্টিকের ছাউনি টানিয়ে বসে না, তা নয়। কখনো রোদ, কখনো ঝিরঝিরে বর্ষণে আমিও দোকান সাজাই। বিক্রি বাট্রা তেমন ভাল হয়না। যাতায়াতের খরচটাই ওঠে না। তাই আকাশের মুখ গোমড়া দেখলে নির্দ্বিধায় ঘরে বসে গল্পের বই নিয়ে বসি। আমার স্ত্রী রোমেনা আমার বই পড়ার শখ দেখে বলে এটা তোমার একটা রোগ। আর এ রোগটার নাম হল ঘোড়া রোগ।

আমি পুরনো কাপড়ের ব্যবসা করি বলেই বই পড়ার শখ বিসর্জন দেব! এ রকম নির্বোধ কথাবার্তার জন্য স্ত্রীর সাথে আমার মানসিক মিল নেই। তবে স্বামীর দ্বায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিনা। দুটি ছেলেও কলেজে পড়ছে। বাবার রোগে ওরাও আক্রান্ত হয়েছে। আসলেই বই পড়া একটা ছোঁয়াচে রোগ। তাই বা বলি কি করে। ত্রিশ বছর দাম্পত্য জীবন যাবন করছি। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রয়েছে রোমেনা। রোমেনা কখনো কৌতূহল ভরেও একখানা বই হাত দিয়ে ছোঁয়না। অথচ টি.ভির সামনে সারাক্ষণ বসে থাকতে ওর ক্লান্তি নেই। নাটক, খবর, গান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান এমন কি বিজ্ঞাপন মালা দেখতেও নাকি ওর ভালো লাগে। তা যা যা ভালো লাগে আমি কখনো বাধা দিইনা বা বারণ করি না। এমন কি বিরক্তিও প্রকাশ করিনা। এর প্রধান কারণটাও আমি আপনাদের খুলে বলি। রোমেনা সংসারের

www.pathagar.com

কাজে ব্যস্ত থাকে, টি.ভি অনুষ্ঠান নিয়ে মগ্ন থাকে। আমি অবসরে বই পড়ার মস্ত বড় সুযোগ পাই। রোমেনা যদি আমার অবসরটুকু কেড়ে নেবার চেষ্টা করত - পারত না অবশ্য, কিন্তু ভাবুন তো কি রকম দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হত? এ দিক দিয়ে বাঁচা, আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। ওরা লাইব্রেরী থেকে বই আনে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার আনে। এমন কি টিফিনের পয়সা, রিকসা ভাড়া বাঁচিয়ে বাজার করার সময় দু'চারটাকা হাত সাফাই করে মাঝে মাঝে বই কিনে আনে। সে সময় ওদের দু'জনের চোখে মুখেই আমি অপার্থিব হাসি ও আনন্দ দেখতে পাই। এর কারণও আমার জানা। নিজের পয়সায় কেনা বই তো হাত ছাড়া হবার জো নেই বরং তাকে সাজিয়ে রাখা যায়। আমি স্বল্প আয়ের মানুষ। আমিও লুকিয়ে ছাপিয়ে মাসে দু'এক খানা বই কিনি। পিতা-পুত্রে আমাদের একটা অলিখিত চুক্তি আছে। নিজেদের পয়সায় বই কেনার কথাটি আমরা রোমেনার কাছে একেবারে চেপে যাই।

আজ তো সারাদিন বই পড়ার অখণ্ড অবসর, ছেলেরা অবশ্য বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কলেজে গেছে। ওদের বয়সে আমিও স্কুল কামাই করিনি কখনো। স্কুলে যাওয়া মানেই আনন্দ। বর্ষার দিনে তো মনে হত মহা উৎসবমুখর। রাস্তায় বৃষ্টির পানিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে দল বেধে আমরা বন্ধুরা স্কুলে যেতাম ঘোর বর্ষায় অবশ্য ছাত্র উপস্থিতি খুব কমই থাকত। স্যাররা হালকা রসিকতা সুরে আমাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, হতভাগা- তোরা এই বৃষ্টিতেও এসেছিস! তোদের নিয়ে আর পারা গেলনা। স্যাররা মজা করে কমন রুমে গল্পের আসর যে বসাতেন না তা নয়। ক্লাসে এসে আমাদেরও পড়ার বদলে গল্প শোনাতেন। এটাই ছিল আমাদের মস্ত বড় আকর্ষণ। এত কথার অবতারণা এ জন্য যে, ডাকপিওন আমার বই পড়ায় সামান্য ব্যাঘাত ঘটাল। ওকে দেখে আমি তেমন খুশী হতে পারিনি। জানি তো চিঠিটি এসেছে মার কাছ থেকে। মধ্যবিত্তের বিধবা মায়েদের সেই এক ট্রাডিশনাল কাহিনী। এরা গ্রামে থাকেন। গ্রামে থাকতে পছন্দ করেন। রোজগারে ছেলের কাছে তাদের অনেক দাবি। তার ওপর ছেলেটি যদি হয় প্রথম সন্তান- তাহলে তো দায়িত্বের জোয়াল টানতে টানতে ঘাড় বাঁকা হবার কথা। চিঠিতে রোমেনারও কোন উৎসাহ নেই ঐ একই কারণে। চিঠি মানেই সমস্যার ফর্দ। আমার বাবা নেই। মা আর তিনটি বোন। ওদের বিয়ে শাদী হয়ে গেছে। তবু বাবার বাড়ির মায়া ছাড়তে পারেনা। পালা করে আমার তিনবোন তাদের ছেলে মেয়ে স্বামীসহ মার কছে এসে থাকে। শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আমার ভগ্নিপতিদের যে কি উৎসাহ তা বলে বুঝানো যাবে না। অথচ আমি পাঁচ-'ছ বছরে একবার শ্বশুর বাড়িমুখো হই কিনা সন্দেহ। মেয়েদের কারণে আমার বুড়িমা আমার কাছে এসে থাকতে চান না, তা বুঝতে পারি। মার একার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। বোনদের ভাগ্না ভাগ্নী এমনকি ভগ্নীপতিদের আবদারের তালিকাশূন্য পত্র খুব কমই হাতে আসে। এখন বর্ষাকাল।

www.pathagar.com

গ্রামে তো ঘর ছেড়ে বাইরে এক পা দেবার উপায় নেই। কাদাপানি যেমন - জ্বরজারিও তেমনি। বুড়ো মানুষ মায়ের যে কি কষ্ট, তা এই দুই কামরার পাকা দালানে থেকেও উপলব্ধি করতে পারি। মার চিঠি ভেবেই পিওনের কাছে এগিয়ে যাই। রেজিস্টার্ড চিঠি আর অপরিচিত হাতের লেখা খামের উপর দেখে একটু চমকে উঠি। মা এ বয়সেও তা ষাট পঁয়ষট্টি তো হবেই, গোটা গোটা অক্ষরে চিটি লেখেন। মুক্তোদানার মতই একসময় তাঁর লেখা ছিল। রেজিস্টার্ড চিঠি কে পাঠাতে পারে? চিঠিতে কি খবর জানার জন্য আমি উদগ্রীব হই। সখের বইখানির পাতা মুড়ে চিঠি পড়তে আগ্রহী হই।

ছোট্ট বারান্দায় আমি এখন পায়চারি করছি। অসমাপ্ত গল্পের বইটি টেবিলের উপর পড়ে আছে। রোমেনা খাবার তাগাদা দিয়ে গেছে দু'বার। আমার চিন্তাক্লিষ্ট অথবা ভাবনায় উতলা দৃষ্টি দেখে রোমেনা তো ধরেই নিয়েছে বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। জরুরী ভিত্তিতে একটু বেশী টাকা পাঠাতে হবে। চিঠি সম্পর্কে রোমেনা কোন প্রশ্ন তোলে না। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটা বেজে গেছে। রোমেনা আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। খেয়ে দেয়ে খাবার ঢেকে রেখে শুয়ে পড়েছে। আমার ছেলেরা এখনো ফেরেনি। ওরা হয়ত কোচিং করেই ফিরবে। এই এক জ্বালাতন। আমাদের সময় এরকম কোচিং পড়ার রীতি ছিল না। ছেলেদের এ কথা বললে আমাকেই উপদেশ দেয়- তোমার কাল বাসি হয়ে গেছে আব্বা। এখন স্যাররা ক্লাসে পড়ান না কিন্তু কোচিংয়ে খুব ভালো করে সব বুঝিয়ে দেন। কি জানি কি কারণে কোচিং সিসটেম মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজ নিয়ে কি করব। তাড়াতাড়ি চারটা খেয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে রোমেনাকে বললাম, দরজা লাগাও। আমি একটু আসছি। রোমেনা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললো, এই বিষ্টি বাদলায় তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ?

'কাজ আছে' বলে আমি রাস্তায় পা রাখলাম। আমাদের এদিককার রাস্তায় পানি তেমন জমে না। কিন্তু মালিবাগ, শান্তিনগর, বাসাবো এসব জায়গায় একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটু পানি জমে যায়। আমার গন্তব্য এখন সিদ্বেশ্বরী । স্কুটারে যাবার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে দিই। সংগত কারণে। রিকসাও বিচেনায় আনিনা। ওরা এই বর্ষণমুখর অপরাহ্ন গলা কাটা ভাড়া চাইবে। চাইতেই পারে। ভরসা হল কোস্টার বা বাস। মনে মনে ছক এঁকে নিই - কোথায় গিয়ে বাস থামবে সেখান থেকে পদব্রজে কি রিকসায় যাব। শান্তিনগর আর মালিবাগ- এ দু'জায়গার অবর্ণনীয় অবস্থা আমার জানা। সিদ্ধেশ্বরীর বড় রাস্তাটা অবশ্য খটখটে শুকনো। জায়গাটা চেনা। হোপ এপার্টমেন্ট। হঠাৎই টনক নড়লো - আরে কত নাম্বার ফ্ল্যাট কার বাড়ি তাতো মনে নেই? পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারি তাড়াহুড়ো করে খোদ চিঠিটাই বারান্দায় বই'র নিচে চাপা রেখে এসেছি। আবার দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালাই। রোমেনাই দরজা খুলে দেয়। আমি বইটির দিকে এগিয়ে যাবার আগেই লক্ষ্য করি চিঠিটা রোমেনার হাতে।

www.pathagar.com

শীগগীর চিঠিটা দাও তো। আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বলি।

কার চিঠি এটা? রোমনোর সন্দেহমাখা কণ্ঠে অবাক হই। নাম লেখা আছে দেখছ না? তা দেখেছি। সাবিহা। কে সাবিহা?

আমি অধৈর্য্য কণ্ঠে বলি, পরে এসে সবিস্তারে বলব। ঠিক আছে, চিঠিটা রেখে দাও। বাড়ির নাম্বারটা একটু দেখে নিই।

না তুমি এখন কোথাও যাবে না। এই ঘোর বর্ষায় বউ-এর চাইতে একজন সাবিহার ডাক তোমার কছে কেন বড় হল আমি বুঝতে পারছি না।

রোমেনার দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। এই কি সেই শান্তশিষ্ট গৃহীনিপনা, সেবাপরায়না নির্বোধ, আমার মনে হত রোমেনা? হিংসায়, হিংস্রতায়, সন্দেহে রোমেনার চোখদুটো যেন জ্বলেছে। তখন দমকা বাতাসের সাথে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বারান্দা। 'গর্ভধারিনী' বইটির পাতা ওলোট-পালোট হয়ে বাতাসের সাথে যুদ্ধ করছে। আমার সেদিকে খেয়াল নেই। বার বার রোমেনাকে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করছি, প্লিজ, চিঠিটা তুমি রাখো। ঠিকানাটা আমাকে দাও।

না। এই ঘোর বর্ষা মাথায় নিয়ে তোমার যেতে হবে না। তুমি ঠিকানা পাবেনা। বলেই রোমেনা আমাকে একেবারে হতভম্ব করে চিঠিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে বাইরে বাতাসে উড়িয়ে দিল। সাদা জুঁই-এর মত খণ্ড খণ্ড কাগজগুলো পানিতে ভাসতে থাকে। আমি এই মুহূর্তে রোমেনাকে একটা কঠিন শাস্তি দিতে পারতাম। ওর হাত দু'টো মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে পারতাম । পারতাম ওর মাথাটা দেয়ালে ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করতে। আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমি কখনই কিছুই করতে পারিনি। প্রতিবাদ করার মত ভাষা উচ্চারণে আমি অভ্যস্ত নই। সাবিহার বাবা সেই সময়কার প্রতিবেশী মফঃস্বল শহরে একজন মুন্সেফ আর আমি এক আত্মীয়ের বাসায় জায়গীর থেকে পড়ুয়া এক ছেলে। আমি তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে চলে এসেছি। আমি বলতে পারিনি -

'আপনার বাড়ির বড় আকর্ষণ আপনার লইব্রেরীটি। আপনার ছেলে সুহাস আমার ক্লাশ বন্ধু। ওর সৌজন্যে আপনার বাড়িতে আমার আসা। ওর সৌজন্যে আপনাদের পরিবারিক লাইব্রেরীতে আমার প্রবেশ। আর ঐ লাইব্রেরীতেই আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে সাবিহাকে আবিষ্কার করেছি। সাবিহা আমাকে মোহাম্মদ আলী সম্বোধনে চিঠি লিখত। তখন পাকিস্তানের প্রিয় জুটি ছিল সাবিহা-মোহাম্মদ আলী।

পরাজিত সৈনিকের মত আমি ঘরে ঢুকি, জামা কাপড় বদলাই। তারপর জানালায়া দাঁড়িয়ে তুমুল বৃষ্টি দেখতে থাকি। রোমেনার নিষ্ঠুর হাতে ছেঁড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চিঠিটি পানিতে ভাসতে ভাসতে মাঠ ছাড়িয়ে এক সময় ড্রেনে গিয়ে পড়বে। তারপর মুছে

www.pathagar.com

যাবে সব অক্ষর। মিলিয়ে যাবে কাগজের পিন্ড। কিন্তু স্মৃতি? সাবিহার এই চিঠির আহ্বান ? আমার মনের পাতায় যে প্রতিটি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে।

মোহাম্মদ আলী একবার এসো। ঠিকানা দিলাম। তোমার ঠিকানা সংগ্রহের কাহিনী জানতে চেও না। খুব তড়াতাড়ি এসো। আমি এখন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছি। অনেক অনেককাল আগে তুমি একটা প্রত্যাশার কথা আমাকে জানিয়েছিলে। আমি তোমার সেই প্রত্যাশাটি পূরণ করব। আসবে তো? - সাবিহা।

আমার নিরেট মাথায় কিছুতে আসেছে না কোন প্রত্যাশার কথা সাবিহা আমাকে বলতে চাচ্ছে। কোন প্রত্যাশা সাবিহা পুরণ করবে?

এরপর যথানিয়মে মাত্র দু'টো দিন কেটে গেছে। আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই দোকান সাজিয়ে বসেছি। এর মধ্যে 'হোপ' এপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে ঘুরে এসেছি। এখানে সাবিহা তো স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত। এর স্বামীর নামটা পর্যন্ত আমি জানিনে। দারোয়ানের কাছে লজ্জায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। ভেবেছি অন্য একদিন যাব। মিসেস সাবিহার ফ্ল্যাট কোনটি জিজ্ঞেস করব। সাবিহা কেন আমাকে ডেকেছে– তার চাইতেও বড় কথা সাবিহা নাকি মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছে। মানবতা বলেও তো একটা কথা আছে?

সেদিন বাড়ি ফিরতে একটু রাতই হল। গেটে আমার ছেলে এমন কি রোমেনাও দাঁড়িয়ে। বড় ছেলে আমাকে দেখে উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়ে। আব্বা, শীগগীর এসো। দেখে যাও তোমার জন্য এক মস্ত বড় গিফট।

আমার জন্য গিফট! মাথাটা শূন্য হয়ে আসে কে আমাকে গিফট পাঠাবে? ঘরে ঢুকতেই রোমেনা আমার হাতে একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয়। চিঠির ভাষাটি এ রকম ঃ

আমার স্ত্রীর অন্তিম অনুরোধ অনুযায়ী ওর সংগৃহীত গ্রন্থরাজি, আপনার ঠিকানায় পাঠালাম। বইয়ে আমার আকর্ষণ নেই। প্রাপ্তি স্বীকার করে নিশ্চিত করবেন।

- আহসান চৌধুরী। ◆

www.pathagar.com

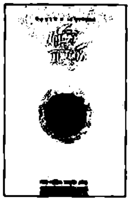

পড়শি

দিলারা মেসবাহ

শাহাবুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে ইদানীং পাড়াপড়শিরাও রসিকতায় মেতে ওঠে। এই একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত একটা মানুষ এতটাই সাদাসিধা এতটাই দিলখোলা হয় কী করে! ভদ্রলোকের পরিবারও ভদ্রলোকের উপর মহাখাপ্পা। সংসারের কোনো মারপ্যাঁচই বোঝেন না। শাহাবুদ্দিন সাহেব যেন এক বরফের চাঁই।

আজ সুবেহ্ সাদেকের ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে শাহাবুদ্দিন সাহেব খোলা জানালার সামনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আত্মকথা নিজের সঙ্গে নিজের কথা মনে মনে।

- আচ্ছা শাহাবুদ্দিন তুমি কী বেকুব?
- হয়তো বা।
- কেন তোমার মনে কী কখনও কোন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না? রক্ত টগবগ করে ফোটে না?
- ওঠে, ঝড় ওঠে বিপুল ঝড় প্রলয়ংকরী ঝড়। কিন্তু সেই ঝড়তো আমি সামাল দিতে পারি। নিজের মনে মনেই সেই ঝড় থেমে যায়। তার সমাধি দেই নিজের ব্যথিত হৃদয় খুঁড়ে। কেউ টেরটি পায় না।
- লোকে যখন তোমাকে খাটো করার জন্য নানা ফন্দি ফিকির করে তখনও তুমি অমন নির্বিকার অমন স্থির বরফ শীতল থাকো কী জন্য? তুমি কী নিজেকে খাটো করতেই চাও!
- না নিজেকে খাটো করতে চাই না। কখনই না। তবে অশান্তি তিক্ত বাকযুদ্ধ এসব জাতীয় যাবতীয় খিটিমিটি বড় ভয় পাই। তাই কখনও নিজেকে সোচ্চার হতে অশান্ত হতে দিতে চাই না।

এরই মধ্যে ছেলে সুজাউদ্দিন, মেয়ে মরিয়ম ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বেগম রমিজা নামাজ ওজিফা শেষ করে বিছানা পরিপাটী করতে লেগে গেছেন। একটু পরে শুরু হবে

www.pathagar.com

রসুই ঘরের নিত্যদিনের কাব্য ! রমিজা প্রায়ই বলেন,

- ইস্ আল্লাহপাক যদি দুইবেলা খিদা ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা রাখতেন, তবে কী আনন্দই না হত। সকাল বেলাটা চোখ খুলেই রুটি বেলতে হত না। বয়স হয়েছে এখন আর এত ঘানি টানতে পারি না। হীরামন বুয়া ত আমার চেয়ে নবাব। তাকে জলদি হাত চালাতে বললে উল্টো আমাকে ধমকে দেবে এমন করে তাকায়। যেন দুইচোখে ভস্ম করে দেবে। বেচারীরই বা দোষ কী! রোজ রোজ সেই রুটি বেলা আলুভাজা, পটল ভাজা, চা করা, মশল্লা পেষা, কুট্না কোটা, হাঁড়ি-পাতিল মাজাঘষা, ঘর ঝাট্, মাছ কোটা। একটা জানে আর কাহাতক সয়! ছেলেমেয়েরা কুটোটি কাটে না। পড়ালেখার দোহাই সবসময়। আর তাদের আম্মাজান অফিস আর বাজারহাট করেই খালাস। তারপর আছে ওনার পরোপকার আর মানবদরদ। ঘরের মানুষের তালাশ নেই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে একপায়ে খাড়া।

  শাহাবুদ্দিন সাহেব সবই শোনেন। কখনও মৃদু হাসেন, কখনও বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলেন,

- রমিজা অমন করে বলতে নেই। অন্যের সামান্য উপকারের তৌফিক যদি আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন তবে এত ঢাকঢোল পেটালে তার মরতবা থাকে না। বেগম রমিজা ঘোর সংসারী হিসেবি মানুষ। তিনি এইসব মারফতি কথাবার্তার ধার ধারেন না। থমথমে গলায় বলে বসেন,

- সংসার সামাল দিতে আমি রোজ গলা পানিতে ডুবে থাকি আর এদিকে বাজে ভাঙ্গা রেকর্ড।

শাহাবুদ্দিন সাহেব স্ত্রীর কথায় যারপরনাই আহত হন। মনঃকষ্ট সামাল দিতে তিনি দ্রুত নিজের কামরায় ঢুকে যান। বই-পুস্তক নিয়ে বসেন।

পাশের বাসার প্রতিবেশী তাহের সাহেব এক সময় শাহাবুদ্দিন সাহেবের জানি-দোস্ত ছিলেন। দু'জনেই একই সময় পাঁচ কাঠা করে জমি খরিদ করেছিলেন এই পুরানা পল্টনে। নিত্যদিন তাহের উকিল শাহাবুদ্দিনের বাসায় আসতেন। নানা বিষয়ে জমে উঠত গল্প-গুজব। চা চিড়া ভাজা মুড়ি ভুনা আসতো অন্দরমহল থেকে। মাঝে মধ্যে আসতো গরম গরম লুচি আর মোহনভোগ, কখনও ডালপুরি। একসময় উকিল সাহেব অর্থাৎ তাহের আহমদ টেমপোরারি টিনসেড ভেঙ্গে দালানের ভিত দিলেন। বাউন্ডারি দিলেন। শাহাবুদ্দিন সাহেবের সীমানা টিনের ঘর ঘেঁষে তাহের সাহেবের যে টিনের বাউন্ডারি ছিল তা পাকা হল। কিন্তু ডিআইটির নিয়ম অনুযায়ী জমির ফারাক রাখা হল না। শাহাবুদ্দিন বন্ধু মানুষ হাসতে হাসতে ব্যাপারটা মেনে নিলেন। এরপর কয়েক বছর পর শাহাবুদ্দিন সাহেব বাড়ির কাজে হাত দিলেন। টিনসেড উঠে গেল। পাকা বাউন্ডারি হবে। মাটিতে কোদালের কোপ পড়ছে। জনা দশ লেবার খাটছে। বন্ধু তাহের উকিল উঁচু ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন। কুশল বিনিময় হ'ল। একদিন দু'বন্ধু বাড়ির কাজ দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে চা খেলেন। কী সৌভাগ্য শাহাবুদ্দিন সাহেবের। এমন পরম আত্মীয়ের মতো বন্ধু পড়শি পেয়েছেন। আনন্দে হৃদয় ভরে ওঠে তাঁর। আল্লাহকে লাখো শুকরিয়া জানান শাহ-াবুদ্দিন সাহেব।

পরদিন কী দিয়ে কী হয়ে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত। ইনজাংশন নোটিশ। পরম বন্ধু উকিল তাহের পাঠিয়েছেন। অথচ তাহের সাহেবের চেয়ে একটু বেশি জমিই ছেড়ে বাউন্ডারি তুলছিলেন শাহাবুদ্দিন। কিন্তু আইনের গেরো একখানে যে ঠিকঠাক ডিআইটির নিয়ম অনুসারে নয়। তবে উকিল বন্ধু যে নোটিশ পাঠিয়েছেন সেই অপরাধটি তিনি নিজে আরো বেশি করে করেছেন তবে পড়শি শাহাবুদ্দিন সবই হাস্যবদনে মেনে নিয়েছেন এবং ভেবে নিয়েছেন পরস্পর সমঝোতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমেই বিষয়টি নিস্পত্তি হয়ে গেছে। জিলেপির প্যাঁচ তিনি বুঝতে পারেননি ঘূর্ণাক্ষরেও।

সব কাজ বন্ধ। স্টপ। শাহাবুদ্দিন জীবনের প্রথম এতবড় ধাক্কা পেলেন প্রাণের বন্ধু পড়শির কাছ থেকে। দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ রইল। পাড়ায় দু'চারজন শুভাকাঙ্ক্ষী ভালো মানুষও আছে। নেতৃস্থানীয় মুরুব্বিদের নিয়ে দরবার হ'ল। শেষে একটা মীমাংসা হ'ল। শাহাবুদ্দিন দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তাহের সাহেবের বাড়ির দিকে কোন জানালা দিতে পারবেন না। তাই হল। বর্তমানে দোতলায় একঘর ভাড়াটে আছে শাহাবুদ্দিন সাহেবের। এক দেওয়ালে জানালাবিহীন ঘরের কারণে ভাড়া অনেক কম। নিচতলায় তিনি নিজে সপরিবারে বসবাস করছেন। দিন কাটছে ... উকিল সাহেবের একতলা দোতলায় হু হু করে হাওয়া বয়। কোন সমস্যা নেই।

গভীর রাত। হয়তো মধ্যরাত। শাহাবুদ্দিন সাহেবের পাতলা ঘুম ভেঙ্গে গেল টেলিফোনের লাগাতার চিৎকারে। কী ব্যাপার। রিসিভারের ওপাশে তাহের সাহেবের স্ত্রীর কান্নাজড়ানো আকুতি। তাহের সাহেবের বুকে তীব্র ব্যথা! বার কয় জোরে শ্বাস নিলেন মাঝরাতে জেগে ওঠা শাহাবুদ্দিন। আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইলেন। তারপর এ্যাম্বুলেন্স কল করলেন। এ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করায় নিজেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে তাহের সাহেবকে নিয়ে সোজা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন।

আজ ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে কেবিনে আসছেন তাহের সাহেব। আল্লাহর অসীম রহমতে প্রাণরক্ষাকারী ইনজেকশন সময়তো পেয়েছেন তিনি। তিনদিন কেবিনে কাটিয়ে বাসায় ফিরছেন উকিল সাহেব। রোজ শাহাবুদ্দিন পুরনো বন্ধুকে দেখতে যান। মন চাঙ্গা করবার জন্যে নানা হালকা গল্প গুজব করেন। বাড়িতে ফিরে শান্তি পান। দক্ষিণের জানালাবিহীন কারাগারের মতো বন্ধ দেয়াল দেখলে আর তার মনটা হু হু করে ওঠে না। মেনে নিয়েছেন সহজে সবকিছু।

পড়শি মবিন চৌধুরী সাহেব স্পষ্টবাদী মানুষ। রাগী গলায় বলেন,

- শাহাবুদ্দিন সাহেব আমরা আপনাকে নিয়ে কত দরবার করলাম। কতনা বাক্য ক্ষয় হল। তবে ঐটুকু সমঝোতায় আপনার বন্ধু রাজি হলেন। এখন তার জন্যেই আপনি

www.pathagar.com

এত পেরেশান হচ্ছেন। ভাবলে অবাক হই। আচ্ছা বলবেন কী এর মরতবাটা কী! উকিল ত আপনাকে কম হেনস্তা করেননি। কত বাজে কথাও বলেছেন। কতভাবে অপমান করেছেন। আপনি কী সব ভুলে বসে আছেন? এখন আবার শুনি ও বাড়ির বাজারহাট করে দিচ্ছেন। দু'বেলা রোগী দেখতে যাচ্ছেন। ভাইরে আপনার অন্তরে কী আছে। একবার বলুন ত শুনি?

শাহাবুদ্দিন বরফের চাঁই। শীতল হাসিতে মুখ ভরিয়ে মৃদু গলায় বলেন,

- আমার প্রতিবেশীর হকটুকু আদায় করতে হবে না চৌধুরী সাহেব! বেচারার ছেলেমেয়েরা বিদেশে। ভাবী একা মানুষ। এটুকু তো আমার মানবিক দায়িত্ব চৌধুরী সাহেব।

চৌধুরী সাহেব বাঁকা হাসেন, মানবতা! উকিলি চাল চালতে তো বন্ধুর মানবতা কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল।

চৌধুরী সাহেব চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

সুনসান ঘরে এখন একা শাহাবুদ্দিন। আবার নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায় আত্মজিজ্ঞাসা। নিজের সঙ্গে নিজের কথা।

– কী শাহাবুদ্দিন তুমি এখন কী ভাবছ?
- কিছুই না। খুব সহজ হিসেব।
- হিসেবটা বলতো শুনি। সহজ বলে তো মনে হয় না।
- হিসেবটা সহজ। আমার প্রিয় নবীজীর শিক্ষা। কৈশোরে পড়েছিলাম এক বুড়ি প্রিয় নবী (সা) এর চলার পথে কাঁটা পুতে রাখতো। একবার নবীজী দেখলেন পথে কাঁটা নেই। নবীজী আমার ভাবলেন, আহা বুড়ি মানুষটা কী তবে অসুস্থ? তখন তিনি বুড়ির ঘরে যেয়ে দেখলেন সত্যিই বুড়ি অসুস্থ। প্রিয় মুহাম্মদ (সা) সেই দুষ্টু বুড়ির সেবা করতে লাগলেন।

এ শিক্ষা যে আমার নবীজীর শিক্ষা। আমার রক্তে মজ্জায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমি তাই সামান্য চেষ্টা করি। কিছুই পারি না। শুধু একটু চেষ্টা মাত্র।

ততক্ষণে বেগম রমিজা একগ্লাস লেবুর শরবত হাতে ঘরে ঢুকেছেন। তিনি চিরাচরিত স্বভাবে বলে উঠলেন,

- কী ব্যাপার এখনও প্রাণের বন্ধুকে দেখতে যাওনি! ওদিকে যে ওনার বেগমসাহেবা লোক পাঠিয়েছেন। আজ ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে। গাড়ি নিয়ে সঙ্গে যেতে হবে যে।

শাহাবুদ্দিন সাহেব স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন। মহিলা চড়াসুরে কথা বলেন ঠিকই, তবে মনটা খুব কঠিন না।

বাইরে তখন একটা শান্তিদায়িনী বাতাস পুষ্পবতী বেগুনীবর্ণ জারুলগাছটির পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে। ◆

www.pathagar.com

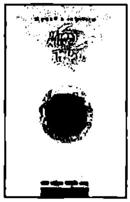

মক্কা ও মদিনায় ভিডিওগ্রাফি

সাইফুল্লাহ মানছুর

জেদ্দা থেকে হঠাৎ করে বজলুর রহমান ভাই ফোন করে মতিউর রহমান মল্লিক ভাই ও আমাকে সেখানে সাংস্কৃতিক সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। বিষয়টা অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই ঘটে গেলো মনে হয়। কেননা সে বছর (২০০২ সাল) আমার একপ্রকার মানসিক প্রস্তুতি ছিলো মক্কা মদিনা যাওয়ার আর এর সাথে সাংস্কৃতিক সফর যুক্ত হয়ে যাওয়ায় খুশি হলাম। মল্লিক ভাইকে খবরটা জানালাম, সাথে সাথেই খুশি হলেন। তবে কিছুটা আশংকা রেখে। তার পূর্বেও অনেকবার দাওয়াত পেলেও সেগুলো পরবর্তীতে ফলোআপ না হওয়ায় তার এই মানসিক অবস্থা। বজলু ভাই সৌদি আরব থেকে ভিসা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজের দায়িত্বটা আমাকে দেয়ায় এক্ষেত্রে আস্থা ছিলো, আল্লাহ চান তো এবার মল্লিক ভাই আল্লাহর ঘরে যাবেন। আরো ভালো লাগলো আমার কাজে মল্লিক ভাইকে সাথে সাথে পাবো।

১৯৯৮ সালে হজ্জ এবং ২০০১ সালে ওমরায় গিয়ে মনে মনে ভেবেছি এই পবিত্র স্থানের ভিডিওগ্রাফি করবো নিজের পরিকল্পনায়। মক্কা মদিনার সচারচর যেসব দৃশ্যাবলী মিডিয়ার বদৌলতে আমরা প্রতিনিয়তই দেখি ইচ্ছা ছিলো তা থেকে ভিন্ন কিছু করার। এবারের সফরে সেই কাজটি করার পরিকল্পনা নিলাম মনে মনে। যথারীতি সময় চলে এলো। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমানের পাখা মেললো আকাশে। ছয় ঘন্টার যাত্রা পথ। জেদ্দা বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য ভাইরা অপেক্ষা করছেন। আমার মেঝো বোন, দুলাভাই জেদ্দায় থাকায় তারাও বিমানবন্দরে চলে এলেন। আমি চলে গেলাম বোনের বাসায়, মল্লিক ভাইকে বজলু ভাই নিয়ে গেলেন সাথে করে। কথা হলো পরের দিন আমরা মিলিত হবো। পরের দিন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে আলাপ আলোচনা চললো, পরিকল্পনা নেয়া হলো সার্বিক সফরের বিষয়।

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা ছিলো জেদ্দায় হয়তো একটি দু'টি অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু বাস্তবের অবস্থা দেখে বিস্মিত হলাম। প্রবাসী ভাইরা শত ব্যস্ততার মাঝেও শুধু জেদ্দাতেই গড়ে তুলেছেন চারটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। রমজান মাস। প্রতিদিন রিহার্সেল চলবে। শেষে ঈদ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে– এই মোটামুটি পরিকল্পনা। সৌদি আরবে রমজান মাসে মানুষের জীবনধারা বদলে যায়। দিনে জীবনযাত্রা শুরু হতে দেরি হয় কিন্তু রাতে কেউ ঘুমায় না। ফজর পর্যন্ত চলে কাজ। তারাবির নামাজের পরে সবকিছু প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। মার্কেটগুলোতে জমজমাট বেচাকেনা হয়। বাচ্চারা মাঠে চলে যায়। গভীর রাতেই চলে ফুটবল খেলা। জেদ্দায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ভাইরাও রাতকেই বেছে নিলেন তাদের চর্চার ভালো সময় হিসেবে। কোথাও রাত ৯টায়। কোথাও ১১টায়, কোথায়ও বা রাত ২টায় রিহার্সেলের সময় দেয়া হলো। আমি আর মল্লিক ভাই প্রতি রাতেই পুরো জেদ্দার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াই আর রিহার্সেলে সহযোগিতা করি। মনে মনে ইচ্ছা জাগলো এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করবো। এখানে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশ থেকে শুটিং করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আসলেও কোনো ক্যামেরা সাথে আনা হয়নি। আমার Production House -এ প্রফেশনাল DV CAM থাকলেও এতো দীর্ঘ সফরের সুবিধার্থে ছোট সাইজের MINI DV ক্যামেরাই যে ভালো হবে তা জেনেই জেদ্দা থেকে এই ক্যামেরা ক্রয়ের পূর্ব-পরিকল্পনা করেছিলাম। আমার বোনটি ক্যান্সারের রুগী। অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার ইচ্ছা বাস্তবায়নে এগিয়ে এলেন। নিয়ে গেলেন জেদ্দার বিশাল ইলেকট্রনিক মার্কেটে। ছোট সাইজের প্রফেশনাল ক্যামেরা (3 CCD) ঢাকার মার্কেটে পাওয়া যায় না। সিংগাপুর থেকে আনতে হয়। কিন্তু জেদ্দার বিশাল মার্কেটে যে তার অভাব হবে তা কখনো ভাবিনি। ঘটলো ঠিক তাই। অসুস্থ বোনকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় ব্যর্থ। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বোনটাও আর হাঁটতে না পেরে বেঞ্চে বসে পড়লো। মনে মনে ভাবলাম এ বছরও কাজটা হবে না। সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে কাজটা করার ইচ্ছা হলো না। বোনের কষ্ট দেখে বললাম থাক চলো যাই। কি আশ্চর্য! হঠাৎ কাছেই চোখে পড়লো SONY কোম্পানির বড় একটা শো-রুম। বোন বললো চলো ওখানে শেষ দেখে যাই। শো-রুমে ঢুকে ম্যানেজারকে মডেলের নাম বলতেই মুচকি হেসে দিয়ে ভিতর থেকে বের করে আনলেন আমার মনের মতো মডেলের MINI DV ক্যামেরা। ক্যাটালগটা ভালো করে দেখে নিলাম। অল্প সময়েই আয়ত্তে চলে এলো। অবশ্য এই ক্যামেরার ব্যাপারে টেলিভিশনের সাবেক পরিচালক (ক্যামেরা) গোলাম মোস্তফা সাহেব আমাকে পূর্ব ধারণা দিয়েছিলেন। জেদ্দায় যে চারটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ চলছিলো তাদের কার্যক্রম ধারণ করলাম।

কয়েকদিন পর মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হারাম শরীফের খুব কাছেই জমজম

www.pathagar.com

হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা হলো। আব্দুল বাকী ভাই ছিলেন আমাদের খোঁজখবর নেয়ার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে। সাথে আবুল বাশার ভাইসহ আরো অনেকেই ছিলেন। ওমরাহ শেষ করলাম। পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভিডিওগ্রাফির জন্য।

প্রথমেই গেলাম হেরা পাহাড়ে। হারাম শরীফ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই ঐতিহাসিক পাহাড়ের অবস্থান। আগে যে দু'বার মক্কায় গিয়েছিলাম তখন এই পাহাড়ে উঠে হেরা গুহা দেখা হয়নি। এই পাহাড়ে উঠতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। অসম্ভব মনোবল ছাড়া এখানে ওঠা সম্ভব নয়। আমাকে উঠতেই হবে কারণ কষ্টটা ভবিষ্যতে থাকবে না, থাকবে কাজটা। আমাদের সহযাত্রী আবুল বাশার ভাই এক সৌদি মোয়াল্লিম অফিসের কর্মকর্তা। হাজীদের নিয়েই তার কাজ। বললেন, ১৯ বছর ধরে কাজ করলেও একবারও এই পাহাড়ে ওঠেননি। আমাদের উৎসাহে রাজি হয়ে গেলেন। পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে উঠছি। মক্কা শহরটি ছোট হতে থাকলো আস্তে আস্তে। সাথে সাথে ভিডিওগ্রাফি চলছে। মল্লিক ভাই অতি উৎসাহে আমাদের আগেই অনেক উপরে উঠে গেলেন। পাহাড় ঘেঁষা আঁকাবাঁকা পথ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা আছে। ধীরে ধীরে উঠছি আর ক্লান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময় মনে হলো আর উঠতে পারছি না। তারপরও সবার ওঠা দেখে এগিয়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শীর্ষে পৌছে গেলাম। হেরা গুহায় যাওয়ার জন্য এবার একটু নামতে হলো। তারপর সরু একটা গুহা অতিক্রম করে মূল হেরা গুহায় যেতে হয়। প্রতিটি পর্যায় ভিডিওগ্রাফি হলো। এই গুহায় পৌছে সবাই আবেগপ্রবণ হয়ে যান। কয়েকজনকে দেখলাম অঝোরে কেঁদেই যাচ্ছেন। মনে হতে লাগলো প্রতিদিন কত কষ্ট করে রাসূল (সা) এখানে ধ্যানমগ্ন হতে আসতেন! আরও বিস্ময়কর হলো হযরত খাদিজা (রা) একজন মহিলা হয়েও প্রতিদিন কত ত্যাগ স্বীকার করে তার প্রিয় মানুষটির জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। চারিদিকে পাহাড় আর দৃশ্যাবলী দেখে ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও মনে হলো বিংশ শতাব্দী নয়, আমি হাজার বছর পূর্বের মক্কায় আছি। হেরা পাহাড়ের উপর থেকে হারাম শরীফের মিনার ভালোভাবে দেখা যায়।

হারাম শরীফের মিনারকে জুম করে হেরাগুহাকে নিয়ে একটা প্যান শর্ট নিলাম। বিভিন্নভাবে দৃশ্য ধারণ হলো। মল্লিকভাই-এর কণ্ঠে জনপ্রিয় গান– 'আয় কে যাবি সঙ্গে আমার নবীর দেশে আয়' গানটির শুটিং সাথে সাথেই করলাম। এবার আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসলাম।

আবুল বাশার ভাই আমাদের নিয়ে গাড়িতে ছুটলেন আরাফাতের ময়দানের দিকে। দ্রুত বেগে ছুটছে গাড়ি। একটু ভিন্ন পথ দিয়েই এগিয়ে গেলেন তিনি। ইচ্ছা, যাত্রায় বৈচিত্র্য আনা। হঠাৎ পথে উটের খামার চোখে পড়লো। গাড়ি থামালেন তার পাশেই। একজন খামারী উটের দুধ বিক্রি করছেন। দেশে গরু বা ছাগলের দুধ ফুটিয়ে খাওয়া হয় সুতরাং

www.pathagar.com

উটের কাঁচা দুধ খাওয়ার রুচি হলো না। আবদুল বাকী ভাই বললেন খাওয়ার জন্য। সবার উৎসাহে এক পেয়ালা দুধ পান করে বিস্মিত হলাম। কাঁচা দুধ অথচ গন্ধহীন, হালকা গরম, এককথায় চমৎকার। মরুভূমির সাথী উটের যে কতগুণ তার মাত্র একটি দেখে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। পুরো খামারটা ক্যামেরায় ধারণ করলাম। এরপর আরাফাতের ময়দানে একে একে জাবালে রহমত, মসজিদে নামিরা, মুজদালিফায় ছবি তুললাম। হজ্জের সময় এই এলাকাটি যতটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে ঠিক ততটা নির্জীব জনমানবহীন হিসেবে দেখলাম। আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য এই মরু অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সরব উপস্থিতি সত্যিই বিস্ময়কর। মিনাতে এসে জমরায় পাথর নিক্ষেপের স্থানে চিত্র ধারণ করছি আর ভাবছি, চার বছর পূর্বে হজ্জে এসে পাথর নিক্ষেপের সময় হঠাৎ একটি পাথর এসে আমার বাম চোখের চশমাটা ভেঙ্গে ফেললো। আল্লাহর ইচ্ছায় চোখটা সেযাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। অল্প যে কয়জন আমাদের মত জমরায় শয়তানের স্ত ম্ভ দেখছিলো তারাও তখন ব্যস্ত পাথর নিক্ষেপে। শয়তানের প্রতি ধিক্কার যেন চলমান ধারা। আমরাও যদি আমাদের ভিতরে লুকায়িত শয়তানী পশুত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে বিজয়ী হই তাহলেই এর স্বার্থকতা। মক্কায় ফিরে আসার পথে আবরাহার হস্তি বাহিনীর ধ্বংসের স্থানের ভিডিওগ্রাফি করলাম। মক্কায় ফিরে এসে হোটেলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে রাতে আবার বেরিয়ে পড়লাম ক্যামেরা নিয়ে। হারাম শরীফের ছবি ধারণ করলাম। আবদুল বাকী ভাই নিয়ে গেলেন হারাম শরীফের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো বিশাল ফাইভ স্টার হোটেলের স্যুটে। পুরো হারাম শরীফ চমৎকারভাবে ক্যামেরায় চলে এলো।

এরপর যাত্রা মদিনা মুনাওয়ারার দিকে। মসজিদে নববীর কাছেই আমরা উঠলাম। রমজান মাস। ইফতারের সময় চলে এলো। এমন সময় স্মৃতিতে এলো তার আগের বছরের রমজান মাসের কথা। সেবারও আমার দু'বোনসহ লণ্ডনে অসুস্থ এক বোনকে দেখতে যাওয়ার সময় ওমরাহ্ করতে সৌদি আরব যাত্রা বিরতি করেছিলাম। মদিনায় বিকেলে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে হোটেল বয়কে ইফতারের কথা জিজ্ঞেস করতেই হেসে বললো, মসজিদে নববীতে গিয়ে ইফতার করতে। ছোট বয়সে মাঝে মাঝে রোজা না রেখে মসজিদে মুসল্লিদের সাথে ইফতারের স্মৃতি তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেলো। এ এক অসাধারণ দৃশ্য। সবাই সবাইকে আপন করে জায়গা করে দিচ্ছেন। নিজের খাবার পাশের জনকে দিচ্ছেন। বিকেল থেকেই মসজিদে নববীর চত্বর চাদর ফেলে দখল হয়ে যায়। কোন প্রতিষ্ঠান, পরিবার বা ব্যক্তির ইচ্ছা হলো আজ রোজাদারদের ইফতার করাবে, সাথে সাথেই সে এ কাজটি পূর্বেই করে নেয়। তারপর তার জায়গায় বসে ইফতার করার জন্য কি যে আকুতি তা না দেখলে বুঝানো যায় না। যেমনি ঘটেছিল মক্কা শরীফে। এক পরিবার হারাম শরীফের ভিতরে চাদর ফেলেছে। পরিবারের কর্তা তার স্ত্রী আর তিন ছেলে মেয়ে বাসা থেকে ইফতার এনেছে। পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেই

www.pathagar.com

ছোট বাচ্চাটি আমার হাত চেপে ধরে তার জায়গায় বসালোই। পরিবারটিও মহাখুশি। মনে হলো আমাদের দীর্ঘ দিনের পরিচিত। চোখে আনন্দের অশ্রু চলে এলো। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মুসলমানদের এই যে সংস্কৃতি– তা যদি আমরা সত্যিই সব সময় আঁকড়ে থাকতাম তাহলে দুনিয়াটাই জান্নাত হয়ে যেতো। মদিনা মুনাওয়ারায় ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের কতগুলো দৃশ্য ধারণ করলাম। এর ফাঁকে জান্নাতুল বাকীর ছবি তোলা হলো। দুনিয়া এক সময় এঁরা কাঁপিয়েছেন। আজ নির্জীব জান্নাতুল বাকী দেখে ক্ষণিক দুনিয়ার কথাই বেশি মনে হলো যার জন্য আমরা বেশি পেরেশান থাকি। রাতে তারাবির নামাজ ও অন্যান্য দৃশ্যাবলী ধারণ করা হলো। ইমামের তেলাওয়াতে কোন ব্যস্ততা নেই। সময়টা খুব প্রশান্তিতেই কেটে যায়। পুরোটা রাত জুড়ে ইবাদত ও অন্যান্য কাজে সবাই ব্যস্ত থাকে। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ জামায়াতে আদায় হয়।

পরের দিন সকালে আমরা ওহুদ পর্বতের পাদদেশে পৌছলাম যেখানে রাসূল (সা) মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন হযরত হামজা (রা)। পুরো প্রান্তরটা আজও নীরব স্বাক্ষী হয়ে আছে। পাহাড়ের উপর উঠে পুরো প্রান্তরের দৃশ্য ধারণ করলাম।

এরপর গাড়ি চললো বদরের প্রান্তর অভিমুখে। মদিনা থেকে শতাধিক মাইল দূরে এই প্রান্তর যেখানে কাফেরদের সাথে রাসূল (সা) সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, রাসূল (সা) কত দক্ষ সমরবিশারদ ছিলেন, যার কারনে মদিনা থেকে এত দূরে এসে তিনি কাফেরদের মুকাবিলা করতে পেরেছিলেন। প্রান্তরটি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রখর রোদের মধ্যে চিত্র ধারণের কাজটি শেষ করলাম। এখানে 'বদরের প্রান্তরে ভাই প্রান্তরে' গানটির চিত্রায়ন করা হলো। দিনে দিনে ফিরে এলাম মদিনায়।

মসজিদে কুবা, মসজিদে কেবলাতাইন, মসজিদে জুমা ইত্যাদি মসজিদের ছবি তুললাম। তিনদিন পর আবার আমরা জেদ্দায় ফিরে এলাম। সাংস্কৃতিক গ্রুপগুলোর রিহার্সেল চমৎকারভাবে এগিয়ে চললো। দেখতে দেখতে চলে এলো ঈদ। জেদ্দার সবচেয়ে বড় ঈদের জামায়াতে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হলাম। প্রবাসে ঈদের নামাজে ভিন দেশী ভাইদের সাথে সহঅবস্থান এই প্রথম। ভালোই লাগলো। এখানেও ক্যামেরা চললো তার গতিতে।

ঈদের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেদ্দার ৪টি অঞ্চলে ৪টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এক ধরনের হলিডে স্পট। বিশাল আয়তনে ঘেরা এক একটি স্পটের ভাড়া অনেক। ভিতরে থাকে ছোট ছোট ঘর, সাথে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কিছু গাছ। এসব গাছ বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের নিতে হয় বিশেষ

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি প্রোগ্রামেরই প্রবেশ পত্র বিক্রি হলো। জেদ্দা অনেক বড় শহর। মাঝে মাঝে যে বাংলাদেশী ভাই দেখা যায় না তা নয়। ক্লিনিং এর কাজ দেশী ভাইরাই বেশি করেন। কিছু কিছু দোকানও চালান তারা। তাছাড়া ভালো কিছু চাকরিতেও আছেন বাংলাদেশী ভাইয়েরা। কিন্তু প্রতিটি অনুষ্ঠানে দুই তিন হাজার বাংলাদেশী ভাইদের সরব উপস্থিতি সত্যিই বিস্ময়কর ছিলো। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ভাইদের পরিবেশনায় নাটক উপস্থাপিত হলো। আমি আর মল্লিক ভাই নাটকের আগে পরে গান পরিবেশন করতাম। শহীদ ভাই বরাবরই একজন সংস্কৃতিবান ও ভালো সংগঠক। কারিগরি দক্ষতা তার আছে। তার সহযোগিতা নিয়ে এসব অনুষ্ঠানের ভিডিওগ্রাফি সারলাম। চারটি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর জেদ্দার অন্যতম পরিচিত হলে আয়োজন করা হলো মল্লিক ভাই ও আমার একক পরিবেশনার অনুষ্ঠান। কয়েক হাজার দর্শক ধারণে সক্ষম হলটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো। সেই অনুষ্ঠানটিও ক্যামেরাবন্দী করা হলো। এভাবে একটি মাস যে কখন চলে গেলো টেরই পাইনি। অনেক স্মৃতিই এখনো ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে ভিডিওগ্রাফিগুলো দেখি আর স্মৃতি বাস্তবে এসে ধরা দেয়। এরই মাঝে মক্কা শরীফে ধারণকৃত দৃশ্যাবলী দিয়ে 'মক্কাতুল মুকাররমা ইতিহাসে ফিরে যাওয়া' নামে ডকুমেন্টারি শেষ করেছি। ইচ্ছা আছে মদিনা মুনাওয়ারা নিয়ে আরেকটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ আর জেদ্দায় ধারণকৃত অনুষ্ঠানগুলো থেকে নির্বাচিত কিছু করার। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে ভিডিওগ্রাফির ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো কিছু ইচ্ছা যেন আল্লাহ পূরণ করেন। আমিন। ◆

www.pathagar.com

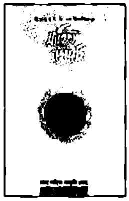

তিনটি প্রশ্ন

মার্টিন লিঙস্

তরজমা ঃ জিয়াউল আহসান

(প্রবন্ধটি লেখকের Muhammad his life based on the earliest sources গ্রন্থের ষড়বিংশ অধ্যায় Three Question এর অনুবাদ। গ্রন্থটি রচনায় লেখক অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল আরবী উৎস গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রথমবারের মত ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থটি এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ, এটাতে প্রথমবারের মত মুহাম্মাদ (সা) এর জীবন থেকে নেয়া ঘটনা পশ্চিমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়।

মার্টিন লিঙস্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এবং আরবীতে ডিগ্রী নেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো বছর শেক্সপিয়ারের উপর পড়েছেন। ব্রিটিশ যাদুঘরে **অরিয়েন্টাল ম্যানুসক্রিপ্ট**- এর **কিপার** ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম দ্যা সিক্রেট অব শেক্সপিয়র, অ্যানসিয়েন্ট বিলিভস্ এন্ড সুপারস্টিশনস, পদ্যের দু'টো খণ্ড স্ট্যাডিজ ইন কম্প্যারেটিভ রেলিজিয়ন এবং দ্য ইসলামিক কোয়ার্টারলিতে ইসলামী লিপি, কলা ও সাহিত্য এবং ইতিহাসের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। - অনুবাদক)

কুরাইশরা সমবেত হলে সবসময়ই তাদের প্রধান সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। এইসব আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কিংবা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান বা সমাধানের পথ খোঁজা হত। এধরনের একটি আলোচনায় সিদ্ধান্তক্রমে ইয়াথরিবকে ইহুদী আইনজ্ঞ ও যাজকদের (যা রাব্বি বা রাবাই) কাছে পাঠানো হয়। তারা (কুরাইশ) তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে বলে দিয়েছিলেন, "মুহাম্মাদ সম্পর্কে তাদের কাছে প্রশ্ন করবে" "তিনি কি বলেন জেনে আসো এবং ফিরে এসে আমাদের জানাও; কারণ তাদের কথা আদি বাইবেলে বলা আছে। তাই আমাদের চাইতে তাদেরই নবী সম্পর্কিত জ্ঞান বেশী।" ইহুদী যাজকরা বলে পাঠালেন, "তাকে তিনটি প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যাবে। উত্তর দিতে পারলে তিনি আল্লাহর নবী; অন্যথায় মিথ্যা বলে জালিয়াতি করছেন। প্রাচীন কালে এক বিস্ময়কর ঘটনায় কয়েকজন যুবক তাদের গোষ্ঠী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

তাকে জিজ্ঞেস করুন। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। সেই দূর পর্যটকের কথা, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। আত্মা কি? এ সমন্ধে বলতে পারলে তাকে মেনে নিন। কারণ তিনিই নবী।

দূতেরা র‍্যাবাইয়ের প্রশ্নসহ মক্কায় ফিরে আসার পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নবীর কাছে গেলেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "আমি আগামীকাল উত্তর দেব।" কিন্তু তিনি তা বলতে ভুলে গেলেন– "যদি আল্লাহ সহায় হন।"

পরদিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আসলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। এইভাবে ১৫টি রাত পেরিয়ে গেল। তিনি কোন বার্তা পেলেন না। তাঁর কাছে প্রশ্নের জবাব চাওয়ার পর গ্যাব্রিয়েল (জিব্রাইল) আসেননি। মক্কার লোকেরা বিদ্রূপ করতে লাগলো। তিনি যা বলেছেন, এজন্যে মর্মপীড়া বোধ করতে লাগলেন। যে সাহয্যের আশায় ছিলেন, তা না পাওয়ায় অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়লেন। অবশেষে জিব্রাইল আসলেন। নিজের লোকেরা তাকে যে নিন্দা, ভৎসনা করেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। পরিশেষে তাকে জানিয়ে গেলেন তিনটে প্রশ্নের উত্তর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কালে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, তার ব্যাখ্যা পেলেন এভাবে। অতঃপর আপনি কিছুই বলবেন না। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন যথার্থই তিনি আগামীকাল করতে পারেন।

এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিল বেদনাদায়ক। কিন্তু বার্তা পাওয়ার পর বাস্তবিকই তাঁরা মানসিকভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুরা এটা বিশ্বাস করতে পারেনি। কুরাইশদের ভেতরে যারা দোদুল্যমান ছিলেন রাসূলের এই ঘটনাকে এতোটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন যে, তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো, স্বর্গ থেকে এই বার্তা এসেছে এবং তিনি কোনভাবেই এই প্রক্রিয়ার (বার্তা আদান প্রদান প্রক্রিয়া অর্থাৎ রাসূল সত্য বিকৃত করেননি।) সাথে সংশ্লিষ্ট নন কিংবা ঘটনার উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা বিশ্বাসযোগ্য, যদি এজাতীয় ব্যাখ্যা (বার্তা আগমন সম্পর্কিত) মুহাম্মাদের মস্তিষ্কপ্রসূত হবে, তবে অত্যন্ত বিপদের মধ্যে থেকেও সর্বশেষ ঘটনায় তিনি এতো দীর্ঘ সময় কেনো নেবেন?

বরাবরের মত বিশ্বাসীদের দৃঢ়তা আরও বেড়ে গেল। যখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হলো, প্রাচীন কালে কয়েকজন যুবক কেন নিজ সম্প্রদায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এর উত্তর তারা জানতো না। তাই বিদ্যমান অবস্থার আলোকে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হতো। কারণ মক্কায় এঘটনা কেউ কখনো শোনেনি। উপরন্তু এই ঘটনা তাদের জাতিগত মর্যাদার প্রশ্নেও ছিলো অত্যন্ত হানিকর। কিন্তু বিশ্বাসীদের পক্ষে তা ছিল বিজয়ের শামিল।

এই কাহিনী এফেসাস-এর অধিবাসীদের একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তৃতীয়

www.pathagar.com

শতাব্দীর মাঝামাঝি এফেসাসের অধিবাসীরা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলে, তখনও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী কয়েকজন যুবক তাদের রোসানলে পতিত হয়। পৌত্তলিকতা গ্রহণ না করায় যুবকদের নির্যাতন, নিপীড়ন, নিগ্রহের শিকার হতে হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের আশায় তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা আলৌকিক ভাবে তিনশ' বছরেরও বেশী সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। অধিকন্তু ইহুদীরা ইতিমধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা জেনেছিলো। কুরআনে বিশদভাবে বলা আছে- মানুষের চোখ কখনো তা দেখেনি- যুবকেরা যেভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েকশতাব্দীব্যাপী একটি নির্জন গুহায় ঘুমিয়েছিল এবং তাদের বিশ্বস্ত কুকুর কিভাবে থাবা উঁচিয়ে প্রবেশ পথে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পাহারা দিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মহান পর্যটকের নাম ধু আল-কারনাইন, দুই শিং বিশিষ্ট এক মানুষ। তার সমন্ধে বলা হয় তিনি সুদূর পশ্চিম থেকে সুদূর পূর্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এরপর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের বাইরে আরো কিছু বর্ণনা দেয়া হয়। এই বর্ণনায় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অলৌকিক তৃতীয় ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। সেখানে জনসাধারণ তাদের আবাসভূমি ধ্বংসযজ্ঞের হোতা গগ্ এবং ম্যাগন (Gog and Magon) ও অন্যান্য জ্বিন হতে পরিত্রানের আশায় তার কাছে প্রার্থনা করতো। যে কোন দুষ্ট শক্তিকে দমন করার ক্ষমতা স্রষ্টা তাকে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় মহান ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের আগে সেই স্থান হতে কারনাইনের মুক্তি মিলবে না। রাসূল বলেছেন, যতোক্ষণ না তারা (উল্লেখিত অপশক্তি) পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় মেতে উঠবে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞই শেষ দিনকে নির্দেশ করবে। অনতিভবিষ্যতে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বার্তায় যা বর্ণিত হয়েছে, অনুধাবন করা দুঃসাধ্য; আত্মা মানুষের মন অতিক্রম করে সবকিছু ছাড়িয়ে বিরাজমান তার আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়, আত্মা আমার প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ আত্মা আমার প্রভুর নির্দেশবাহী। তুমি কোন জ্ঞান দিতে পার না কিংবা সামান্য জ্ঞানই তুমি ধারণ করতে পার।

নবী মুহাম্মাদের উত্তর জানার জন্য ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছিল। বিশেষ করে জ্ঞান (Knowledge) সম্পর্কিত শেষ বাক্যের ব্যাখ্যা শোনার জন্য তারা ছিল উদগ্রীব। তাই প্রথম সুযোগেই তারা জানতে চাইলো তিনি কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। তাঁর (রাসূল) নিজের লোকদের, না তাদের (ইহুদী) উদ্দেশ্যে। "তোমাদের উভয়ের জন্য" রাসূল বললেন। তারপর দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন, এই জ্ঞান সবার জন্য সমস্ত কিছুর জন্য তাওরাত গ্রন্থে তারা যেমন পড়েছে, সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা (an

www.pathagar.com

exposition of everything) কুরআন একইভাবে এ সমন্ধে সুনিশ্চিত, দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল উত্তর দিলেন, "এটাই সব, কিন্তু স্রষ্টার সমগ্র জ্ঞানের খুব সামান্য প্রকাশ; কিন্তু তোমরা যদি চর্চা করো তবে এতোটুকুই তোমাদের জন্য যথেষ্ট" স্রষ্টা প্রেরিত বার্তায় তাঁর (স্রষ্টা) জ্ঞান সম্পর্কে স্রষ্টার কথা (Words of god) উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূল বললেন, যদি ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বৃক্ষ কলম হয় সাত সমুদ্রের সমস্ত পানি লেখার কালি হয়, তাতেও স্রষ্টার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ র‍্যাবাইদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিল না।

আবার সব প্রত্যাশার বিপরীতে তাদের (র‍্যাবাই) প্রশ্নের উত্তর দেয়া সত্ত্বেও রাসূলকে স্বীকৃতি দিতে ইহুদী ধর্মগুরুদের বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু এর ফলে অনেকেই (অবিশ্বাসীরা) তাদের মতামত নতুন করে পর্যালোচনায় উদ্যোগী হলেন। ফলে রাসূলের (সা) অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা এই ভেবে ভীত হয়ে পড়লো, তাদের সম্প্রদায় এবং তাদের জীবনধারা অধিকতর বিপদের মুখে। কারণ যাদেরকে তারা একসময় চরম নির্যাতন করেছে, সেই রাসূলের অনুসারীরা এখন থেকে বেশী সংগঠিত ও শক্তিশালী।

প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের মত করে মুসলমানদের সাথে ব্যবহার করেছে। তারা তাদের (মুসলমান) কারারুদ্ধ করেছে। নির্দয়ভাবে প্রহার করেছে। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রেখে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছে। নবগৃহীত ধর্ম পরিত্যাগ করানোর জন্য সূর্যতপ্ত মক্কার মরুভূমিতে, যখন বালি সর্বোচ্চ পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে, লম্বালম্বি শুয়ে থাকতে বাধ্য করানো হয়েছে। জুমাহ্ গোত্র প্রধান উমাইয়ার বিলাল নামে এক আফ্রিকীয় ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা একজন বিশ্বাসী। এক দুপুরে উমাইয়া তাকে খোলা ময়দানে নিয়ে যায়। অতঃপর সেখানে তাকে শুইয়ে বুকের উপর বড়ো একখণ্ড পাথর চাপা দেয়। উমাইয়া শপথ করে বলে, যদি সে মুহাম্মাদকে অস্বীকার এবং আল্-লাত ও আল্-উজাহ'র উপসনা না করে, তবে মৃত্যু না ঘটা অবধি তাকে এভাবেই ফেলে রাখা হবে। যখন তাকে সীমাহীন নির্যাতন করা হচ্ছে, তখন শুনা যাচ্ছিলো বিলাল বলছে, "এক, এক" ('আল্লাহ্ এক'অর্থে)। তখন যা ঘটলো, তাহলো বৃদ্ধ ওয়ারাকাহ্'র অতীতের অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেই অসহনীয় নির্যাতনের মুখে সে বলতো, "এক, এক"। ওয়ারাকাহ্ বলে উঠলেন, "সত্যিই এক, এক ওহ্ বিলাল।" তিনি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে তার সমাধি আমি সৌধে রূপান্তরিত করবো।"

কুরাইশ গোত্রের সব ব্যক্তি গোত্র পরিবৃত্ত অবস্থায় বাস করতো না। এদের একজন আবু বকর বনি জুমাহ্ গোত্রের কাছাকাছি একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। ফলে অন্যান্য

www.pathagar.com

গোত্রের অধিকাংশ লোকের চাইতে নবীর সাহচর্য পেতে তার সুযোগ অনেক বেশী ছিল। মুহাম্মাদ প্রত্যেকদিন বিকেলে আবু বকরের কাছে যেতেন। কথিত আছে রাসূল (সা) যে বার্তা (ওহী) পেতেন তার অংশবিশেষ আবু বকর-এর মুখে লেখা থাকতো। আবু বকরের স্মৃতি শক্তি ছিল বইয়ের মত। মক্কার যে অংশে তিনি বাস করতেন, সেখানে এক সময় তাকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু আদর্শগত বিরোধের কারণে পরবর্তীতে গোত্র প্রধানরা তাকে দেখলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তার মাধ্যমে বিলাল ইসলাম গ্রহণ করে। যখন দেখলেন তারা বিলালের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে; তখন তিনি উমাইয়াকে গিয়ে বললেন, "তুমি এমন একজনকে শাস্তি দিচ্ছো, যে দেবদেবীকে ভয় পায় না। এভাবে একজন গরীবকে শাস্তি দেয়া কি ঠিক হচ্ছে?"

"আমাদের ন্যায়-নীতি, বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছে বলেই তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে", উমাইয়ার রোষান্বিত জবাব, "তাকে রক্ষা করতে চাইলে করতে পার।"

"ঠিক আছে", আবু বকর বললেন, "আমার কাছে একটি কালো যুবক আছে। সে এর চাইতেও কষ্ট সহিষ্ণু এবং শক্ত সবল। সে তোমার ধর্মের অনুসারী। তার বিনিময়ে আমি বিলালকে পেতে চাই।"

উমাইয়া রাজি হলো এবং আবু বকর বিলালকে মুক্ত করে দিলেন।

তিনি ইতিমধ্যে এভাবে ছয়জনকে মুক্ত করেছেন। প্রথমজন ছিলেন আমির ইবনে ফুহাইয়া, গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান একজন ব্যক্তি। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আমির ছিলেন একজন মেষপালক, মুক্ত হওয়ার পর তিনি আবু বকরের মেষ-এর পাল প্রতিপালনে নিযুক্ত হন। আরেকজন ছিলেন উমরের ক্রীতদাস বালিকা। দাস জীবন থেকে তাকেও মুক্ত করে দেন। তিনিও ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম পরিত্যাগ করে আদি ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে উমর তাকে বেদম প্রহার করেছিলেন। আবু বকর সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমরকে বললেন, তিনি ক্রীতদাসীকে বিক্রি করবেন কিনা। উমর রাজি হলেন। আবু বকর দাসীটিকে ক্রয় করলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। নির্যাতনকারীদের মধ্যে অন্যতম নিষ্ঠুর ছিলেন আবু জাহল। (মক্কার) একটি প্রভাবশালী পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে, স্রেফ শুধু বিরোধিতা করতে আবু জাহল তাকে অপমান করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন তার খ্যাতি ধ্বংস করে দেবেন ও হাস্যাস্পদ ব্যক্তিতে পরিণত করবেন। যদি তিনি একজন ব্যবসায়ী হন, তাকে ধ্বংস করতে সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রী ক্রয় না করার জন্য সবাইকে সংগঠন করার হুমকি দেবেন। যদি তিনি একজন নিরাপত্তাহীন ব্যক্তি হন তার নিজের গোত্রের হলে তিনি তাকে নির্যাতন করবেন। যদি অন্যান্য গোত্রে তার (ইসলাম গ্রহণকারীর) শক্তিশালী সহযোগী থাকে, তবে সেই দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন স্বধর্ম পরিত্যাগকারীর সাথে

www.pathagar.com

একই ব্যবহার করার জন্য তিনি উপদেশ, যুক্তির মাধ্যমে প্ররোচিত করার চেষ্টা করবেন।

প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে তার জ্ঞাতিরা তাদেরই তিনজন গরীব মিত্র, ইয়াসির, সুমাইয়া ও তার ছেলে 'আমর'কে নির্যাতন করে। কিন্তু তারা ইসলাম পরিত্যাগ করার হুমকি প্রত্যাখ্যান করে। প্রচণ্ড নির্যাতনে সুমাইয়াহ্ মৃত্যুবরণ করেন। (সচরাচর মক্কাবাসীরা নওমুসলিমদের যেভাবে নির্যাতন করতো সবক্ষেত্রে তার প্রকৃতি একই রকম ছিলো না। এক্ষেত্রে কৌশলে তাদের নিকট থেকে পরোক্ষ স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়)। মাখজুম গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীরা অত্যাচারের মাত্রা কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করে, "আল্লাহ্ যেমন তেমনি আল্-লাত এবং আল্-উজাহ্ কি তোমার প্রভু নয়? "

তারা বলে, হ্যাঁ।

এসময় একটি গোবরে পোকা বুকে হেঁটে যাচ্ছিল। তারা প্রশ্ন করে, "আল্লাহ যেমন এই পোকা কি তেমনি তোমার প্রভু নয়?"

সহ্যাতীত নির্যাতন এড়াতে তারা সহজে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

নব-গৃহীত বিশ্বাসের বিপক্ষে তাদের এই সব পরিহাসসূচক বিবৃতি ছিল কেবলি মৌখিক, হৃদয় উৎসারিত নয়। এদের অনেকে অত্যন্ত গোপনে ইসলাম চর্চা করতেন। কিন্তু কেউ কেউ ইসলাম পালন করতেন কোনো রকম রাখ-ঢাক ছাড়াই। তারপরও তাদের ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত উদাহরণের প্রসঙ্গ টানা যায়। যেখানে কয়েকজন যুবক দেব-দেবীর পূজা পরিহার করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের গোত্র ত্যাগ করে স্রষ্টার আশ্রয় নেন। আবার রাসূল (সা) দেখলেন, নির্যাতন এড়াতে স্বগোত্র ছেড়ে তিনি হিজরত করলেও তাঁর অনেক অনুসারী করতে রাজি নয়। তখন তিনি তাদের বললেন, "যদি তোমরা আবিসিনিয়া যাও, দেখবে সেখানে একজন রাজা আছেন। তোমরা নির্যাতন মুক্ত একটি দেশ পাবে। ধর্মীয় উদারতায় পরিপূর্ণ একটি ভূমি। (সেখানে অকপটে ধর্ম পালন করতে পারবে) আল্লাহ যতোদিন পর্যন্ত বর্তমানের নির্যাতন হতে নিস্কৃতি করে না দেন, ততোদিন পর্যন্ত সেখানেই থাকো।" অবশেষে তাঁর কিছু অনুসারী আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম অভিবাসন। ◆

www.pathagar.com

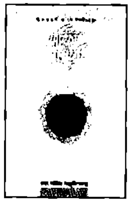

বর্তমান সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মহানবীর (সা) আদর্শ

ইকবাল কবীর মোহন

আমাদের বর্তমান বিশ্ব এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দুনিয়ার দেশে দেশে জ্বলছে অশান্তির দাবানল। অধিকাংশ মানুষের মাঝে বর্তমানে বিরাজ করছে চরম অশান্তি ও অস্থিরতা। খুনখারাবি, হানাহানি আর অবিচার-অনাচারে ভরে গেছে প্রতিটি জনপদ। কি উন্নত, কি অনুন্নত- প্রতিটি সমাজেই চলছে সীমাহীন বিশৃংখলা। মানুষ তাই হন্যে হয়ে ঘুরছে এতটুকু শান্তির অন্বেষায়, সুখ লাভের আশায়। সমাজের এই অস্থিরতা দূর করতে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে দুনিয়ায় মানব রচিত আদর্শ ও মতবাদের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন সমাজে এসেছেন তথাকথিত অনেক বুদ্ধিজীবি,সংস্কারক ও মহামানব। তারা নানাভাবে মানুষের সমাজকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তবে সবার আদর্শই পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মানুষ মানুষের সমস্যার আদৌ বাস্তব কোন সমাধান দিতে পারেনি। ফলে বিশ্বে শান্তি ও স্থিতির সম্ভাবনা বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। এতে অনায়াসেই বেড়েছে সমাজের বিশৃংখলা ও অশান্তি। পরিণামে মানুষে মানুষে বেধেছে বিবাদ। সমাজে সমাজে বেঁধেছে সংঘাত-সংঘর্ষ। আর দেশে দেশে বেধেছে মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ। তাতে বিশ্বের মানচিত্র মানুষের তাজা খুনে রনজিত হয়েছে। গোটা দুনিয়ার বিভি-ন্ন সমাজের দিকে তাকালে অশান্তির এই ভয়ংকর দাবানল সহজেই আমরা অবলোকন করতে পারি। অথচ এ অশান্তির কারণ আমরা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি না। মানব রচিত মতাদর্শই যে এই অশান্তির মূল কারণ– তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনা। মানুষের গড়া আদর্শ যে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না- এই স্বত:সিদ্ধ বিষয়টা আমরা বারবার ভুলে যাই । মানুষের এইসব সমস্যার সমাধান করে সবার জন্য অনাবিল শান্তি ও ঈর্ষনীয় শৃংখলার এক অনুপম সমাজ একসময় কায়েম করেছিলেন

www.pathagar.com

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আজ থেকে চৌদ্দ'শ পনের বছর আগে তিনি মহান আল্লাহর মহামান্বিত দীনের আলোকে গড়েছিলেন সুন্দর এক সমাজ কাঠামো। আর তার সুষমা ও সৌরভ অব্যাহত ছিল বহু শতাব্দী ধরে। মানব রচিত মতবাদের ভীড়ে এই মহান আদর্শ যখন হারিয়ে যেতে বসল ঠিক তখন থেকেই সমাজে শুরু জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন।

আমাদের প্রিয় নবী, মানবতার শ্রেষ্ঠতম মহামানব মুহাম্মদ (সা) যখন দুনিয়ায় এলেন তখন সমাজে চলছিল চরম অরাজকতা। সেই অন্ধকার সমাজে চলছিল অনাচারের মহা উৎসব। মানবতা তখন ছিল চরম অবহেলিত। সমাজে তখন কায়েম ছিল পশুদের রাজত্ব। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেদিন নেমে এসেছিল অবক্ষয়। সেই সমাজে মারামারি, কাটাকাটি লেগেই থাকত। তখন আরবের লোকেরা তাদের মেয়ে শিশুদের জীবন্ত কবর দিত। সমাজের কোথায়ও শান্তির লেশমাত্র ছিল না। মানুষের জান মালের ছিল না কোন নিরাপত্তা। মানুষ ছিল অধিকার হারা ও অসহায়। সবলরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে দ্বিধাবোধ করত না। মহিলারা তখন দাসদাসীর মত ব্যবহৃত হত। পুরো সমাজ ছিল অজ্ঞতা, বর্বরতা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। হেন কোন গর্হিত কাজ ছিল না, যা তখনকার লোকেরা করত না। কারো প্রতি কারোর দয়া-মায়া ও সহানুভূতির লেশ মাত্র ছিল না। তাই ইতিহাসে এ যুগকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। অথচ মহানবী (সা)এর আগমনে সমগ্র আরব থেকে সব তমসার কালো দূরীভূত হল। তাঁর আনীত ঐশী দীনের পরশ পেয়ে মানবতা খুঁজে পেল চলার দিশা। সমাজের যাবতীয় অনাচার, অসংগতি ও অশান্তি মহানবীর (সা) আদর্শের ছোঁয়ায় বিদূরিত হল। আল্লাহর রহমত, বরকত ও করুণায় গোটা সমাজ ভরে উঠল সুখের অমীয়ধারায়। মানুষের জীবনে বর্ষিত হল শান্তি, নিরাপত্তার হিমেল হাওয়া। মহানবী (সা) সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দিলেন শান্তির সৌরভ। প্রতিটি মানুষের জীবনে তিনি এনে দিলেন মুক্তির সওগাত। আজও এই অশান্ত সমাজে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের নবীজির আদর্শে জীবনকে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। মহানবী (সা) যে উত্তম চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে মানুষকে রহমতের ধারায় সিক্ত করেছিলেন আমরা আজও তাঁর সেই সুষমাকে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সুন্দর জীবন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে তিনি তার মাধ্যমে লোকদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারেন। মহানবী (সা) সম্পর্কে তাই আল্লাহ্ নিজেই বলেন, 'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর কায়েম রয়েছেন।' (সূরা কালাম : আয়াত ৪) নবীজিও তাঁর প্রতি আল্লাহর এই রহমতের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। নিজের উপর তাঁর প্রভুর করুনার কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'চরিত্রের সৎ গুণসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।' (আল হাদীস)

মহানবী (সা) তাঁর উত্তম চরিত্র দিয়ে মানুষ ও তখনকার সমাজকে বিকশিত করার যে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেন তাঁর জন্য তিনি আল্লাহর দেয়া মূলনীতি অনুসরণ করতেন। আল্লাহর দেয়া এইসব নীতির বাস্তবায়নের ফলেই সেদিনের জাহেল বা অন্ধকার সমাজ শান্তি ও স্থিতির এক অনুপম সুন্দর সমাজে পরিণত হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি সমাজের মানুষের উন্নতি এবং শান্তির জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে মানবিক সংস্থা গঠন করে ইতিহাসে এক বিস্ময়কর নজীর স্থাপন করেন। এই সংস্থার কর্মসূচী ছিল-১. সমাজের অশান্তি দূর করা। ২. মানুষের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা। ৩. গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করা। ৪. দুর্বলদের সবলদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা। নবুয়ত লাভের পর মানুষের জন্য শান্তি ও সুখের সমাজ কায়েমে নবীজি যে রূপরেখা বাস্তবায়ন করেছেন তার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল :

ন্যায়পরায়ণতা (আদল)

ন্যায়পরায়ণতা (Justice) ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য এটি বড় একটি মূলনীতি। তাই এ বিষয়টির প্রতি মহান আল্লাহ তায়লা পবিত্র কুরআনে পাকে অনেকবার নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়লা বলেন, 'আমি অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।' (সূরা হাদীদ : আয়াত ২৫) কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্য দান কর।' (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৫) তিনি আরো বলেন, 'যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়।' (সূরা আন'আম : আয়াত ১৫২) এভাবে আল্লাহ তায়লা মানুষের জীবনবিধান কুরআনের অনেক জায়গায় সুবিচার, ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ কায়েম করে সমাজকে সুন্দর ও সুশৃংখল রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী সমগ্র মানবতার আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন করে গেছেন। আরবের তৎকালীন সমাজে ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচারের লেশমাত্র ছিল না। গোটা সমাজ জুলুম , অত্যাচার ও নির্যাতনে বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল। দুর্বিহ হয়ে উঠেছিল মরুর আকাশ-বাতাস। শোষকের শোষণের তান্ডবে ঢেকে গিয়েছিল মানবতা। মহানবী (সা) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে মানুষে মানুষে তারতম্য তিরোহিত হয়েছিল। ন্যায়নীতির কারণে সমাজে কারো প্রতি কারো কোন অভিযোগ ছিল না। ফলে সমাজ জীবন হয়ে উঠেছিল শান্তিময় ও নিরাপত্তামূলক। আজ অধিকাংশ মানুষ, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে এই মহান গুণটির বড় অভাব। ফলে সর্বত্রই এখন চলছে চরম বৈষম্য, হানাহানিসহ অন্তহীন অস্থিরতা।

www.pathagar.com

সাম্য ও মৈত্রীর (Equality) মূলনীতি

এর মানে হল সব মানুষের মর্যাদা সমান। জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সবার অধিকার সমান এবং আইনের চোখে সবাই ন্যায়বিচার পাবার অধিকারী। ইসলাম-পূর্ব আরবে এই অধিকারটি ছিল ভূলুণ্ঠিত। সমাজের প্রভাবশালী ও নেতাদের ছাড়া সাধারণ মানুষের কোন মর্যাদাই ছিল না। গরীব, অসহায় ও দাসদাসী বা শ্রমিকের কোন মর্যাদা দেয়া হত না আরবের সেই সমাজে। আজকের বিশ্ব এবং আমাদের চার পাশের সমাজের দিকে তাকালে আমরা সেই বর্বরোচিত চিত্রই লক্ষ্য করি। সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং অর্থ ও সামর্থের মালিক, সবল ও সংগতিপূর্ণ, তারা ছাড়া সহায়হীন, অভাবী ও দুর্বলদের আজকাল কোন মূল্যই নেই। তারা না পায় সামাজিক মর্যাদা, না পায় বিচার। তারা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার থেকেও চরমভাবে অবহেলিত। ফলে সেই আরবের মত আজও প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমরা লক্ষ্য করি ধনী-দরিদ্রের মধ্যে লড়াই। যাদের আছে আর যাদের নেই- এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম আজকের বিশ্বের একটি করুণ চিত্র। অসাম্য, ভেদাভেদ এবং শ্রেণী ভেদের বিষবাষ্পে আমাদের আজকের দুনিয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে সর্বত্রই আজ বিরাজ করছে বিরোধ ও অস্থিরতা। অথচ এই মানবতাবিরোধী অসাম্য দূর করে মহানবী (সা) গড়ে তুলেছিলেন সাম্যের এক জান্নাতী সমাজ। তিনি উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, উঁচু-নীচু- এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হানলেন। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি সমান মর্যাদা ও ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করলেন। মহানবী (সা) আল্লাহর দেয়া নির্দেশনার আলোকে গড়ে তুললেন সাম্যের রাজ। মানুষের এই সমান মর্যাদা, সাম্য এবং সমান অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ তায়লা নিজেই পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করলেন, 'হে মানুষ! আমরা তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।' (সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩) আল্লাহর এই সমানাধিকারের বাণীর আলোকে মহানবী (সা) মানুষের ভেদাভেদ, বংশ মর্যাদার অহংকার ও অসাম্যের প্রাচীর ধসিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন সাম্যের সুমহান নীতি। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) সবাইকে এক আদমের সন্তান এবং কারো উপর কারো কোন বড়ত্ব নেই বলে অসাম্য ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক মূলনীতি ঘোষণা করলেন, তা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। তিনি বললেন, 'হে মানুষ! তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব বংশের কোন শ্রেষ্টত্ব নেই। অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর নিকট অধিকতর মর্যাদাবান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে অধিকতর ভয় করে।' (আহমদ) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যদি মর্যদার কোন তারতম্য থাকে তা হল শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করার তারতম্যের কারণেই

www.pathagar.com

হতে পারে। আর সব ব্যাপারে মানুষ সমান। সবার অধিকারও সমান। এ ব্যাপারে রাসূলের আরো একটি বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সাদা-কালো, ধনী-গরীব, প্রভূ-ভৃত্য, শাসক-শাসিত, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।' সাম্যের এই মূলনীতিকে মেনে চলতে পারলে সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের কোন লড়াই থাকে না এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ উঠে গিয়ে সমাজ হতে পারে সুশৃংখল ও স্থিতিময়।

নিরাপত্তার গ্যারান্টি

পরিবার, সমাজে ও রাষ্ট্রের শান্তি , স্থিতি ও শৃংখলা বজায় রাখার অন্যতম মূলনীতি হল মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এই গ্যারান্টির অভাবে সমাজ খুন-খারাবী, হানাহানি ও রাহাজানিতে ভরে ওঠে, ফলে নষ্ট হয় সামাজিক স্থিতিশীলতা। তখন আরবের সমাজে ন্যূনতম নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না। মানুষ মানুষকে হত্যায় তখন সামান্যতম কুণ্ঠিত হতো না। আজকের দুনিয়ায়ও আমরা এই একই চিত্র খুঁজে পাই। স্বার্থের কারণে এবং শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে আজ একজন মানুষ আর একজনকে মারতে, একটি সমাজ অন্য একটি দুর্বল সমাজকে পদানত করতে এবং একটি সবল রাষ্ট্র অন্য একটি দুর্বল রাষ্ট্রের অগণিত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। ফলে দুনিয়ার সর্বত্রই এখন দেখা যায় রক্তের স্রোতধারা। মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে তাই মহানবী (সা) বললেন, ' নরহত্যা হারাম। কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করল। আর কেউ কাউকে বাঁচালে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই বাঁচাল।' (আল হাদীস) মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম ইজ্জতের নিরাপত্তার কথা বলতে গিয়ে মহানবী (সা) বললেন, 'ইসলামের কল্যাণে এমন একদিন আসবে যখন একজন পর্দানশীন মহিলা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে হিরা (শহর) থেকে হাযরামাউত (নগর) পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে পারবে।'

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা

মহানবী (সা) সমাজকে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং মানুষের থাকা, খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যকার অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্য যে অর্থনৈতিক সুবিচারের মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল অভূতপূর্ব। আজও মহানবীর (সা) এই ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার বিকল্প প্রণীত হয়নি। মানুষ নিজেদের মত করে নানা অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু তাতে সমাজের কোন সুষম উন্নয়ন তাতে আসেনি। মানুষের গড়া সর্বশেষ অর্থনৈতিক থিওরি দু'টি হল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। এ দু'টি ব্যবস্থাই চরমভাবে মার খেয়েছে। এগুলো সমাজে যে বিশৃংখলা ও অসমতার জন্ম দিয়েছে তার অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে। মানুষের গড়া এই অর্থ ব্যবস্থা মানুষে মানুষে যে অনৈতিকতা, চরম বৈষম্য, ভেদাভেদ

www.pathagar.com

ও ঘৃণা-হিংসার জন্ম দিয়েছে তার কদর্যতা থেকে বেরিয়ে আসা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। মহানবী (সা) মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য এক ঐশী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রচলন করে সমাজকে স্থিতিশীল রাখার অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেন। মহানবী (সা) প্রণীত ইসলামের এই ব্যবস্থা ছিল সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ। মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নীতি ছিল ছয়টি। যথা:-১.যাকাত ২. সাদাকাহ ৩. গনীমত ৪. জিজিয়া কর ৫. খারাজ ৬. ফায়। ধনীদের উপর গরীব ও অসহায় মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে যাকাতকে ফরয করার মাধ্যমে। তারপরও ইসলামে সাদাকাকে উৎসাহিত করে সমাজে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ইসলাম এমনভাবে বাস্তবায়ন করার তাগিদ দিয়েছে যাতে সমাজে মানুষের জীবন প্রণালীতে ভারসাম্য তৈরী হয়। শ্রমিকরা যাতে বঞ্চনার শিকার না হয় তার জন্য ইসলাম কঠোর নীতি ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) ঘোষণা করেছেন,' শ্রমিকরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। তোমরা যা খাবে তা তাদের খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তা তাদের পরতে দেবে। আর তাদের পক্ষে যে কাজ করা কষ্টকর হবে তা তাদের করতে বাধ্য করবে না।' রাসূল (সা) আরো বলেছেন, 'শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু। তার পারিশ্রমিক ঘাম শুকাবার আগে পরিশোধ করে দাও। মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ কর না।' এভাবে ইসলাম মানুষের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করেছেন এবং বৈষম্য দূর করে সমাজকে স্থিতিশীল করেছেন।

নারীদের অধিকার নিশ্চিত

মহানবী (সা)এর আগমনের আগে আরবের সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যতিত। তখন মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। মহিলাদের সাথে দাসীদের মত আচরণ করা হত। তা ছাড়াও পরিবার ও সমাজের কোন কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা ছিল না। ধন-সম্পদে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের কোন অধিকারই মেনে নেয়া হত না। মহানবী (সা) নারীদের এই দুর্বিহ বঞ্চনা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করলেন। নারীদের মর্যাদা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আমি বিনষ্ট করি না কোন পরিশ্রমকারীর কর্ম তা সে হোক পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা একে অপরের অংশ।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫) কুরআনে পাকে আরো ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।' (সূরা নিসা : আয়াত : ১২৪) ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীকে যেখানে 'শয়তানের অংগ' বলে মনে করা হত, ইসলামের নবী (সা) নারীদের সম্মান বাড়ানোর জন্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাংগিনী। স্ত্রী হচ্ছে

www.pathagar.com

তার গৃহের সম্রাজ্ঞী।' নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে মহানবী (সা) যেসব ঘোষণা দিয়েছেন তার মানব ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ইসলামের নবী (সা) দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করলেন, 'বিশ্বে বহু অমূল্য সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল ধর্মপরায়ণা স্ত্রী।' 'তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ তারা যারা নিজ স্ত্রীর দৃষ্টিতে উত্তম বলে গণ্য।' নবী (সা) আরো বলেছেন, 'যে মুসলমান তার স্ত্রীর সাথে যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।' এভাবে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে নবী(সা) পরিবার ও সমাজের মানুষের মধ্যে সুখ ও শান্তির পরিবেশ তৈরীতে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী সমাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন। কোন একটি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য ও নির্দেশনা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ঘোষণা করেছেন, 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজরাত : আয়াত-১০) নবী (সা) করীম (সা) বলেছেন, 'তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর একে অপরকে ভালবাসবে।' তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন, 'যারা আমার জন্য পরস্পর একে অপরকে ভালবাসবে তাদের জন্য অনেক আলোকস্তম্ভ রয়েছে, যা দেখে নবী-রাসূলরাও তা লাভের আশা পোষণ করবে।' অন্য এক হাদীসে নবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন 'আমার ভালবাসা সেসব লোকদের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, যারা পরস্পর একে অপরকে আমার জন্যই ভালবাসে।' এই ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার মাধ্যমেই মহানবী (সা) একটি সোনালী সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

সর্বোপরি মদীনা সনদের মাধ্যমে ইসলামের নবী (সা) যে সার্বজনীন মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি একটি স্বপ্নিল আদর্শ সমাজ কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সমাজ ছিল সুখ, শান্তি ও স্থিতিশীলতায় পরিপূর্ণ। এই অনন্য সমাজের নমুনা এর আগে পৃথিবী অবলোকন করেনি। তিনি অশান্তি, হানাহানি, বিভেদ, ফাসাদ ও সংঘাতে জর্জরিত একটি পশু সমাজকে ইসলামের অসাধারণ আদর্শের ভিত্তিতে সুখময় করে তুলতে সক্ষম হন। আজকের সংঘাতমুখর পৃথিবী, অশান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা, নৈরাজ্যকর সমাজ ও কলহপূর্ণ পরিবারে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে মহানবী (সা)এর নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সামনে এগুতে হবে। আর কোন আদর্শ মানায় দুনিয়ায় আগেও যেমন সুখি, সমৃদ্ধশালী, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ সমাজ বা রাষ্ট্র কায়েম সম্ভব হয়নি, তেমনি ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। তাই আমাদের বিভ্রান্ত মানবতাকে মহানবীর (সা) আদর্শের পথ অনুসরণ করা উচিত। এই আদর্শের কোন বিকল্প মানুষের সামনে আর খোলা নেই। ◆

www.pathagar.com

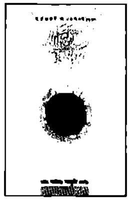

আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে মহানবী (সা)

অধ্যাপক তাসনীম আলম

দুনিয়ায় যে কোন সমাজ বিপ্লব কিংবা কোন আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে যোগ্য নেতৃত্বের উপর। মহানবী (সা) অল্প সময়ের মধ্যে জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে একটি সফল ইসলামী বিপ্লব করেছিলেন। তাঁর সাফল্যের পিছনে ছিলো আল্লাহ্র রহমাত, নবী করীম (সা)এর অসাধারণ নেতৃত্ব এবং তাঁরই সাহচর্যে সৃষ্ট একদল যোগ্য নেতৃত্বের প্রাণপণ প্রচেষ্টা। নবী করীম (সা) কাফেরদের পরাজিত করে মদীনার বুকে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি সেই রাষ্ট্র বেশীদিন শাসন করার সুযোগ পাননি। মাত্র দশ বছর শাসন করেছিলেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ছিল এটি একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাষ্ট্র। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি যোগ্য সাহাবীদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তা ছিল বিস্ময়কর। প্রায় অর্ধেক দুনিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় এসেছিল। কিন্তু এ বিপ্লব কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না। এটা ছিল একটি স্বাভাবিক বিপ্লব। ঘটনার ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে খুব সহজে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাক ফেরেশতা নাজিল করে এ বিপ্লব সম্পন্ন করেননি। বরং সমাজের ভিতর থেকে এ বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত নেতা ও কর্মী বের করা হয়েছে। সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে ধাপে ধাপে এ আন্দোলন এগিয়েছে। স্বয়ং আল্লাহর নবীকে এমন বিপদাপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে যা দুনিয়ার কোন আন্দোলনের কোন নেতাকেই এমন কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়নি। আজকের যুগেও ইসলামী বিপ্লব সফল করতে হবে। দানবীয় শক্তির কবল থেকে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য এর বিকল্প নেই। আর এজন্য নবী করীম (সা)এর অনুসৃত পদ্ধতিতেই এমন একদল যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে যারা সমসাময়িক দুনিয়ায় সফল নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করবেন। আর এ ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনের যিনি প্রধান নেতা হবেন তাকেই এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারই সরাসরি তত্ত্বাবধান এবং

www.pathagar.com

নিবিড় সাহচর্যে এমন একদল যোগ্য নেতা তৈরি করতে হবে। যারা ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরে সঠিক ও সময়োপযোগী নেতৃত্ব প্রদান করবেন। আর এ নেতৃত্বের ফলেই ইসলামী সমাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

নেতৃত্ব শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'লিডারশীপ'। সমাজবিজ্ঞানীগণ নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সকল সংজ্ঞার মধ্যে যে কথাটি সাধারণভাবে ফুটে উঠেছে তাহলো– 'নেতা তিনিই যিনি অন্যকে প্রভাবিত করতে পারেন। যিনি অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হবেন। যিনি সাহসী, পরিশ্রমী, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী, পরিস্থিতি মুকাবিলায় পারঙ্গম, ধৈর্যশীল, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনিই নেতা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা এ গুণাবলী জন্মগত। সবার মধ্যে এ ধরনের গুণের সমাবেশ দেখা যায় না। কিন্তু পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকে এও বলেছেন যে, কারো মধ্যে জন্মসূত্রে এ ধরনের গুণাবলী কম থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রচেষ্টা চালানো যায় তাহলে তা আরো বিকশিত হতে পারে। অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত মানের নেতৃত্ব তৈরীর জন্য মূল নেতৃত্বের সাহচর্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থাকতে হবে। তাহলেই সমাজের একেবারে নিম্ন পর্যায় থেকে উঠে আসা ব্যক্তির মধ্যেও পর্যায়ক্রমে যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি হবে। ইসলামী বিপ্লবের সফলতার জন্য সমাজ বিজ্ঞানীগণ বর্ণিত উক্ত গুণাবলী ছাড়াও ইসলামী গুণেরও সমাবেশ থাকতে হবে নেতৃত্বের মধ্যে। মুহাম্মাদ (সা)এর আন্দোলনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন একদল যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য। নবুয়ত প্রাপ্তির পর ১৩ বছর তিনি মক্কায় ছিলেন। অল্পসংখ্যক লোকই এ দাওয়াত কবুল করেছিলেন। আর যারাই দাওয়াত কবুল করেছিলেন তারা তদানীন্তন সমাজে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যোগ্য লোক ছিলেন। এদেরকে তিনি সাহচর্য দিতেন। তাঁর সাথীরাও সবসময় তাঁকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করতেন। নবী করীম (সা)এর সাথে তাঁর সাথীদের যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাই ছিল ইসলামী আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি– যা কুরআনে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে : "আল্লাহ্ তাদেরকেই পছন্দ করেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধভাবে তাঁরই পথে লড়াই করে।" যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য নবী করীম (সা) যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন নিম্নে তা আলোচিত হলো :

এক. সমাজের যোগ্য লোকদের দাওয়াত প্রদান : নবী করীম (সা) নবুয়ত লাভের পর থেকে তদানীন্তন মক্কার লোকদের নিকট দীনের সুমহান দাওয়াত তুলে ধরেছিলেন। কিছুদিন গোপনে গোপনে দাওয়াতী কাজ করার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। মক্কার সকল লোকদের নিকটই তিনি দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন তবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক

www.pathagar.com

করানোর জন্য তাঁর পেরেশানী ছিল সীমাহীন। আবু জেহেল এবং উমরের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ছিল প্রবল। তারাই কাফেরদেরকে সংগঠিত করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধার সৃষ্টি করছিলেন। এক পর্যায়ে নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেছিলেন এই বলে, 'হে আল্লাহ্! আবু জেহেল এবং উমরের মধ্যে যে কোন একজনকে আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও।' এ থেকে বুঝা যায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক করানোর জন্য তিনি কত পেরেশান ছিলেন। এছাড়া এ সময় যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তারা তদানীন্তন জাহেলী সমাজে ভালো ও যোগ্য লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত যায়িদ (রা), (মুক্ত করা কৃতদাস) যোবায়ের (রা), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা), হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) প্রমুখ। তাঁর সবচাইতে যোগ্য সাথী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। নবুয়তের পূর্বেই নবী করীম (সা)এর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরত আবু বকরের (রা) বাড়িতে মজলিশ বসতো। সেখানে নানা কথাবার্তা হতো। নবুয়ত লাভের পর নবী করীম (সা) হযরত আবু বকর (রা)এর নিকট দাওয়াত দেবার সাথে সাথে তিনি তা কবুল করেন এবং তারই চেষ্টায় হযরত উসমান (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) প্রমুখ ইসলাম কবুল করেন।

দুই : যুব সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মক্কার সকল লোকের নিকটই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য শক্তি যুবকদের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী। তাই দেখা যায় নবী করীম (সা)এর সাহাবীদের অধিকাংশেরই বয়স ৩০-এর নিচে ছিল। যৌবনের অদম্য শক্তি তারা কাজে লাগিয়েছিলেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে।

তিন : কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি : নবী করীম (সা)এর কাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াত পাঠ করে শোনান, তাঁদের জীবন পরিশুদ্ধ করেন এবং তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন' (সূরা জুম'আ-২)। নবী করীম (সা) তাঁর সাথীদেরকে কুরআন শিখাতেন ও সেই অনুযায়ী আমল করার তাকিদ দিতেন। তাদের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন এবং হিকমাত শিক্ষা দিতেন। তাঁর এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এতই কার্যকর ছিল যে, এর মাধ্যমে যে নেতৃত্ব তৈরি হয়েছিল তারা পরবর্তীতে নবী করীম (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও এর বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের প্রায় সকলেই ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছেন। ইসলামের

www.pathagar.com

প্রাথমিক যুগে তিনি গোপনে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাযযামীর ঘরে সাহাবীদের ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাযযামীর ঘর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এখানে কাফেররা আসতো না।

চার : সাথীদের প্রতি সহানুভূতিশীল : নবী করীম (সা) সাথীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়সম্পন্ন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কোন ক্ষতি দেখলে পেরেশান হয়ে পড়তেন। সূরা আত-তওবায় এ চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে এভাবে- 'দেখ, তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল (সা) এসেছেন, তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর জন্য খুবই কষ্টদায়ক। তোমাদের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড় সংবেদনশীল ও দয়ালু' (আত তওবা-১২৮)। নবুয়তের প্রাথমিক যুগে হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), ইবনে আরত (রা)সহ বেশ কয়েকজন ক্রীতদাস ইসলাম কবুল করেন। তাদের ঈমান গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদের মনিবগণ তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার শুরু করেন। তাদের উপর এ নির্যাতন মহানবী (সা)কে দারুণভাবে পীড়িত করে। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সা)এর পেরেশানী দেখে হযরত আবু বকর (রা) নিজ অর্থ ব্যয়ে এদেরকে ক্রয় করে আজাদ করে দেন।

মহানবী (সা)এর দাওয়াত যত সম্প্রসারিত হতে থাকে ততই কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল কোন লোক ইসলাম কবুল করলে তার উপর সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন চালানো হতো যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। নবী করীম (সা) এ সকল নির্যাতিত মুসলমানদের হেফাজত করার জন্য নতুন কাউকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করতে নিষেধ করেন। নবুয়তের চতুর্থ বছরে যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় তখন নবী করীম (সা) এ অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিযরতের পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শে প্রথম দলে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৪ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা হিজরত করেন।

নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে নবী করীম (সা) মুসলমানদের হিজরত করে মদীনায় চলে যাবার নির্দেশ দেন। প্রায় অধিকাংশ মুসলমান হিজরত করার পর তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজে হিজরত করেন। নিজে সাথীদেরকে নিরাপদে পাঠানোর পরই তিনি মদীনায় রওয়ানা হন। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মুসলমানরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাদের না ছিল মাথা গোজার ঠাঁই, আর না ছিল খাবারের ব্যবস্থা। মহানবী (সা)এ সমস্যার সমাধানের জন্য এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি আনসার ও মক্কার মুহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এতই সুদৃঢ়

www.pathagar.com

ছিল যে, এক আনসার সাহাবী অন্য মোহাজের সাহাবীর জন্য তার বাড়ি ঘর ও সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেয়। মোটকথা নবী করীম (সা) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রতি এতই দয়ালু ও স্নেহসিক্ত ছিলেন যে, তিনি সব সময় তাদের কল্যাণ চিন্তা করতেন এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিতেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সাহাবায়ে কিরাম নবী করীমকে (সা) আন্তরিকভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং সব সময় তাঁর সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করতেন।

পাঁচ : যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ প্রদান : নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কেরামের যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিতেন। সাহাবায়ে কিরামের প্রতি নবী করীম (সা) এমন ইনসাফপূর্ণ ও সুন্দর আচরণ করতেন যে, প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তিনি তাঁকেই বেশী ভালোবাসেন। সাহাবায়ে কিরামের সকলের যোগ্যতাই তিনি সফলভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা)এর মতো অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিভা যেমন তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করেছেন, তেমনি হাবসী ক্রীতদাস হযরত বেলালের (রা) যোগ্যতাও তিনি কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী সাহাবায়ে কিরামের সকলকেই তিনি দীন প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের অধীনে সবাই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোত্তম ভূমিকা রেখেছেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতো যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিপ্লবী লোকের জমায়েত হয়েছে যা আর কোন আন্দোলনে দেখা যায় না।

ছয় : সাহসী ভূমিকা : নবী করীম (সা) ছিলেন অসীম সাহসী। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকেও সাহসী করে গড়ে তুলেছিলেন। অনেকগুলো যুদ্ধে তিনি নিজে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন হঠাৎ আক্রমণের মুখে ঘাবড়িয়ে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তখন নবী করীম (সা) অসীম সাহসিকতার সাথে নিজ স্থানে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম বীরদেরকে একত্রিত করার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। তাঁর আহ্বানে জানবাজ সাহাবীগণ তাঁর পার্শ্বে রক্ষাব্যূহ রচনা করলেন। মদীনায় অবস্থানকালে একবার হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চয় হলো কাফেরদের আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায়। নবী করীম (সা) ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় চক্কর দিয়ে আসলেন। ফলে সকলের মধ্যে আবার সাহস ফিরে আসলো।

সাত : উত্তম আচরণ : নবী করীম (সা) ছিলেন উত্তম আচরণের প্রতীক। সাহাবীদেরকেও তিনি সেইভাবে গড়ে তুলেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে 'হে নবী! এটা আল্লাহ্তায়ালার বড় মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্য খুবই নরম দিলের পরিচয়

www.pathagar.com

দিতে পারছেন। এটা না হয়ে যদি আপনি কড়া মেজাজের মানুষ হতেন আর আপনার দিল পাষাণ হতো তাহলে এরা সব আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেত। অতএব তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দিন, আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে দোয়া করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথেও পরামর্শ করুন (আল ইমরান-২৫৯)। নবী করীম (সা)এর ব্যবহার কুরআনের অনুরূপই ছিল। তিনি এতই কোমল হৃদয় ও মিষ্টভাষী ছিলেন যে, সহজেই লোকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। নবী করীম (সা)এর কাছাকাছি যে যত বেশী আসার সুযোগ পেতো সে ততো বেশী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। ফলে নবী করীম (সা)এর পক্ষ থেকে যে কোন কাজের ইঙ্গিত পেলেই সাহাবায়ে কিরাম তা সম্পন্ন করে ফেলতেন। নবী করীম (সা)এর সাহাবীদের চরিত্রও এ রকমই ছিল। বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আট : নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের প্রতি নবী করীম (সা)এর ঘনিষ্ঠতা : নবী করীম (সা) দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তিনি ভালো করেই বুঝতেন, কার মধ্যে কি ধরনের যোগ্যতা আছে এবং সে যোগ্যতা কিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাই নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের কয়েকজনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এতো বেশী ছিল যে, তিনি তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা)এর কন্যা হযরত আয়িশা (রা), হযরত উমর (রা)এর কন্যা হযরত হাফসা (রা)কে তিনি বিয়ে করেছিলেন। নিজের কন্যা হযরত কুলসুমকে হযরত উসমান (রা)এর সাথে এবং হযরত ফাতিমাকে (রা) হযরত আলী (রা)এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবী করীম (সা)এর সাথে এ সকল মহান সাহাবীদের গভীর সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

নয় : সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাথীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা)কে ওহীর মাধ্যমে পথ নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া তিনি পয়গম্বর হবার কারণে তাঁর সীনা ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারো পরামর্শ নেয়া তাঁর জন্য মোটেই জরুরি ছিল না। কিন্তু এরপরও দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ডাকতেন এবং পরামর্শ করতেন। সরাসরি ওহীর নির্দেশ না থাকলে সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শকে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। প্রয়োজনে নিজের মতের কুরবানী করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যেমন ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম (সা) মদীনায় অবস্থান করেই কাফিরদের মুকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন তরুণ সাহাবীর জজবার কারণে মদীনার উপকণ্ঠে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করেন। তরুণ সাহাবীরা নিজেদের

www.pathagar.com

ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তীতে নবী করীম (সা)এর নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁর চিন্তাই বহাল রাখার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন অর্থাৎ উহুদ প্রান্তরেই কাফেরদের মুকাবিলার প্রস্তুতি চলতে থাকে। বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং একজন সফল বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও তিনি ভালো করেই বুঝতেন যে, সঙ্গীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীক করলে একদিকে যেমন তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা বাড়বে অন্যদিকে সিদ্ধান্তে শরীক থাকার কারণে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা বেশী সক্রিয় হবে। আজ থেকে প্রায় ১৪শত বছর পূর্বে নবী করীম (সা) এর উপলব্ধি থেকে বর্তমানের ইসলামী আন্দোলনকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

দানবীয় শক্তির কাছে পরাজিত বর্তমান মানব সভ্যতা। দুনিয়াব্যাপী হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশ্ব মানবতাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা এ শান্তিময় পৃথিবী অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিশ্ব মানবতার এ আহাজারীতে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর সেই শাশ্বত বাণী শুনে জেগে উঠতে হবে। আল্লাহর আহ্বান দুনিয়ার সকল মুসলমানের জন্য : 'তোমাদের কি হয়েছে তোমরা সংগ্রাম করছো না সব দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য, যারা আমার নিকট ফরিয়াদ করছে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এ অত্যাচারীদের অধিবাস থেকে বের করে নাও। আমাদের জন্য অভিভাবক পাঠাও, সাহায্যকারী পাঠাও।'

নির্যাতীত ও নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের উত্থান আজ সময়ের দাবি। এ দাবি অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্ব। আর সেই নেতৃত্ব তৈরীর জন্য ইসলামী আন্দোলনকে নবী করীম (সা) অনুসৃত পদ্ধতিই অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের নেতৃত্ব যত বেশী তৈরি হবে মুসলিম উম্মাহর সঙ্কট ততই কেটে যেতে থাকবে। ইসলামী জনতা এবং নিপীড়িত মানবতা এ নেতৃত্বের অধীনেই একত্রিত হতে থাকবে। আল্লাহর রহমতকে সম্বল করে এগিয়ে যেতে থাকবে এ কাফেলা। সকল বাধা অতিক্রম করে তারা মনজিলে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর ইসলামের সোনালী সূর্যের আভায় গোটা পৃথিবী তখন ঝলমল করে উঠবে। ◆

www.pathagar.com

অপভাষ্যের কব্জা থেকে ॥ আবদুল মুকীত চৌধুরী

এই মা আর বোনের যারা স্বজনহারা – পাশে দাঁড়াই
এই বাবা আর ভায়েরা যারা স্বজন হারা – বাহু বাড়াই
আমরা যারা বেশ দূরত্বে মুসলমান
এবং যারা মানবধিকার উচ্চারণে অজ্ঞান।

আপনারা যারা ক্ষমতার মোহে দেশে দেশে পাইক বরযন্দাজ
আগ্রাসনের তুষ্টি বিধানে মীরজাফরকে দিলেন লাজ;
আপনারা যারা নারকীয় সব 'ছবি' না দেখেই কেটে পড়েন
জান্নাতে কোন স্বভ্রসৌধ তসবী-নফলে শুধু গড়েন।
আপনারা যারা অশেষ সওয়াব হাসিলে গলদ ঘর্ম হন
বলুন সত্য, বাসূলুল্লাহ এ বিপর্যয়ের কী কথা কন?
রাসূল- প্রেমের প্রদর্শনীতে কে আগলো বেশী, কম কে কার?
উম্মাহ, 'এতিম' মার খেয়ে শেষ– আশিকে রাসূল নির্বিকার!
সুন্না' নব্বী, উসওয়া এমন কর্মকাণ্ডে মুখ লুকায়
বৈবাগ্যের এই ডামাডোলে নবীর শীরাত লজ্জা পায়।
আপনারা যারা ঘরে ঘরে যান পৌঁছে দেন দীন ইসলাম
পাশ কাটিয়ে জিহাদী জীবন; বাহাদুরী নেন, আল্লা' নাম
জারী রেখেছেন এবং নফলে গোটা সৃষ্টিই কয়েম জয়–
নৃশংসতার সক্ষী এ 'ছবি' বলুন তো দেখি কী বাণী বয়?
নবী-রাসূল আর ওলী-আল্লাহর বাগানে এখন পঙ্গপাল
পরাধীনতার বিভীষিকা করে ছিন্নভিন্ন স্বপ্নজাল।
অথচ সুন্নাহ স্বকীয় ভাষ্যে নির্জীবতায় প্রেরণা বয়
যে যার বৃত্তে এই মতপথ এই তপজপ ধর্ম হয়?

এবার আগুন কাবা ছোঁয় ছোঁয়, রওযা পাকের ও নেই রেহাই
ঈমানী জযবা কোন সংজ্ঞার অতলে নিয়েছে বলুন ঠাঁই?
বুঝে বা না আস্কারা দিয়ে তুঙ্গে তুলেছে আগ্রাসন
এই কপটতা এই অজ্ঞতা আর কত দেবে সে ইন্ধন?
মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, শানে রিসালত আজ মুখর
অপতাষ্যের কজা থেকে কে মুক্ত করবে নবীর ঘর?

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ (সা) ॥ নয়ন আহমেদ

আল্লাহু আকবর! আমি তোমাদের মুহাম্মাদ, যাঁর পায়ের ধূলিও তোমরা চিনতে পারো;
তাঁর কণ্ঠস্বরও তোমাদের প্রতিবেশী– শুনে রাখো, আমি এক অসামান্য আলো পেয়েছি !
হে লোকসকল, আমার ভাই, কতো বিনিদ্র-রজনী কেটে গেছে কষযুক্ত ব্যর্থতার
কথা ভেবে !

আহ, মানুষ ! তার কবে উত্থান হবে !
পুরনো পোশাকের মতো খুলে ফেলবে ক্লীবত্ব, পাপ !
কৃষি-এলাকার সবুজ হবে তার গায়ের চাদর। আর মমত্বের শামিয়ানা টানাবে
পৃথিবী-ব্যাপী। দ্যাখো না, আল্লাহ কী সুন্দর সাজিয়েছেন আকাশ !
হ্যাঁ, আমি মানুষের অর্জনের কথা শুনাতে এসেছি। খেজুর-চাষিরা ভালো বীজ
ও ফলের তারিফ করতে জানে। মেষপালকেরও আছে গন্তব্য সম্পর্কে সামান্য ধারণা,
কারণ সে তৃণভূমি আর খামার বোঝে।
বলো, তুমি কতটুকু যাবে ?
এই নৈরাজ্যের টুটি চেপে ধরবে না ওহে চাষিরা ? এও তো একধরনের চাষ।
এই অথর্ব বেদনার মূল উপড়াবে না ? ওহে মেষপালকেরা, আবার জীবনকে–
দাবড়িয়ে নেবে না সবুজ-চত্বরে ?
বলো, মানুষ কি সবজির মতো পণ্য হতে পারে ! তবে ক্যানো আমরা আঁকড়ে ধরবো
খড়কুটোর মতো রসম-রেওয়াজ ? ক্যানো ?
কোথায় ভবিষ্যত ? সে কি গর্ত থেকে উঠবে না ?
ভাইসব, আমরা কি মৃতের কফিন বহন করবো তাহলে ? শব্দ করে উঠো, নিশ্চুপ
থেকো না !

ওহে মলিনমুখো মানুষেরা, হাহাকার এ্যাতো উচ্চকিত ক্যানো ? নিভিয়ে দাও !
আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যে বলি না। হেরাগুহায় আমি আলো পেয়েছি। আলো !
সব ফর্শা হয়ে যাবে। আনন্দের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে
তোলো। আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর !
ঈমানের নূরে উজ্জ্বল হবে মানুষ। তার ভবিষ্যত হবে।
এসো, একমাত্র আল্লাহরই জন্য আমরা সোজা পথ বানিয়ে লই। এর নাম-ই সত্য।

আমি কখনোই মিথ্যে বলি না।

www.pathagar.com

নাতে রাসূল ॥ ইব্রাহীম মন্ডল

ত্রিভুবনের সেরা তিনি
নাই কোন তাঁর তুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

নীল আকাশের চাঁদ সেতারা
পাহাড় নদী ঝর্ণাধারা
রাসূল প্রেমে পাগলপারা
তামাম সৃষ্টিকুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

সৃষ্টি থেকে ধ্বংসাবধি যত মানব কুল
সবার চেয়ে সুন্দর তিনি রাসূলে মাকবুল
তিনি ইমাম সবার নেতা
মানবতার মুক্তিদাতা
হৃদয়ে তাঁর আল্লাহ নামের ফুল
সে যে আমার মোহাম্মদ রাসূল।

দোয়েল কোয়েল পাপিয়া গায়
প্রজাপতি নেচে বেড়ায়
তাঁর উছিলায় সৃজন হলো তামাম সৃষ্টিকুল
সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তিনি মোহাম্মদ রাসূল।

দয়াল নবীর সৎ-সমাজ ॥ মাহফুজুর রহমান কচি

দয়াল নবী যে পথ দিয়ে
যেতেন পায়ে হেঁটে
গরীব-দুখী সবার খবর
নিতেন খুঁটে খুঁটে।

সাধ্যমত চেষ্টা করে
প্রয়োজনে গতর খেটে

www.pathagar.com

কিংবা কখন মুটে সেজে
কাজ সারতেন নিজে।

তাইতো সকল বিধবারা
এবং সকল এতিমেরা
যখন তখন ডাকতো তারা
কারণ ওরা সর্বহারা।

অত্যাচার আর হিংসা ভরা
তখনকার সেই আরবেরা
ইতিহাসে (কু)খ্যাত তারা
(বলে) "আইয়্যামে জাহেলিয়া।"

নামী-দামী জিনিস তারা
রাখতো জমা তাঁরই কোলে
গরীব-ধনী নির্বিশেষে
'বিশ্বাসী' তাঁয় জানতো সবে।

সেই সমাজকে গড়তে ভেঙে
নবী যখন বাড়লো আগে
আবু জেহেল লাহাব ওরা
আগুন হলো কঠিন রাগে।

চললো তবু নবীর মিশন
কু-সমাজের সংশোধন
রক্ত ঢেলে উপোস থেকে
সৎ সমাজের গোড়া পতন।
আমরা তাঁরই উম্মত হয়ে
অত্যাচার আর জুলুম দেখে
চুপটি মেরে বসে থেকে
নয়ন তুলি উর্ধ্বলোকে।

আমরা যদি গড়তে চাই
তাঁরই মত সৎ-সমাজ
জীবন বাজী রাখতে হবে
তুলতে হবে একই আওয়াজ।

www.pathagar.com

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ॥ হাশিম মিলন

বলতে পারো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ কে?
মেধা এবং আচরণে অতুলনীয় যে,
তার মত এত মহানুভব এত উদারচেতা
আসবে না কেউ এই ধরাধামে সবাই জানে যে তা।

ধন্য হয়েছে অনাথ শিশুরা যার স্নেহ পেয়ে পেয়ে
ভুখা অসহায় মানুষের তিনি খাইছেন না খেয়ে
আল আমীন বলে জানে যাকে আজও তাবৎ বিশ্ববাসী
রাগ ছিল না তাঁর কথাতে মুখে থাকতো সদা হাসি।

ন্যায়বান পিতা কখনো তিনি, কখনো শাসক, যোদ্ধা
জগতের তিনি সেরা বিবেচক সবচেয়ে বড় বোদ্ধা
আলোকোজ্জ্বল রেখেছেন সদা সত্য ন্যায়ের পথ
তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা, নূরবনী হযরত।

পরিচয়ে মোরা মুসলিম শুধু এটা বড়া নয় আজ
শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হয়েছি, সেটা গর্বের তাজ
হে প্রিয় রাসূল হে মোহাম্মদ খাতেমান নাবিয়্যিন
তোমার অনুসারী যেন হতে পারি মানতে পারি যেন এ দ্বীন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ॥ শফিকুর রহমান রুঞ্জু

কে তাশরীফ আনবেন তাই
এই দুনিয়া সাজলোরে
কার আগমন ঘটবেরে ভাই
মধুর গীতি বাজলোরে

কার জন্য সুস্বাগতম
ধুলির ধরা জাগলোরে
কে সে মহান যাঁর জন্য
খুশির দোলা লাগলোরে

www.pathagar.com

তাঁর আগমন প্রতিক্ষাতে
গুণছে প্রহর দিবস রাত
ধন্য হলো তাকেই পেয়ে
মানব জাতি মাখলুকাত

তাঁর জন্যই দরূদ পড়ি
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ
তাঁর সাফায়াত ভাগ্যে রেখো
কাল হাশরে ইয়া আল্লাহ্।

প্রতিদিন পেতে চাই ॥ ফজলুল হক তুহিন

প্রশস্তি তোমার ভেসে যায় উড়ন্ত মেঘের মতো,
ছুটন্ত নদীর মতো বয়ে যায় তোমার প্রশস্তি
আত্মার বাহির দিয়ে– অনিকেত দিগন্তে, সমুদ্রে।
রক্তের ধারায় তুমি কই? প্রতিদিন তুমি কই?

শতাব্দী প্রাচীন বটবৃক্ষ হয়ে পাপের জমিনে
মেলেছি শেকড় আমি– তোমার প্রশস্তি ঝড়ে ঝরে
পড়ে মরা কিছু পাতা– তবু মূলে লাগে না আচড়।
ভাঙন আনে না কোন পুণ্যের নদী– যে টেনে নেয় সমুদ্দুরে।

হায় কি অভাগা আমি– হাজার দুয়ারী যুগের প্রাসাদে
সহজে প্রবেশ অধিকার পেয়ে যাই। অথচ তোমার
নিরন্তর সূর্যময় পৃথিবীর মুখ পিরামিড অন্ধকারে
দেখি লজ্জায় লুকায়। পুঁথিতে, স্মৃতিতে তুমি কুয়াশা মানব।

আমার নিশ্বাস ধ্বনি, আমার রক্তের স্পন্দন তোমাকে পেতে চাই
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ– আত্মার পদ্মায়, সত্তার তৃষ্ণায়।

www.pathagar.com

সমুজ্জ্বল অন্ধকার থেকে ॥ আহ্মদ বাসির

আমাদের প্রবাহিত পদক্ষেপে প্লাবন আসুক
এই সমুজ্জ্বল অন্ধকারের ভেতর
কয়েকটি প্রক্ষালিত হাসির বিনিময়

সভ্যতার অন্দর মহলে বেগানা সময়
সাহসে একঝাঁক শোকার্তা কিচির মিচির
ঠিক এ মুহূর্তে
আমাদের প্রার্থনার
মাথার দিকে তাক করা বেশুমার খড়গ
পায়ের দিকে লাল
টালমাটাল নজর
ভয়োত্তাপে বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ড
বড় বেকায়দা ঠেকেছে
ক্ষয়ে যাওয়া ঈমানের লেজ ধরে ঝুলে
দেখুন, কি বেখাপ্পা দৃশ্য নির্মাণ

প্রিয়তম মুহাম্মাদ
আপনার প্রতি দরুদের দরিয়া
শুধু আপনারই কল্যাণে বারবার
আমাদের অক্ষমতা পায় ক্ষমা উপহার

আজ, প্রবাহিত পদক্ষেপগুলি প্লাবন আনুক
এই সমুজ্জ্বল অন্ধকারের ভেতর
কয়েকটি প্রক্ষালিত হাসির বিনিময়–
বৃষ্টির মহিমার মত আল্লার রহমত।

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মদ (সা) ॥ সৈয়দ সাইফুল্লাহ্ শিহাব

অন্ধকার কেটে গেলো আচমকা স্বয়ং
বৃষ্টির সতেজ বায়ু বাতাসে লক্‌লক্
করে, দিগন্তে পাখা মেলেছে বরঙ
স্বপ্নের সোনালী নীড়ে ধবধবে এক বক।

চারিদিকে বেজে ওঠে ডানার আওয়াজ
পালকে উত্তাল ভাঙ্গে পাথর ব্যারাম
শান্তির বর্ণিল স্রোত সে কে রোখে আজ ?
ডানার বাতাসে ঝরে বিনম্র আরাম।

জ্যোতির উত্তাপে পুড়ে ছারখার পাপী'রা
মৃত্যুদূত টেনে নেয় তারে সর্বশেষ
দরোজায় পড়ে থাকে বিশ্বাসের হীরা
এতো তাঁরই উপহার– দয়ার অশেষ।

হৃদয়ের মণিকোঠা নবী মুহাম্মদ
নদী হয় তাঁর নামে প্রাণের দরদ।

আলোকের নবুয়ত ॥ আফসার নিজাম

মিনারের মতো
একা
দাঁড়িয়ে রয়েছি
দিগন্তে ;
দূরে বহু দূরে ডিম জোছনায়
স্বপ্নপুরে আলোকের
নবুয়াত–
হেরার যুবক কাঁপছে নবীত্বের নূরে!

বেহেস্তের মতো
শাদা

www.pathagar.com

বাণীর প্রত্যাশে
প্রতিদিন নির্জন হেরায়
সূফীরাতে–
তাঁকে ডাকে
একান্ত বন্ধুর মতোন
আকাঙ্ক্ষায়
রব
রব
রব
... ।

তুমি এলে ॥ রেদওয়ানুল হক

যখন কোথাও সুখ ছিল না
ফুল ও ফলের মুখ ছিলো না
জালিম শুধু ফুঁসতো!
মানবতার রক্তগুলো–
জোঁকের মতো চুষতো।
যখন মানুষ রিক্ত থেকে
আরও ভীষণ রিক্ত হতো
অত্যাচারীর প্রবল ঘায়ে
চোখের বানে সিক্ত হতো

একটা সমাজ ভেঙে চুরে
সতের বিভক্ত হতো
সবুজ লতা-পাতার ধরা
জ্বলে পুড়ে তিক্ত হতো;–

সেই সময়ে তুমি এলে
শান্তি সুখের ডানা মেলে
আঁধার মুছে আলো ফেলে
তুমি এলে তুমি এলে...!!

www.pathagar.com

যে নামে উতল মন ॥ মোহাম্মদ আবদুর রহীম

যে নামে আকুল হলো ফুল পাখি আর জ্যোৎস্নার ঢল
হৃদয় থেকে হৃদয়ে বহে যে নামে নদী ছলাৎছল
মাঠ ভরা সবুজ ক্ষেতে যে হাওয়া ঐ নেচে নেচে যায়
কী কথা শুনি তার কাছে উতল মন যে ছোটে দূর মদীনায়
দেখি নাই তারে কোনদিন, না দেখা এ মন কেন উন্মন
হাওয়ার কাছে যে নাম শুনে নেচে ওঠে খেজুরের বন
দরূদ পড়েন খোদা, ফিরিশতা, চাঁদ তারা যে নামে
যার নামে ফুল হেসে আকুল নিখিল এ ধরাধামে
দুলে ওঠে এ দেহ অস্ফুট কণ্ঠে কী কথা বল্লাম
গেয়ে ওঠে মন "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

সুবাসে আর সৌন্দর্যে ॥ মোহাম্মদ সোলায়মান আকন্দ

তোমার সুবাসে আর সৌন্দর্যে
এসেছি আমরা পৃথিবীর দর্শনে
আমরা আলোকিত তোমার আলোয়
আমরা বিকশিত তোমার সৌন্দর্যের ছায়ায়
আঁধার খুড়ে, আলো খুঁজি, তোমার স্মরণে বিশ্ববন্ধনে।

তোমার অনুভব অর্জনে ঈমানের পথ খুঁজি
নিত্য নিজের নয়নে
তোমার সুবাস আর সৌন্দর্য
আমরণ চাঁদের স্তম্ভ।

হে মহান মনীষী
তুমিতো, রাতজাগা চাঁদ ছোঁয়া পুষ্পের জ্যোতি
তুমিতো পৃথিবী'র ফুলে ফুলে সজ্জিত
তুমি অন্ধকারে আলোর আয়না।
তুমি নব জন্মের আত্মার আত্মগান

www.pathagar.com

তোমাকে আলো আঁধারের এই
সভ্য সুবাসে প্রয়োজন।

তোমার সুবাসে আর সৌন্দর্যে জেগে ওঠে
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার,
এই তো তোমারই প্রতিদান
তোমার সহসায় নিত্য নির্ভয়ের স্তম্ভ
আজও অফুরান, বুকে চঞ্চল প্রাণ,
হে নবী তুমিতো নদীর মতো হাদীসে বহমান।

রাসূলের আদর্শের কাছে ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল

পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো রক্তের খেলা নিয়ে ব্যস্ত
সে খেলা চলে মুসলমানের রক্ত নিয়ে।
পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো মানবতার কথা বলে
অথচ মানবাধিকার লংঘন করে তারা চ্যাম্পিয়ান।
পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো স্বাধীনতার কথা বলে
অথচ দুর্বল দেশগুলোর উপর তাদের হস্তক্ষেপ প্রতিনিয়ত।
তারা কি জানে না! একদিন নমরূদ এসেছিল
চলে গেছে
তারা কি জানে না! একদিন ফেরাউন এসেছিল
সেও টিকে থাকতে পারেনি
তারা কি জানে না! একদিন শাদ্দাদ এসেছিল
পরাজিত হয়েছে সেও!

একদিন এই অন্ধকারও শেষ হয়ে যাবে, পরাজিত হবে
রাসূলের আদর্শের কাছে।

www.pathagar.com

তাবৎ পূর্ণতার দর্পণ ॥ মাহবুবুল আলম সেলিম

এক.

দয়ার সাগর রাসূল আমার মোহাম্মদ (সা) যিনি
যাঁর নামের দরূদ ও সালাম স্তুতি গাই আমি;
যিনি আলা-আমীন আল-আরাবি চির কল্যাণকামী
চির মহিমান্বিত, রোজ হাসরের কাণ্ডারী তিনি।

দুই.

তিনি নূরের নবী প্রেমের ছবি অনন্তের দান,
যে নূরের নবী ইসলাম ধর্মে ঈমানী চেতনা
যে প্রেমের ছবি নিয়ামত স্বরূপ দীপ্ত প্রেরণা
সেই চেতনা-প্রেরণা আমার শান্তির অভিজ্ঞান।

তিন.

আমার অভিজ্ঞানে আছে আলোকিত সত্যের ঢেউ
আমার অভিজ্ঞানে আছে তাঁর নামের সুরভিত;
এবং সে অভিজ্ঞানে আমি হই তাঁর পরশে প্রীত
তিনি আমার খাতামুন্ নবী, নয়তো আর কেউ।

চার.

এবং তিনি-ই মহানবী তিনি রহমতে আলম
তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম তিনি প্রতীক পূর্ণতার
দু'জাহানের নেতা তিনি নিখিল মানবতার
চিরনন্দিত সুন্দর তিনি পৃথিবীতে অনুপম।

এত প্রিয় নাম ॥ নাজমুল হুদা মজনু

রবিউল আওয়ালে আমি আনন্দে
উচ্ছ্বসিত
বেদনায় মূহ্যমান।
হে আল্লাহ! রাসূলের প্রেম
সে তো তোমার-ই দান।
তিনি এলেন যেদিন
চলেও গেলেন সেদিন।

www.pathagar.com

তুমি আদি অনন্ত
দয়ালু দাতা শ্রেষ্ঠ মহান।

হৃদয় ভরা কষ্টের মাঝে
সন্ধান দিলেন তোমারই মধুর নাম–
নাবী আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম।
সে যে বন্ধু তোমার
শোনালেন চির সত্যের বাণী
তোমারই পাক কালাম।
সে তো তোমার পরম দয়ার
মহা অনুদান;
তাঁর প্রতি বর্ষিত ওহির বাণী
নাজাতের এক জরুরী এলান;
তাইতো তোমার নামের পরে
মুহাম্মাদ এত প্রিয় নাম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তোমারই জন্য ॥ মোহাম্মদ মোমেন মিয়া

স্রষ্টার পরে সৃষ্টি তোমার
মোহাম্মদ রসূল
তোমার জন্য পাই আমরা
রহমত অতুল।

আল্লাহর বান্দা উম্মত তোমার
বড়ই পাপী তাপি
তোমার দোহাই দিয়া পাই
সকল পাপের মাফি।

সৃষ্টি খোদার রৌশন দেখি
তোমার মহিমায়
পর পারেও ক্ষমা পাবো
তোমার উছিলায়।

www.pathagar.com

স্রষ্টা তোমাকে ॥ শাহিন আল মামুন

ক্ষমা করো আমায়
অটল বিশ্বাসে তুলেছি দু'হাত
পাপ জর্জর দেহে।
আমি নিশ্চিত, হয়তো কোনোদিন
অবজ্ঞা করেছিলাম তোমায়।
হে বিধাতা ক্ষমা কর,
ভুল ভেঙেছে আমার
ক্ষমা করো আমায়।
আঁধার চারিধার, জেনেছি আজ; ক্ষমা করো
সেজদায় প্রণতি জানাই
আমায় মুক্তি দাও,
দাও মুক্তি দাও,
ক্ষমা দাও, ক্ষমা করো প্রভু।

প্রাণের আলো ॥ সুলতানা রিজিয়া

ইসলাম আর শান্তির ধারা
একই পথে যেমন বহে–
প্রিয় রাসূলের পবিত্র বাণী
মুমিনের হৃদয়ে সদাই রহে।

সৎ-সুন্দর কাজের মাঝে
নিত্য বিরাজিছেন যিনি–
সেতো আমার প্রিয় নবী
আল্লাহর হাবীব তিনি ॥

পাখির পরিচয় তার গানে
ফুলকে চেনায় তার ঘ্রাণ–
আমার নবী দো-জাহানের
শ্রেষ্ঠতম এক পবিত্র নাম।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

হনন অন্যরকম অত:পর

হাসান আলীম

ক.

বর্ষ শেষের শুকনো ধূসর পত্রপুঞ্জ উড়ছে, ছিঁড়ছে।

ছিঁড়বে আঁধার। আলো আঁধারের অব্যক্ত যন্ত্রণা চারপাশ ছেয়ে ফেলেছে। আঁধারের পোকারা প্রমোদে মত্ত।

সে ছিঁড়ছে উল্লাসে
টুকরো টুকরো করে ফেলছে সোনালী সুগন্ধী পত্র,
উড়িয়ে দিচ্ছে, সোল্লাসে আকাশে বাতাসে.........
কি ছিঁড়ছে সে দু'হাতে, পত্র?
সেকি শুধু মামুলি পত্র?
পত্রের আড়ালে কি নেই সে জন
দুর্দান্ত প্রছিন্নকারী?
সে কি ছিঁড়ছে নিজেকে নিজেই, জানে না অবোধ,
নিজের কাঁধে নিজেরই লাশ নিয়ে
ছুটে ফিরছে শতাব্দীর খুনীচক্র,
টুকরো টুকরো পত্ররাশি
নাকি টুকরো টুকরো প্রাণ, নিজস্ব ভূখণ্ড।

খ.

পায়চারী করছে কিসরা। দ্বিতীয় খসরু পারভেজ। পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট। পৃথিবীর অধিশ্বর। অদ্বিতীয় শক্তি ধর, বিশ্ব অধিপতি। তাকে সরাসরি অন্য রাজ্যের অধীন হওয়ার, তার ধর্ম মত পরিবর্তন করার আহ্বান এ তল্লাটে কার আছে? কে এমন

www.pathagar.com

শক্তিধর, অমিততেজ বীর পুরুষ। রাজ্য শাসক। ধর্ম নেতা। এযে দারুণ অপমানের হাতছানি। সে কি এতই শক্তিহীন? সে তো ইয়ামন ও হীরা শাসন করারও অধিকার রাখে। এর ওপর এত দুঃসাহস হল তাঁর! সমান্য একটি নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। আর এর মধ্যেই অপ্রত্যক্ষ হুমকি। সহ্য করতে পারে না সম্রাট। তার গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে। হাত নিশপিশ করতে থাকে।

মানযার সেই লোকটির পত্র তাকে এভাবে দিতে পারল? অক্ষিগোলক থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সাদা কাগজের অপূর্ব অক্ষরগুলোর ওপর। "আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপদ থাকুন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে মাজুসীদের সকল পাপ আপনার ওপর গড়াবে। এযে অধীনস্ত প্রজার প্রতি রাষ্ট্রীয় নির্দেশ! এমন কথা বলার জোর পেলো সে কোত্থেকে? রাগে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে চিঠি। পত্রদূতের সাথে বাজে ব্যবহার করে। ইয়ামেনের গভর্ণর বাযানকে কড়া নির্দেশ দেন, পত্রলেখক শাসকটিকে গ্রেফতার করে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিতে।

সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই বাযানের। দু'জন দূত পাঠান পত্র লেখকের কাছে। সাথে কিসরার কড়া নির্দেশনামাও ছিল। তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছে। তারা বলে সম্রাট আপনাকে তলব করেছেন। নির্দেশ অমান্য করলে আপনাকে ও আপনার রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

পত্র লেখক শান্তভাবে বললেন, আগামী কাল এসো।

তারা চলে গেল। পরদিন তিনি বললেন, কিসরাকে তার পুত্র শীরাওয়া হত্যা করেছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন।

দূতেরা তাঁর কথা শুনে বেশ অবাক হল। এ কেমন জ্বলজ্যান্ত কথা। সম্রাট নিহত হবেন। ক্ষমতাচ্যুত হবেন। একি করে সম্ভব! এ কথা তিনি কিভাবে বলছেন!

তাঁরা বললো, আমরা কি আপনার এ কথা রাজাকে জানাবো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ , তোমরা আমার এ কথা তাকে জানাও। তাকে একথাও বল, আমার ধর্ম ও রাষ্ট্র তার রাজ্যের শেষ পর্যন্ত পৌছে যাবে। আরো বলবে, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার দেশ ও জনগোষ্ঠী যে ভাবে আছে সেভাবেই থাকবে।

দূতেরা ইয়ামনে ফিরে গেল। বাযানকে সব কথা খুলে বললো তারা। বাযানের হৃদয় ভাবাবেগে আপ্লুত হল। সে ভাবছে নিশ্চয় তিনি সাধারণ কোন ধর্ম নেতা বা শাসক নন। এর মধ্যেই খসরু পুত্র শীরাওয়ার পত্র তার হাতে এল। অবাক বিস্ময়ে বাযান চিঠি পড়ছে। আমি কিসরাকে হত্যা করেছি। আমার পত্র পাওয়ার পর আপনি ও আপনার লোকজন আমার আনুগত্য মেনে নেবেন। কিসরা যে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাকে লিখেছিলেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত তাকে কোন রকম বিরক্ত করবেন না। পত্রপাঠ শেষে বাযান ও দূতেরা নিশ্চিত হয় মদীনার এ শাসক সাধারণ মানুষ নন। তিনি নবী, তিনি শ্রেষ্ঠ শাসক। তারা ভাবতে লাগল এ কেমন প্রতিশোধ যে মহান

www.pathagar.com

রাজার রাজ্য টুকরো করার পরিবর্তে মাত্র চিঠি টুকরো করলে নিজেকে টুকরো টুকরো হতে হয়, তিনি কোন সাধারণ শাসক নন। তিনি মহামানব, তিনি মহান শাসক।
কিসরা কি নবীর চিঠি সত্যি সত্যিই টুকরো করেছে!
নাকি নিজেকেই টুকরো করেছে! নিজেই অন্য রকম হননের স্বীকার হয়েছে।

গ.
নবী কি মৃত্যুবরণ করেন? মৃত্যুর পর কি তাঁর নবুওয়তী থাকে না?
নিশ্চয় থাকে। তাঁর আনিত বিধান আল কুরআন ! তা কি এখনো জীবিত নেই?
কুরআন অবমাননা হচ্ছে। মসজিদ ভাঙছে। তাঁর লক্ষ লক্ষ উম্মতকে নির্বিচারে হত্যা করছে। দিকে দিকে নির্যাতিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত হচ্ছে নারী, শিশু, অবলা মানুষ। রাক্ষুসী থাবা নিয়ে আক্রমণ করছে যুগের প্রচণ্ড কিসরা। তারা ছিঁড়ছে পবিত্র কুরআন, তারা লাথি মারছে, বুট-স্পৃষ্ট করছে পবিত্র কুরআন। তারা কি কখনও ছিঁড়বে না? তারা কি নিবৃত্ত হবে না? তারা কি আত্ম হননে, তারা কি প্রচন্ড অগ্নিগোলকে নিক্ষিপ্ত হবে না? পৃথিবী অপেক্ষা করছে আর একটি অন্যরকম হননে এবং অতঃপর .... ◆

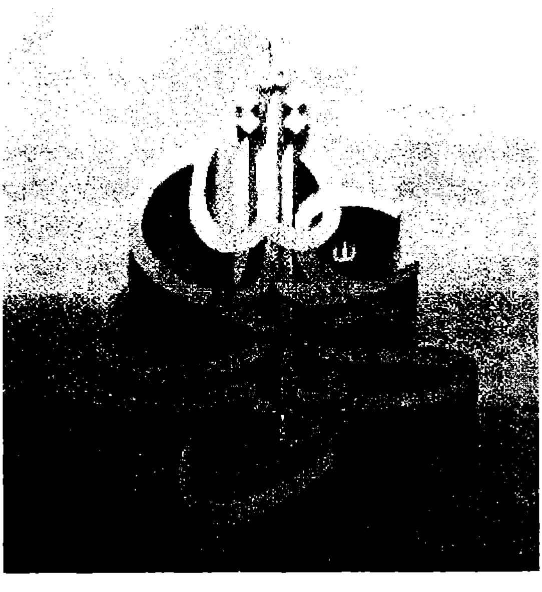

www.pathagar.com

নিজের কাজে ভালবাসা

লুৎফুল খবীর

হযরত মুহাম্মাদ (সা) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সম্পদের সুষম বন্টন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর কীর্তি বিশ্বসভ্যতার কিংবদন্তি হয়ে আছে। একবার তিনি দেশের কাজে বাইরে বের হলেন। সাথী ছিলেন অনেক সাহাবী। গন্তব্য অনেক দূর। সে সময় মরুভূমির চলার একমাত্র বাহন ছিল উট। উট খুব ধীরগতির প্রাণী। হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে নিয়ে চলা উটের কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিল। চলতে চলতে এক সময় সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত এক সময় তারা থামলেন এক খেজুর বাগানের ছায়ায়। তাদের ইচ্ছা এখানে খাবার খেয়ে নেবেন তারপর যদি একটু বিশ্রাম নেয়া যায়। সবাই নিজ নিজ উটের পিঠ থেকে নিজ নিজ জিনিসপত্র নিচে নামালেন। ঠিক হল এ বেলার খাদ্য হিসেবে একটা দুম্বা জবাই করা হবে। দুম্বার গোশত সংগ্রহ থেকে রান্না ও পরিবেশনের কাজ সবাই ভাগ করে নেবেন। দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। একজন সাহাবী বললেন, দুম্বার চামড়া খসানোর দায়িত্ব আমি নিলাম। একজন বললেন, মাথা কুচি কুচি করে বানানোর জটিল কাজটি আমি করতে চাই। অন্যজন বললেন, গোশতগুলো বানাবো আমি। অন্যজন বললেন, তাহলে রান্না-বান্নার দায়িত্ব আমার উপর থাক। এ সময় তাদের দলনেতা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) বললেন. তাহলে 'গোশত পাকানোর জন্য লাকড়ি যোগাড় করা আমার দায়িত্ব।' প্রিয়নবীর কথা শুনে সাহাবীরা বিস্মিত হলেন। একযোগে সবাই বলে ওঠেন, আমরা থাকতে আপনি কাজ করবেন কেন? আপনি একটু বিশ্রাম নিন। আমরা কাজগুলো সহজে ও সুন্দরভাবে অল্প সময়ে করে নিতে পারব।

উত্তরে ধীরস্থির কণ্ঠে মাহনবী (সা) বললেন, আমি জানি এ কাজগুলো তোমরা সহজেই করে নিতে পারবে। কিন্তু আমার আল্লাহ্ তাঁর সে বান্দাকে কখনো ভালবাসেন না যে নিজের বন্ধুদের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে, এবং নিজেকে অপরের চেয়ে বিশেষ ব্যক্তিত্ব জ্ঞান করে।

রাসূল (সা)-এর কথা শুনে সাহাবীরা উত্তরের ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারা দেখলেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) খেজুর বনের দিকে লাকড়ি কুড়াতে চলে যাচ্ছেন এবং সাহাবীরা জানেন কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে লাকড়ি কাঁধে নিয়ে ফিরে আসতে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

ইসলামী চেতনায় আমাদের পথচলা

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড

শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত
একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ সদস্য সমন্বিত শরীয়াহ্ কাউন্সিল
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পরিষদ
- স্বল্পতম সময়ে দাবী পরিশোধ
- স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা
- দ্রুততম গ্রাহক সেবার নিশ্চয়তা
- প্রবাসীদের সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা
- ইসলামী পূর্ণবীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদন

আমাদের একটি পলিসি
আপনার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে–ইনশা'আল্লাহ

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
برائيم اسلامى لائف انشيورنس لميتيد
Prime Islami Life Insurance Limited
আর্থিক নিরাপত্তার সেতু বন্ধন

Head Office : Raj Bhahan (6th floor), 29, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
Phone : 9554538, 9560889, Fax: 9564390, e-mail : plicl@bdonline.com

www.pathagar.com

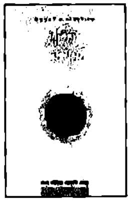

অপসংস্কৃতি রোধে বিশ্বনবী (সা) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ড. আ, ছ, ম, তরীকুল ইসলাম

১. ভূমিকা

সংস্কৃতি সংস্কার শব্দ থেকে নির্গত। 'সংস্কার'এর অর্থ হল শুদ্ধ, শোধিত, পবিত্র, মার্জিত প্রভৃতি। সুতরাং যা শোধন করা হয়েছে, পরিমার্জিত হয়েছে, পবিত্র করা হয়েছে তারই নাম সংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি সংস্কৃতি শব্দের বিপরীত শব্দ যা শোধিত নয়, অপবিত্র ও অপরিমার্জিত তার নামই অপসংস্কৃতি। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর একটি সম্মেলন মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত বিজ্ঞ গবেষকদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে "ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতীয় অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত ও আবেগগত চিন্তা এবং কর্ম ধারার প্রকাশ।" অতএব মানুষের চাল-চলন, আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড সকল কিছুই তাদের সংস্কৃতিরই অংশ। আর তাদের এই সবকিছু যদি শোধিত, মার্জিত, পবিত্র ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয় তাহলে তা তাদের সংস্কৃতি বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে তাদের এই সব যদি হয় অশোধিত, অমার্জিত, কুরুচিপূর্ণ ও নেতিবাচক, তা হলে তা হয় অপসংস্কৃতি। আর কোনটি সংস্কৃতি ও কোনটি অপসংস্কৃতি তা নির্ধারণ হয় মূলতঃ মানুষের আকীদাহ, বিশ্বাস ও ধর্মীয় মানদণ্ড দ্বারা। সেজন্য ইসলামে একত্ববাদ, শালীনতা, পবিত্রতা অর্জন প্রভৃতি সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য। অন্যদিকে বহু ঈশ্বরবাদ, অশ্লীলতা, মূর্তিকে সম্মানদান প্রভৃতি অপসংস্কৃতির অংশ বলে ধরা হয়। বিশ্বনবী (সা) অত্যাধুনিক মার্জিত ব্যক্তিত্ব। সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি মনা পুরুষ। তিনি ছিলেন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন। সমাজ থেকে অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার

www.pathagar.com

শক্ত অবস্থানের আলোচনা ও বাংলাদেশে এই অপসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটই হচ্ছে এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২. বিশ্বনবী ও অপসংস্কৃতি

রাসূলুল্লাহ (সা) কে যে সমাজে প্রেরণ করা হল সেই সমাজ অপসংস্কৃতির বিষবাষ্পে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। যে কোন সাধারণ রুচিবোধও যাকে অপসংস্কৃতি বলে মনে করে, তা সেই সমাজে হরদম প্রচলিত ছিল। নারী পুরুষের উলঙ্গ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ, অথর্ব মূর্তির প্রতি অতিরঞ্জন শ্রদ্ধাবোধ, সৎমাকে বিবাহ করা, শিশুকন্যাকে জীবিত দাফন করা, শত্রুর মাথার খুলিতে মদপান করে প্রতিশোধ স্পৃহাকে অবদমিত করা প্রভৃতি অসংখ্য অপসংস্কৃতির কাছে সেই সমাজ ছিল একেবারেই জিম্মী। এই সমাজকে ঐতিহাসিকগণ জাহেলী সমাজ বলে ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। এ দ্বারা এ সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা অনুমান করা যায়। নিখিল বিশ্বের জন্য রহমতের বাণী নিয়ে বিশ্বনবী এই অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত সমাজে আবির্ভূত হলেন। তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব ছিল এই অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করা। অপসংস্কৃতির বিষদাঁত চূর্ণবিচূর্ণ করে একটি পূতপবিত্র মার্জিত সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রেক্ষাপটে তিনি যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তা আলোচনা করা হল।

মানুষ ষড়রিপুর তাড়নায়, শয়তানের কুমন্ত্রণায়, প্রকৃতির দাসত্ব ও অসুস্থ পরিবেশের প্রভাবে মার্জিত সংস্কৃতি বর্জন করে অপসংস্কৃতির মহাপ্লাবনে ভেসে যেতে পারে। স্বাভাবিক এই অবস্থায় যদি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়া হয় তাহলে সমগ্র সমাজ অপসংস্কৃতির বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেইজন্য বিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানী রাসূলুল্লাহ (সা) অপসংস্কৃতি রোধকল্পে সকলকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের যদি কেউ অগ্রহণীয় (মুনকার) কিছু দেখে তাহলে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে, মনে মনে এটাকে ঘৃণা করবে। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন অবস্থা।' মূলত এখানে মুনকারকে প্রতিহত করার কথা উল্লেখ হয়েছে। সুস্থ বিবেক যে অপরাধ অন্যায়কে কখনো মেনে নিতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে যা অপরাধ তাকেই 'মুনকার' বলা হয়। অপসংস্কৃতিও মূলত মুনকারেরই অংশ বিশেষ। সুতরাং এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য অপরাধ অন্যায়ের সাথে সাথে এখানে অপসংস্কৃতিকেও প্রতিবাদ করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বরং এখানে তিনি অপসংস্কৃতি প্রতিহত করার প্রকৃতির উপর ঈমানের স্তর নির্ভরশীল বলেও উল্লেখ করেছেন। যার প্রতিবাদ যত শক্ত তার ঈমান তত মজবুত। যার প্রতিহত যত দুর্বল তার ঈমান তত কমজোর। মূলত এই হাদিসটিতে অপসংস্কৃতির সাথে আপসতো

www.pathagar.com

নয়ই বরং তার মূল চিরতরে উৎপাটনের জন্য সম্ভব্য সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছেন। অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই কাউকে ইসলামী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে জাহিলী অপসংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হতে দেখেছেন তখনই তাকে তিনি 'ইন্না ফিকা জাহিলিয়্যাহ' (তোমার ভিতরে জাহিলীয়াত রয়েছে) বলে অপসংস্কৃতি হতে ফিরিয়ে এনেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) অপসংস্কৃতির ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতি হতে যাতে মুসলিম সমাজ নিস্কৃতি লাভ করতে পারে সে প্রসঙ্গে তার কিছু অমীয় বাণী ও অনবদ্য কর্মকাণ্ড উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হল।

২.১ মূর্তি অপসংস্কৃতি :

ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে তাওহীদ, আর মূর্তি অপসংস্কৃতি তাওহীদরেই পরিপন্থী। একক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে মূর্তি-সংস্কৃতি অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইসলামের সাথে মূর্তির কোন সম্পর্ক নেই। সেজন্য রাসূল (সা) এই অপসংস্কৃতিকে শুধু ঘৃণাই করেননি, রীতিমত একে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন কাবাগৃহে অবস্থিত সকল মূর্তিকে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন। তাইফে অবস্থিত 'লাত' মূর্তিকে মুগীরাহ ইবন শুবাহ (রা)কে পাঠিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। 'নাখলাই' নামক স্থানে অবস্থিত উজ্জাহ মূর্তিকে খালিদ ইবন অলীদ (রা) ও 'কাদীদ' নামক স্থানে অবস্থিত 'মানাত' মূর্তিকে আলী (রা)এর মাধ্যমে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ, স্ট্যাচু প্রভৃতির নামে আমাদের সমাজে প্রচলিত মূর্তি অপসংস্কৃতি রাসূলুল্লাহ (সা)এর আদর্শের সাথে পরিপূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক। উল্লেখ্য যে, অনেকেই ড্রয়িং রুম, শোকেস প্রভৃতির শোভাবর্ধনের জন্য যেসব বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি রেখে থাকে সেগুলোও এই অপসংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। মুসলমান হিসেবে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ঈমানের অনিবার্য দাবি।

২.২ অশ্লীলতা

ইসলাম মার্জিত ও শালীন জীবন ব্যবস্থা। বেহায়পনা অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা অপসংস্কৃতি ইসলামে জঘন্যভাবে ঘৃণিত। মহানবী (সা) একটি অশ্লীল সমাজে জন্মগ্রহণ করেও এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির অনেক পূর্বে তখনও বালক মুহাম্মাদ (সা)। কাবাগৃহ গাঁথার জন্য পাথর বহন করতে যেয়ে তার লুঙ্গি খুলে যাওয়ায়, তিনি শুধু বিব্রত বোধই করেননি বরং তিনি বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি আমার লুঙ্গী আমার লুঙ্গী, বলে চিৎকারও দিয়েছিলেন। এ ঘটনা তার শালীন জীবনের জ্বলন্ত সাক্ষী। তিনি অর্ধ উলঙ্গ পাতলা কাপড়, পরিহিতা মহিলাদেরকে

www.pathagar.com

অভিসম্পাত দিয়েছেন। তাদেরকে জাহান্নামের অনিবার্য শাস্তির ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যিনাকারিনী মহিলার শাস্তিকে স্বহস্তে কার্যকর করেছেন। মহিলাদের রূপ প্রদর্শনীকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। একান্ত একাকিত্বে কোন পুরুষ ও মহিলাকে একত্রিত হতে নিষেধ করেছেন। হঠাৎ করে কোন মহিলার দিকে নজর গেলে দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকাতে বারণ করেছেন। মুহরিম ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে পর্দা করাকে অনিবার্য করেছেন। মূলত তাঁর এই কর্মকাণ্ড তিনি যে অশ্লীল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তারই স্পষ্ট প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ হচ্ছে এই অশ্লীল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তার অনুসারীর দাবিদার যদি এই সত্যকে উপেক্ষা করে অপসংস্কৃতি লালনে আত্মতৃপ্তি লাভে মগ্ন হয় তাহলে তার মধ্যে আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

২.৩ বিজাতীয় অপসংস্কৃতি

মুসলিম একটি স্বতন্ত্র জাতি, ইসলাম একটি স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে চির উদ্ভাসিত কোন বিজাতীয় অপসংস্কৃতি চর্চার দ্বার ইসলামে অবরুদ্ধ। রাসূলুল্লাহই (সা) প্রতিটি পদক্ষেপে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি যাতে এই উম্মতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। তিনি বলেছেন- "যে বিজাতিকে অনুকরণ করবে, সে তাদের মধ্যে বলে গণ্য হবে।" অর্থাৎ সে মুসলমান থাকার অধিকার হারাবে। অন্য জাতি আশুরার সিয়াম একদিন পালন করত বিধায় তিনি দশই মুহাররমের আগে পরে অন্য আরো একটি সিয়াম সংযুক্ত করে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ থেকে তাঁর উম্মাহকে পৃথক করেছেন। জাহিলী যুগে নির্ধারিত দুই আনন্দের দিনকে আনন্দ উল্লাসের জন্য নির্ধারণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আমরা রক্তে মাংসে মুসলমান হলেও মনমস্তিস্কে বিজাতি। বিজাতীয় অপসংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যবাহী রুচিশীল মার্জিত সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। মঙ্গলপ্রদীপ, রাখী বন্ধন, তিলকদান, কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ, থার্টি ফার্স্ট নাইট প্রভৃতি অসংখ্য বিজাতীয় অপসংস্কৃতিকে লালন করে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করছি। এই সব বিজাতীয় অপসংস্কৃতিতে ডুবে থেকে মুসলমান থাকার সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (স)এর পূর্বোল্লেখিত বাণী এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এইসব উদাহরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো অপসংস্কৃতির সাথে আপোষ করেন নি, বরং সমাজ থেকে অপসংস্কৃতির নির্মূল করার জন্য জোড়ালো ভূমিকা পালন করেছেন।

৩. অপসংস্কৃতি ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লালন ভূমি ভারত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দেশ মায়ানমার। যে কোন ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার দেশ থেকেও এই

www.pathagar.com

ভূখণ্ডটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন। ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু মাক্কাহ-মাদিনাহ হতে এ দেশের দূরত্ব অনেক। পাশের বিজাতীয় অপসংস্কৃতি দেশ দু'টির প্রভাব বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও এখানে বেশ প্রকট। এদেশের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সিংহভাগই ছিল হিন্দু। মুসলমান হলেও পূর্ব পুরুষ হিন্দুদের অপসংস্কৃতি ও তাদের মধ্য হতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। অন্য যে কোন মুসলিম জনপদ থেকে দূরে থাকার কারণেও ইসলামী সংস্কৃতি যথাযথ বিকাশ লাভ না করতে পারায় অপসংস্কৃতির আগাছা এ ভূখণ্ডে বেড়ে উঠার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। দেশটি পাকিস্তান থেকে বিভাজনের পর পশ্চিমাবিদ্বেষী রাজনৈতিক চেতনা অলক্ষ্যে হলেও এদেশে অপসংস্কৃতিকে বিস্তৃত করার জোরাল ভূমিকা পালন করেছে। মনে করা হয় যে, পাকিস্তানীরা যেহেতু আমাদের দেশ দখল করেছে, আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে তারা আমাদের শত্রু। তারা যেহেতু জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক সেহেতু শত্রুর এই সংস্কৃতি কখনো আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। ভারত যে কারণেই হোক আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সহযোগিতা দিয়েছে, সুতরাং তারা আমাদের বন্ধু। বন্ধুর সংস্কৃতিই আমাদের সংস্কৃতি। এই প্রেক্ষাপটে এ দেশ থেকে ইসলামী সংস্কৃতিকে নির্মূল করার জন্য একদল ইসলামবিদ্বেষী এই রাজনৈতিক চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার পাশাপাশি অপসংস্কৃতিকে চর্চার পথ সুগম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে দুইশত বছর আমাদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে যে জাতশত্রু বৃটিশ, আমরা কিন্তু তাদের সংস্কৃতিকে সামান্য বর্জন তো করিনি বরং তা আশীর্বাদ মনে করে, শক্তভাবে লালন করে চলেছি।

এদেশের অধিকাংশ মুসলমান সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার কারণেও অপসংস্কৃতি তাদের অলক্ষ্যে মজবুত শিকড় গেড়ে বসার উন্মুক্ত সুযোগ পেয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেও সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দেশের আলিম সমাজও এই ময়দানে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন নি। এজন্য এখানে সংস্কৃতির গণ্ডিকে ছোট করে উপস্থাপন করাও যথেষ্ট দায়ী। গান বাজনা চর্চার মত স্বল্প কিছু কর্মকাণ্ডকে সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যে কারণে সুস্থ সংস্কৃতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যথাযোগ্য সম্প্রসারিত হতে পারেনি। যার অনিবার্য পরিণতিতে অপসংস্কৃতির বিপজ্জনক ঘনঘটায় এখানের সংস্কৃতির আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এদেশে যেসব তথ্য পরিবেশন মাধ্যমের প্রচলন রয়েছে, তা রুচিপূর্ণ মার্জিত সংস্কৃতিকে সম্প্রসারণের ভূমিকা পালনের চেয়ে, বরং অপসংস্কৃতির প্রবল তুফানে যাতে এই জাতি অকালেই ধ্বংস হয়, সেই ভূমিকাই বেশি পালন করে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের মুসলমানরা হিজরি নববর্ষকে চেনে না। মুসলমান বাচ্চারা সালাম দেয়া বা আল্লাহ হাফিজ বলা থেকে টাটা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে

www.pathagar.com

দিনের সূচনা করার চেয়ে হারমনিয়ামে সুর তুলে দিনের সূচনা করতে ভাল মনে করে। কোন ইসলামী নাম বাচ্চাদের জন্য রাখার চেয়ে লাল্টু, বল্টু, সুমন, সাগর, প্রভৃতি নাম রাখতে আগ্রহ দেখায়। মোট কথা অপসংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য সয়লাবে এদেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মত বলে শুধু দাবিই করিনা তাঁর অনুসরণের দৃঢ় শপথ নিয়েই মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিয়েছি। তাঁর জীবনের অন্যতম মিশন ছিল অপসংস্কৃতির বিরোধিতা করা, পৃথিবী থেকে অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন ছিল তাঁর অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য। তাঁর এই লক্ষ্য থেকে আমাদের কোনক্রমেও সামান্য বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ নেই। অপসংস্কৃতির বিষদাঁত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ঈমানী কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা এ বিষয়ে দারুণ উদাসীন।

৫. উপসংহার

আমরা শ্রেষ্ঠজাতি। আমাদের সংস্কৃতিই সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের সংস্কৃতিই মার্জিত, রুচিপূর্ণ সর্বজন গ্রহণীয়। এদেশ আমাদের। একে ভাল করে গড়তে হলে অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আমরা রাসূলের (সা) সৈনিক। আসুন না, আজ আমরা বজ্র শপথ গ্রহণ করি- 'না, অপসংস্কৃতির সাথে কোন আপষ নেই। যতদিন এই জনপদ অপসংস্কৃতি-মুক্ত হবে না, ততদিন আমরা ক্ষান্ত হব না, থেমে যাব না। ◆

www.pathagar.com

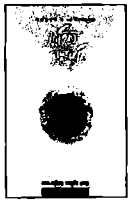

বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা

মুকুল চৌধুরী

ইসলামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় চৌদ্দশ' বছরের। হিজরী প্রথম শতকেই এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। তবে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির অভাবে এ সময়কালকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।[১] অনুমান করা হয় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত মামুন এবং হযরত মুহায়মিন নামের দু'জন ইসলাম প্রচারক সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারার্থে আগমন করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও কয়েকটি দলের আগমনের এখানে ইসলামের শিকড় প্রোথিত হয়। এভাবে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগণিত ইসলাম প্রচারকের পদচারণায় এ মাটি ধন্য হয়েছে। এ সকল সত্য-প্রচারকের অন্যতম কর্ম-কৌশল ছিল, তাঁরা এ দেশের প্রচলিত ভাষায় সত্য-দীনকে এ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন।

এ অঞ্চলে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয় ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, ইখতিয়ার উদদীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে। কিন্তু সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব এসেছে আরও পরে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ইসলামের সক্রিয় সম্পর্ক সাতশ' বছরের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখন চর্যাগীতির কাল অতিক্রম করে মঙ্গলকাব্য যুগের অবক্ষয় পর্বে ঢুকেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা তখন বর্ধিষ্ণু। এ বর্ধিষ্ণু প্রভাবের চাপ পড়ে প্রতিবেশী সমাজের সাহিত্যমণ্ডলীর মধ্যেও। ইসলামী জীবনাচরণ পরোক্ষে হলেও তাদের স্পর্শ করে। এ পর্যায়ে বাংলার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইসলামের আলোচনা পোষকতা লাভ করে। সাহিত্যেও এতদিন পর্যন্ত বিরাজিত ক্লিশ দেব-দেবী অর্চনার পথ মানবিকতার বিকল্প ধারায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠায় বাংলা ভাষা নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ডক্টর শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,

"হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যে রূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই

www.pathagar.com

কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল।... বঙ্গভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া 'দ্বিজের' ন্যায় সম্মান লাভ করিল।... মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।... বঙ্গ-সাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্ট, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা। বহু পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া মুসলমান কবিগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন– পালাগানে তাঁহারা যে শক্তি ও কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যিক আসরে তাঁহাদের স্থান প্রথম পংক্তিতে।"[২]

এক পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে একটি ঐক্য প্রয়াসও লক্ষণীয়। "একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহজ-সাধনার গঙ্গাধারার সঙ্গে সুফী-সাধনার যমুনা-ধারাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান সাধক-কবিরা।"[৩] তবে, "সাহিত্যের ক্ষেত্রে বরং হিন্দু ও মুসলিমদের কাব্য-কৃতিতে আমরা সমন্বয়ের চাইতে স্বাতন্ত্র্যই বেশি লক্ষ্য করি।... হিন্দু ও মুসলিম বাঙ্গালী কবিরা তখন একই ভাষায়, একই কাব্য-রীতিতে, একই শব্দ-সমগ্র ব্যবহার করে সাহিত্যচর্চা করলেও দু'য়ের কাব্য প্রয়াস দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। দুয়ের উদ্দেশ্য ও স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। হিন্দু কবিরা কাব্য-প্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের স্বীয় ধর্মীয় উৎস থেকে, আর মুসলিম কবিরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত ইসলামী উৎসভিত্তিক আরবী-ভারসী সাহিত্য থেকে এবং সামগ্রিক মুসলিম জনসাধারণের উপর হিন্দু কবিদের ধর্মভিত্তিক কাব্যসুষমার প্রভাবকে মোকাবিলা করে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রেমকাহিনী-বীরগাথা-রম্যকথা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর রচিত কাব্য-মাধুরী দিয়ে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকেই তাঁরা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[৪] আর এ প্রভাবের উপলক্ষ হয়েই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম অঙ্কিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্যপুরাণ-এ সর্বপ্রথম 'মহামদ' শব্দটি ব্যবহার করে লেখেন–

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্প হৈল্যা শূল পাণি।
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি।"[৫]

উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম সাহিত্য-সাধকরাই প্রথম দেব-দেবী নির্ভর বাংলা সাহিত্যে 'মানবিকতা'কে উচ্চকিত করে তুলেন। "এখানে একবার বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে করা যেতে পারে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তিনটি অংশে ভাগ করেছেন : প্রাচীন যুগ– যা মোটামুটি সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যযুগ– ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত;

www.pathagar.com

এবং আধুনিক যুগ– ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল না, হিন্দুদেরও ছিলো না, তা বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট : চর্যাপদ। মধ্যযুগে বাঙালি-মুসলমান রোমান্স-কাব্যের মধ্য দিয়ে মানবিকতার উদ্বোধন করেন। সেই–যে দেব-দেবী-অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার বন্দনা শুরু হলো, বাঙালি মুসলমান আজো সেই মানবিকতারই জয়গান গেছে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানদের যদি শ্রেষ্ঠ অবদান এক কথায় চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে এই 'মানবিকতা' শব্দেই তাকে শনাক্ত করতে হবে।"[৬] মুসলমান কবিরা রোমাঞ্চ প্রণয়োপাখ্যানে মানুষের বিজয় ঘোষণা করলেও হিন্দু কবিদের রচিত কবিতার আখ্যানভাগের অনুরূপ তাঁদের সকল রচনায় 'হামদ' আর 'নাত' পেশ করার প্রশংসিত রীতির প্রচলন করেন। আর এভাবেই মুসলিম-বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় রসূল প্রশস্তির এক মহার্ঘ্য বাক্যসমষ্টিকে অবলম্বন করে।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৯৭-১৪১০) সমসাময়িক প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৩৯-১ ৪০৯) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'ইছুফ-জুলিখা'য় এভাবেই বাঙ্ময় হয়েছিল এ পংক্তি কয়টি :

"জীবাত্মার পরমাত্মা মহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।।
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মহাম্মদ হস্তে কৈলা তা সব রতন।।"[৭]

দেব-দেবী লাঞ্ছিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব-রস সঞ্চয়নের এ কাজে শাহ মুহম্মদ সগীরের যাঁরা অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন দৌলৎ উজির বাহরম খান, মুহাম্মদ কবীর, আলাওল, দৌলৎ কাজী, শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, সৈয়দ সুলতান প্রমুখ। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) ও সৈয়দ আলাওল (১৫৯২-১৬৭৩ মতান্তরে ১৬০৭-১৬৮০), এবং প্রথমোক্তজন–যিনি আরাকান অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সুসম্পর্কিত থেকে মধ্যযুগীয় মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের উদ্যোক্তা-পুরুষ হিসেবে আত্মস্বাতন্ত্র্য চিন্তায় ভাস্মর হয়ে উঠেছিলেন এবং দ্বিতীয়জন বাঙালী-মুসলিম চিত্তবৃত্তির যুগ-প্রতনিধিত্বের দাবীদার হওয়ার গৌরবে হয়েছিলেন অভিষিক্ত; তাঁদের দু'জনের রসূল প্রশস্তির দু'টি অংশবিশেষের নমুনা :

১) প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন।

দ্বিতী এ লই মুস্তাফা পয়গাম্বর
যাহার সিফত আছে রোজ মহাশর।
আখের এড়াইবা যদি হিসাবের দাএ।
[জ্ঞান প্রদীপ]
–সৈয়দ সুলতান

www.pathagar.com

(১) পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥

নিজ সখা মহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতি-মূলে ত্রিভুবন নিরমিলা ॥

তাহান্ পিরীতে প্রভু সৃজিলা সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥

সেই দীপ জ্যোতিএ উজ্জ্বল ত্রিভুবন।
হইল নির্মল জ্যোতি পাতক নাশন ॥

ঘোরাকার ছিল পন্থ নর পাপ লীন।
পুণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তার দ্বীন ॥

জন্মিয়া যে জনে না লইল তার নাম।
তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম ॥[৮]

[–সৈয়দ আলাওল, পদ্মাবতী]

মুসলিম কবিবৃন্দের হাতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের পাশাপাশি 'রাসূল বিজয়' ও 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্যও প্রণীত হতে থাকে। এ ধারায় কবি জৈনুদ্দীন সর্বপ্রথম 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেন (রচনাকাল ১৪৭১-১৪৮১)। জৈনুদ্দীনের ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন শাহ বারীদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০), এবং পরবর্তীতে সৈয়দ সুলতানও (১৫৫০-১৬৪৮)। সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' (রচনাকাল ১৫৮৫-১৫৮৬), 'রসূল বিজয়' 'ওফাতে রসূল' এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬৬০), নসরুল্লাহ খান (১৫৬০-১৬৪৫) এবং মুহাম্মদ খানও (১৫৮০-১৬৫০) এ ধারা অনুসরণ করেন। এঁরা সৈয়দ সুলতানের সমসাময়িক এবং শেষোক্তজন তাঁর উপযুক্ত ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁদের রসূল প্রশস্তির নমুনা ঃ

(১) বন্দম নূর মোহাম্মদ হাবিব আল্লাহর
চৌদ্দ ভুবনের পীর হ-মহিমা অপার ॥

আউয়ালে আখেরে করি একিদা নূরের।
গুণা মাফ করাইব চৌদ্দ ভুবনের ॥

[রসূল বিজয়] ॥–শেখ চান্দ

(২) আর এক কথা কহি আমি রঙ্গমনে।
জেই কর্ম না করিব মুহমিনগণে ॥

জে সকল কর্মে মোহাম্মদ অসন্তোষ।
হিছাবের কালে প্রভু করিবেন্ত রোষ ॥

[হিদায়াতুল ইসলাম] ॥ –নসরুল্লাহ খান

www.pathagar.com

(৩) নিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে করিয়াছ সক্য ॥

দর্পণে দেখিও যেন আপনা বদন।
নবীকে ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন ॥[৯]

[সত্য কলি-যুগ সংবাদ] ॥ -মুহাম্মদ খান

এ পর্যায়ে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের একটি আনন্দের সংবাদ জানিয়ে লিখেছেন, "আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা প্রথম মুসলমান কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর যেমন তাঁর কবিতায় রসূল প্রশস্তি করেছেন, তেমন প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মাদ সিদ্দিকীও (১৮০৮-১৮৭০) রসূল-প্রশস্তি করেছেন। 'ইউসুফ-জোলেখা' মুসলমান রচিত প্রথম কবিতাগ্রন্থ, 'উচিত শ্রবণ' (১৮৬০) মুসলমান-লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। অবশ্য এ গ্রন্থে পদ্যও কিছু কিছু আছে। এরকম একটি পদ্যেই রসূল-প্রশস্তি রচনা করেছেন খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী :

নবিজীর নূরে সংসারে প্রচারে
প্রকাশিল দিবানিশি।
স্বর্গমর্ত্য আর কিরণ তাহার
দেখা দিল রবিশশী ॥
ছিদ্দিকী অধীনে সে গুণ ব্যাখ্যানে
কেমনেতে পারে বলো।
নবিজী যে স্থানে বাখানিতে গুণে
সাধনে অক্ষম হলো ॥"[১০]

এ পর্যায়ে বাংলা লোক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি'র লেখক আফজাল চৌধুরী লিখেছেন, "সতের, আঠার ও উনিশ শতক বাংলাদেশে সুফী-সাধকদের গীতি-কবিতা চর্চার সাফল্যের যুগ। মধ্যযুগের এ অন্ত্যপর্বে বেশ কয়কজন সাধক কবির আবির্ভাবে মরমী কবিতার জগৎ, কথা ও সুরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।... পাগলা কানাই, লালন শাহ, হাসন রাজা, শীতালং শাহ, আরকুম শা, শাহনূর, শেখ ভানু প্রমুখ সাধক কবির স্থিতিকাল সতের শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এঁদের মাঝে লালন ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘজীবী এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালকে ছুঁয়েও তাঁর চেয়ে প্রায় শতবছর বেশী বয়স্ক। লালন সুফী কবিদের সম্রাট এবং অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্য তিনি আজ এক অমর ব্যক্তিত্ব। লালনের আরও সাফল্য যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিলেন।... বৈষ্ণবদের গীতি-কবিতা ও সুফীর্দের 'ভাবের গান'-এর মূল সুরের মাঝে ঐক্য ধ্বনিত হলেও বাউলদের জগতে পরম গুরু হয়ে এসেছেন রসূল (সা) যেন এঁদের উজ্জ্বল উদ্ধার রূপে। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রসূলতত্ত্বের বিবিধ সিদ্ধান্ত সুফীর হৃদয়ের গভীর ক্রন্দন ধ্বনিতে যে এক সুরময় ভুবন নির্মাণ করেছে তাতেই রসূল প্রশস্তি প্রসঙ্গ আমাদের সাহিত্যে লাভ করেছে

www.pathagar.com

বহুব্যাপকতা।"[১১] এখানে লালন- এর (১৭৭৪-১৮৯০) একটি গীতি কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না
দেখা দিয়া ওহে রসূল ছেড়ে যেও না ॥

তুমি হে খোদার দোস্ত
ওপারে কাণ্ডারী সত্য
তোমা বিনে পারের লক্ষ্য আর দেখা যায় না ॥

আমরা সব মদিনাবাসী
ছিলাম যেমন বনবাসী
তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি আছে সান্ত্বনা ॥

আসমানী আইন দিয়ে
আমাদের সব আনলে রাহে
আজ মোদের ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে যেও না ॥

তোমা বিনে এরূপ শাসন
কে করবে আর দীনের কারণ
লালন বলে আর তো এমন বাতি জ্বলবে না ॥"

মধ্যযুগের রসূল-প্রশস্তিতে রসূল (সা)-এর সত্তায় অবতারত্ব এবং অতিমানবিক আধিদৈবিকতা আরোপের যে প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি (যা থেকে কবি আলাওল এবং সৈয়দ সুলতানও মুক্ত ছিলেন না), লালন এবং তাঁর সংগীরা– যেমন পাগলা কানাই (১৮১০-১৮৯০ মতান্তরে ১৮২০-১৮৯৫), শীতালং শাহ (১২০৭-১২৯৬ বঙ্গাব্দ), শেখ ভানু প্রমুখ আশ্চর্যরকমভাবে তা থেকে মুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি আফজাল চৌধুরীর এ বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য :

"লালনের গানটিতে (পূর্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গান) ওফাত-পর্যায়ের একটি মর্সিয়াকে মদিনাবাসীর হৃদয়ের স্মৃতির আবরণে সকরুণ বাণীরূপ দেয়া হয়েছে। সুন্দর এই গীতিসংলাপে আল্লাহর আইন ও শরীয়তের নিবিড় প্রশংসাই রয়েছে। এই মদিনাবাসী যে সেই মদিনাবাসী নয়, সারা দুনিয়াবাসীই বটে, গানটি সুরের অদৃশ্য তন্তুজাল বিছিয়ে প্রত্যেক শ্রোতার মনে সে অনুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। যেন শ্রোতা নিজেই হয়ে যান মদিনাবাসী, এতদিন বর্বর বনবাসী সদৃশ ছিলেন যাঁরা, যাঁদের জীবনে আসমানী আইন নেমে এসেছে, এখন অন্ধকার বিশ্বমদিনায় যে আলো জ্বলে উঠলো, তা আর যেন নির্বাপিত না হয়– রসূল (সা) যেন তাদেরকে আর ছেড়ে না যান। এমনি একটি সঙ্গীতের রচয়িতাকে কেউ ভাবেন বেদআতগ্রস্ত, আর কেউ তাঁকে আউল-বাউল ও নেড়া গুরুরূপে আপন সমাজেরই একজন বানাতে চাইছেন। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লালন ফকির রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন কিন্তু কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যে তা কেউ জানতে চায় না।"[১২]

www.pathagar.com

যা হোক, সে অন্য প্রসঙ্গ। আসা যাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে। এ পর্যায়ে রসূল-প্রশস্তি বা নাত রচয়িতা হিসেবে প্রথমেই যে তিন পথিকৃৎ-এর নাম উচ্চারণ করতে হচ্ছে তাঁরা হচ্ছেন ঃ মীর মশাররফ হোসনে (১৮৪৭-১৯১১), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) এবং শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)। আধুনিক মুসলিম বাংলা গদ্যের জনক অভিধায় অভিষিক্ত মীর মশাররফ হোসেন মূলত গদ্য লেখক হলেও গদ্যে ও পদ্যে 'বাঙলা মৌলুদ শরীফ' (১৯০২), নামে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন। কায়কোবাদ লেখেন 'গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ' (১৯০৯) এবং মোজাম্মেল হক লেখেন 'হযরত মোহাম্মদ কাব্য' (১ম খণ্ড)। একই সময়ে শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৬৬) 'পরিত্রাণ' কাব্যও (১৯০৩) প্রকাশিত হয়। মীরের কিছু কিছু নাত আজও মিলাদ মাহফিলে গীত হয়। যেমন :

"তুমি হে এসলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নতশিরে তোমায় সেবি
মোহাম্মদ এয়া রাসূলুল্লাহ।

তুমি সত্য উদ্ধারিলে
মহা তত্ত্ব প্রকাশিলে
প্রভু বাণী শুনাইলে
মোহাম্মদ এয়া রাসূলুল্লাহ।"[১৩]

এ সময়ের উল্লেযোগ্য নাত রচয়িতাদের মধ্যে আরও আছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন, মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), খান বাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), মুন্সী আজহার আলী, ডা. সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯) প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ'র 'মেহেরুল এছলাম' (১৯০৪), শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৭), মোহাম্মদ দাদ আলীর 'আশেকে রসূল' (১৯০৮), তসলিমুদ্দীন আহমদের 'জন্মোৎসব' বা 'মৌলুদে নফীসা' (১৯১৫), মুন্সী আজহার আলীর 'সোনার খনি' এবং সৈয়দ আবুল হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদী শরীফ' (১৯২৪) প্রভৃতি সাহিত্য রসযুক্ত ধর্মীয় অনুসঙ্গ হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বটতলার বিপরীতে শালীন সাহিত্য হিসেবে প্রভূত ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে আমরা মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের দুটি সুবিখ্যাত রসূল প্রশস্তি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

(১) "গাওরে মোসলেমগণ, নবী-গুণ গাওরে
পরান ভরিয়া সবে ছাল্লেআলা গাওরে।
আপনা কালামে, নবীর সালামে, তাকিদ করেন বারী
কালেবেতে জান, কহিতে জবান, যে তক থাকে গো জারি।
যে বেশে যে ভাষে, যে দেশেতে যাওরে,

www.pathagar.com

গাও গাও গাও সবে ছাল্লেআলা গাওরে।"[১৪]

[মেহেরুল এছলাম] ॥ –মুন্সী মেহেরুল্লাহ

(২) "তিনি সদ্য আদি নূরী
উজলিছে স্বর্গপূরী
বাজাও আনন্দভেরী
মোহাম্মদ এয়া রাসূলুল্লাহ।"[১৫]

–শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন

বিশ শতকের যাত্রারম্ভে এ পরম্পরায় রসূল প্রশস্তি রচনায় এগিয়ে এসেছেন অন্যান্য মুসলিম কবিবৃন্দও। এক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) আবির্ভাব– বাংলা নাত-সাহিত্যে এক সুরময় অধ্যায়। ভক্তিমার্গের এক গীতল পৃথিবী রচনা করেছেন তিনি তাঁর নাত সমষ্টিতে। এ প্রসঙ্গে শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), কাজী গোলাম আকবর, মোহাম্মদ সুলতান, আজিজুর রহমান (১৯১৫-১৯৭৯), কাজী কাদের নওয়াজ, সুফিয়া কামাল প্রমুখের নামও স্মর্তব্য।

এ পর্বে 'হৈ হৈ রৈ রৈ' বাধিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব। নাত-সাহিত্যে তিনি নিয়ে এলেন এক নতুন উদ্দীপনা। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়, "নজরুল কেবল এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী-মুসলমান কবিই নন; রসূল-প্রশস্তি রচয়িতা হিসেবেও এই সময়কালের তিনি শ্রেষ্ঠ। কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাবের পরের বছরই অর্থাৎ ১৯২০ সালে নজরুল লেখেন– 'খেয়াপারের তরণী', যেখানে রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাঁর এমন শ্রদ্ধা নিবেদন ঃ 'নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;/কাণ্ডারী আহমদ, তরী-ভরা পাথেয়'।... কয়েক মাসের মধ্যেই নজরুল লেখেন– 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব) ('মোসলেম ভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৭)। ঠিক এক বছর পরে লিখেছেন– 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (তিরোভাব) ('মোসলেম ভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৮)। তিনটি কবিতাই স্থান পেলো কবির প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) ও তৃতীয় কবিতা গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪)-তে।... উত্তরকালে নজরুল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন; কিন্তু 'মরুভাস্কর' নামের সেই কাব্যগ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, ১৯৫০ সালে তা প্রকাশিত হয় অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই।... তবে নজরুলের রসূল-প্রশস্তি চূড়া স্পর্শ করেছে তাঁর রচিত শ-খানেক 'নাত'-এ। এর প্রত্যেকটি এক-একটি হীরকখণ্ড। কয়েকশো বছর ধরে খেলা হলেও বাংলা নাতে 'মুসলমানী ঢং' নজরুল যেভাবে এনেছেন, আর কারো দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। ইসলামী সাহিত্যকে নজরুল বাংলা সাহিত্যের আবশ্যিক অংশ করে তুলেছেন।"[১৬]

নজরুল ইসলামের উল্লাস আর আনন্দধ্বনির সূর-মূর্ছনার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই

www.pathagar.com

অপরিহার্য হিসেবে বাংলা কবিতার 'হাস্‌সান' হয়ে এলেন কবি ফররুখ আহমদ। তিনি নবী-জীবনী নিয়ে রচনা করলেন পৃথক কবিতা-গ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২)। রসূল (সা)-এর বিপ্লবী চেতনায় স্নাত এ কাব্য-গ্রন্থ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় হাজার বছরের 'রসূল-প্রশস্তি'র সমৃদ্ধ ধারাটিকে। যা এখন ধারাবাহিক, অবিরল এবং ক্লান্তি হীন। তবুও বলতে দ্বিধা নেই, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এ ধারাটি আলোর অভিঘাতের অপেক্ষায় আড়ালেই পড়ে ছিল কিন্তু মহাকালের ধ্বনিপুঞ্জকে কোন কিছুই বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

দুই.

মুক্তিযুদ্ধোত্তর উত্তাল-তরঙ্গবাহিত সত্তর দশকের পর আমাদের কাব্যাঙ্গনে লোকচক্ষুর প্রায় অলক্ষ্যে একটি পালাবদল ঘটতে শুরু করে। পাশ্চাত্যের কাব্যাদর্শের অনুসরণ-অনুকরণে যে কাব্যচর্চা চল্লিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল, তাতে পশ্চিমের কাব্যাদর্শের সাথে আমাদের মেলবন্ধন ঘটলেও আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাদী চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে যাই। ঐতিহ্য এবং আদর্শবাদিতার যে রেনেসাঁ বাংলা কবিতার বিকাশকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলো চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের সাধনায়; সুকুমার সেন যাকে "অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য ধারা" বলে বিশেষিত করেছেন এবং এ ধারার সাহিত্য "একদা বাঙালী জনগণের একটা বৃহৎ অংশের রস-পিপাসা মেটাত" বলে নন-আবিষ্কারে পরিতৃপ্ত হয়েছেন,[১৭] সে ধারাটি এর ফলে ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে হীরক-দিগন্তের উন্মোচন ঘটালেও; "বাঙালী মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত ধ্যানের জগতকে বাণীরূপ দেয়ায় নজরুল ইসলামের একক প্রয়াসের এ সাফল্য বিস্ময়কর" হলেও এবং শতাব্দীর ঘুমভাঙা মহাজাগরণের অমর নকীবের ভূমিকা পালনে ত্রিশোত্তর যুগে কবি ফররুখ আহমদ ও তাঁর কনিষ্ঠতম কবিবন্ধুরাসহ চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের আদর্শবাদী কবিরা নজরুলের অনুগামী হলেও, ঐতিহ্যসন্ধানী আদর্শবাদিতার এ যুগান্ত কারী অর্জন স্বল্পকালের জন্য আড়ালেই পড়ে থাকে। পাশ্চাত্যের গললগ্ন আধুনিক যুগ আমাদের অনেক কিছুর মতোই নিজস্ব প্রতিবিম্বকেও আড়াল করে রেখেছিল দীর্ঘ তিন-তিনটি দশক পর্যন্ত।

তৃতীয় বিশ্বের বিকাশের বাস্তবতা সত্তরের দশকে যখন বাস্তব রূপ পরিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত তখন এ বাস্তবতাকে অনেকেই 'ইউটোপিয়া' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আর তখনই এ বাস্তবতার ধ্যানমুগ্ধ অগ্রজ কবি আফজাল চৌধুরী একে অঙ্কন করেন এভাবেঃ

"রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের ঐতিহাসিক লগ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে। ইসলামের বিপ্লবী চেতনা ও তার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনরূপে অবশিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে এখন মোকাবিলায় অবতীর্ণ। তাই সচেতন মুসলিম নবীন কাব্যকলা নতুন

www.pathagar.com

নিরীক্ষায় নিয়োজিত এবং প্রাক্তন রোমান্টিক, প্রতীকী ও পুনর্জাগরণবাদী কাব্যচর্চার ফলশ্রুতি ভোগে তৎপর। সারা মুসলিম জাহানে এই সামান্য লক্ষণ আজ পরিস্ফুট এবং আমাদের দেশে তার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। ইসলাম ও কুফরের প্রকট দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং আঘাতে ও অন্তর্ঘাতে বিব্রত মুসলিম জনখণ্ডগুলোয় স্নায়ুযুদ্ধ সশস্ত্র রূপ নিচ্ছে। এই কঠোর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নিকট প্রতীকী কাব্যকলার নাজুক মিনারে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয়ে কাব্য সাধনার সুদিন আজ অন্তর্হিত।"[১৮]

সময়ের পরিবর্তনে মাত্র এক দশকের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবতা আরও প্রকটিত হয়েছে এবং আশির দশকের শেষাংশে দ্বিতীয় দুনিয়ার পতন (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে কম্যুনিজমের পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ) তৃতীয় দুনিয়াকে আরও অগ্রগামী করে দ্বিতীয় দুনিয়ার ক্রমধারায় প্রতিস্থাপিত করেছে। পরিবর্তিত এ বাস্তবতাও আমাদের কাছে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রথম দুনিয়া হিসেবে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন একদিকে একক আন্তর্জাতিক মাতব্বরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বব্যাপী 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে মুক্তিকামী মানুষের ত্রাস কুখ্যাত সপ্তম নৌবহরের একটিকে আজ এ মহাসমুদ্রে ছাড়ছে, তো কাল আরেকটিকে অন্য বন্দরে ভিড়াচ্ছে। আপরদিকে তার ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় দোসরদের নিয়ে 'পুঁজিবাদ' শব্দটিকে আড়ালে রেখে অত্যন্ত কৌশলে প্রতিস্থাপিত নতুন দ্বিতীয় দুনিয়ার সর্বত্র 'বাজার অর্থনীতি'র নামে নব্য-কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবং সবশেষে বিশ্বের কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষের বাদ-প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত নগ্নভাবে পেশী শক্তির জোরে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র দখল করতেও তার দ্বিধা হয়নি। তবু, এ দ্বি-মুখী সংঘাতের মধ্য দিয়েও দ্বিতীয় দুনিয়ারূপে আবির্ভূত মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের পুনরুত্থানের স্পষ্ট আলামত হিসেবে আযাদী ও স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আলোকে নিজেদের জীবনকে পুনর্নির্মাণের একটি প্রবল আকুতি দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দুনিয়া তথা বিকল্প বিশ্ব-ভাবনা হিসেবে ইসলামী দুনিয়ার এ বাস্তবতা আমাদের কবিদেরও আলোড়িত করছে। এবং এ আলোড়ন স্পন্দিত হতে থাকে বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শুরু থেকে।

বিশ্বাসের সৌন্দর্যকে অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়ে একদিন যাঁরা পাশ্চাত্যের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবুকতায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন; কিংবা অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কলমকে কাস্তে আর হাতুড়ির বিকল্প চিন্তা করে কৃত্রিম শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের কারও কারও প্রত্যাবর্তন আমাদের এক ঝাঁক কবিকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। দেশজুড়েও স্বদেশভাবনার সাথে ঐতিহ্য অনুসন্ধানের অনুকূল হাওয়া বইতে থাকে। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের এ অনুকূল হাওয়ায় পাল জুড়ে দেয় আদর্শবাদিতা। আমাদের কবিকূল সত্যকে আবিষ্কারের আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়ে সমর্পিত হন বিশ্বাসে; আত্মমগ্ন হয়ে ওঠেন নিজস্ব পরিচয়ের কাল-পরিধিতে; উপলব্ধির নিগূঢ় তাৎপর্যে পুনঃস্থাপিত করেন আপন বিশ্বাসকে।

www.pathagar.com

যেহেতু আমাদের বিশ্বাসের প্রাণ-পুরুষ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ– সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা), সেহেতু আমাদের নতুন কাব্য-ভাবনারও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকাগুলোতে– যেখানে কবিতা থাকতো প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে কবিতা হয়ে ওঠে সূচীপত্রের লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়। সীরাতুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায়ও 'নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর' এক নতুন অনুসঙ্গ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবিরা রসূল (সা)-কে নিবেদিত কবিতা রচনা ও পাঠ করে এ ধারার সঙ্গে যেমন নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেন, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবিতার যে দূরত্ব রচিত হয়েছিলো তাও বিদূরিত হতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ক্রমে এগিয়ে আসে ইসলামিক একাডেমী, বিপরীত উচ্চারণ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্ট (সিলেট), ঐতিহ্য সংসদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। এক পর্যায়ে শুধুমাত্র রসূল (সা)-কে নিবেদিত কবিতার দু'-আড়াই ফর্মার ছোট ছোট সংকলনও প্রকাশিত হতে থাকে। এ সকল কর্মকাণ্ড বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে সংগীতের আদলে 'নাত' রচনার যে মরমী প্রক্রিয়া চালু ছিল তাকে প্রসারিত করে 'রসূল-প্রশস্তি' নামক কবিতার একটি পৃথক, সুপরিসর ও জ্ঞানাত্মক দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

স্মরণযোগ্য যে, আশির দশকের শুরুতে এ প্রয়াসকে 'ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি' শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ষাটের দশকের আদর্শবাদী কবি আফজাল চৌধুরী একটি তাত্ত্বিক রূপ দান করেন এবং রসূল প্রশস্তির সুবৃহৎ আঙিনার সাথে বিশ্ব সাহিত্যসহ সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে যুক্ত করে এ ভবিষ্যতবাণীও উচ্চারণ করেন যে, "এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন পূর্ণ একাত্মতায়, সৈনিক নবী কিংবা রক্তাপ্লুত ও আহত নবীর তাওয়াজ্জুহ আগামী দিনের সৈনিক কবির অন্তরাত্মাকেও শাসন করবে।"[১৯] মাত্র এক দশকের ব্যবধানে কবির এ ভবিষ্যতবাণী বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে রসূল (সা)কে নিবেদিত কবিতার দু'দুটি বৃহৎ আকারের সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ এ বাস্তবতারই উজ্জ্বল প্রমাণ। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫-এ ইসলামিক একাডেমী থেকে ইশারফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রসূল (সা)-কে নিবেদিত কবিতা'[২০] এবং জুলাই ১৯৯৬-এ প্রীতি প্রকাশন থেকে আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত 'রাসূলের (সা) শানে কবিতা'র[২১] সূচীপত্র এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিশ শতকের শেষ লগ্নের সর্বশেষ বাঙালী মুসলমান কবিও এ ধ্বনিপুঞ্জে নিদেনপক্ষে একটি কবিতার মাধ্যমে হলেও আত্মার স্পর্শ রেখে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিলেন। এবং এ উন্মুখতা লক্ষ্য করে এ আশা পোষণ করা অমূলক হবে না যে, আগামী দিনের বাংলা ভাষাভাষী সকল কবির সমগ্র কাব্য–ভাবনাকে শাসন করবে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহ। ◆

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬৪, ৭০
২. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ-ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, *অগ্রপথিক সংকলন :* ভাষা আন্দোলন, মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৮, ৪৩-৪৪, ৫১
৩. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ১৫
৪. আশকার ইবনে শাইখ, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩০-৩১
৫. মুহাম্মদ আবূ তালিব (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যে শূন্য পুরাণ : একটি ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ, অচিন পাখি সংগ্রহশালা, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ২
৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য মুসলমান, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮. পৃ. ৯
৭. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা), তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৮
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ১৯-২০
৯. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬
১০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
১১. আফজাল চৌধুরী, ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৯
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২
১৩. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত), রাসূলের শানে কবিতা, প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১
১৫. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬০
১৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
১৭. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
১৮. আফজাল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
১৯. আফজাল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২০. ইশারফ হোসেন (সম্পাদিত), রসূল (সা)-কে নিবেদিত কবিতা, ইসলামিক একাডেমী (দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা, ১৯৯৫, সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।
২১. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত), রাসূলের (সা) শানে কবিতা, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. পাঁচ-চৌদ্দ, সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

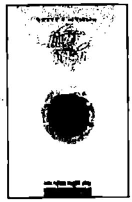

কেরামতী

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

দিয়া যান ভাই, দিয়া যান। এই আতুর ল্যাংড়ারে কিছু দিয়া যান। রবিউল আউয়াল মাস। বড়ই ফজিলতের মাস।

কত টাকা কত পয়সা অকারণে চলে যায়,
গরীব জনে দান করিলে আখেরাতে পাওয়া যায়।

গুলশান বাড্ডা জনাকীর্ন লিংক রোডের পাশে বসে নিয়মিত ভিক্ষা করে এক ভিক্ষুক। নাজিমুদ্দিন সাহেব রোজ এই পথে গাড়ি করে তার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করেন। ভিখারীর এই সুললিত সুর প্রায়ই কানে আসে। আজ মহাখালী রেলক্রসিং পার হতেই কানে বাজল সেই স্বর। কত পয়সা কতখানে অকারণে চলে যায়।

রবিউল আউয়ালের চাঁদ উঠার ঘোষণার পর নাজিমুউদ্দিন সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই মাসে তিনি ফকির ভিক্ষুকদের প্রচুর দান খয়রাত করবেন এবং অনেকের সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিবেন।

গাড়ি থেকে নেমে তিনি ভিক্ষুকটির সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন।

- ছেলামালাইকুম স্যার, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিয়া যান স্যার।
  আল্লাহ আফনেরে অনেক দিব স্যার।
- তুমি এতদিন গুলশান বাড্ডা রোডের পাশে বসতে না?
- জ্বী স্যার, বইতাম স্যার।
- ওখানেতো রোজগার ভালই হওয়া কথা। জায়গা বদল করেছ কেন?
- ঐ জাগা মাইয়ার জামাইরে যৌতুক দিয়া দিছি।
- মজার কথা। তোমাদের বিয়ে শাদীতেও যৌতুক দেয়া নেয়া হয় নাকি?
- অইব না কেন? আমার বোবা মাইয়ারে এমনি এমনি ভাত খাওয়াইব কোন দুঃখে? যৌতুক দিয়া এক কানার লগে বিয়া পড়ায়া দিছি।

www.pathagar.com

- গুলশানের ঐ জায়গা তুমি কি কিনে নিয়েছিলে?
- না স্যার। অনেক দিন ধইরা বইতে বইতে দহল অইয়া গেছে। জাগা জমিন অহন যার দহলে থাহে, হেই মালিক।
- তা বুঝলাম। তবে তোমার জামাইকে দিলে কিভাবে? কাগজে লিখে টিপ সই করে দিয়েছ?
- আরে না স্যার। আতে ধইরা বওয়াইয়া দিয়া দহল বুঝায়া দিছি।

বাড়ি ফেরার পথে আগের জায়গায় দেখা হয় সেই কানা জামাইর সাথে। সুন্দর সুর করে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। তবে শ্বশুরের সুরের থেকে ভিন্ন।

বাড়ি বাড়ি কররে ভাই, এই বাড়িতো তোমার না
কবর হইবো আসল বাড়ি, ভাইবা কেন দেখ না?
দানকারীদের পিতা-মাতা সুখে রাইখো কবরে
নূরের টুপি মাথায় দিয়া উঠাইও রোজ হাশরে।

গাড়ী থেকে নেমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নাজিমুদ্দিন সাহেব তার কৌশল লক্ষ করতে থাকে। লোকটা এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, সে অন্ধ। কিছুই দেখেনা। পিঠে কারো হস্ত স্পর্শ অনুভব করে চমকে পিছনে তাকায় নাজিমুদ্দিন সাহেব। মাস্টার হারুন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

- আরে চেয়ারম্যান সাহেব। এখানে কি করছেন?
- এই ভিক্ষুকদের জীবন সম্বন্ধে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছি।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে হলে তো আপনাকেও ভিক্ষুক সাজতে হবে।
- অত বাস্তবের দরকার নাই। কাছে থেকে যতদূর বুঝা যায়।
- তা এতদিনে কতদূর অভিজ্ঞতা হল?
- আচ্ছা, আপনিতো কোরআন হাদিছ নিয়ে বেশ চিন্তা-গবেষণা করেন? আমাকে এই বিষয়টা একটু বুঝাতে পারেন?
- কোন বিষয়?
- এই যে ভিক্ষুক সমাজ। অন্ধ, বোবা, কানা, খোড়া, কত বিচিত্র ধরনের বিকলাঙ্গ মানুষ। আল্লাহতো ইচ্ছে করলেই তাদেরকে আমাদের মত করে বানাতে পারতেন, তাদেরকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কোন অপরাধে?
- কোন দিন মঞ্চ নাটক বা যাত্রা দেখেছেন?
- অনেক দেখেছি। এখনো দেখি। বেইলী রোডে প্রায়ই যাতায়াত হয়।
- যাত্রা মঞ্চে কেউ মহারাজ, কেউ মন্ত্রী, কেউ চাকর, কেউ অন্ধ-ভিক্ষুক সেজে অভিনয় করে। অন্ধ-ভিক্ষুক যদি বলে, আমি ভিক্ষুক হব কোন দুঃখে? আমি কি মহারাজার ডায়লগ পারিনা? তবে কি নাটক, সিনেমা, যাত্রা, এসব চলবে? অপেরা

www.pathagar.com

পার্টির সবাই মহারাজা ও মন্ত্রী হতে চাইলে অবস্থা কেমন হবে?

উদাহারণ ভালই দিয়েছেন। কিন্তু ঠিকমত ফিট করতে পারছি না। নাটক যাত্রা মাত্র এক রাতের ব্যাপার। এক রাতের মহারাজ ও কানা ফকির। সকাল হলেই যে যার পজিশনে।

সবসময় সবকিছু এক রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। অভিনেতারা অনেক সময় সেরা অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হন। গোল্ড ম্যাডেল পান। ভিক্ষুকের অভিনয় করে যদি কেউ গোল্ড ম্যাডেল পায়, তবে কি সে মহারাজের রোল পায়নি বলে কখনো আফছোস করবে? মহারাজ হয়েও যদি ঠিক মত রোল প্লে করতে না পেরে দর্শকদের জুতা বা পঁচা ডিমের শিকার হন, তবে এমন মহারাজ হয়ে লাভ আছে?

তার মানে আপনি এই দুনিয়াটাকে নাটকের মঞ্চ মনে করতেছেন?

এটা আমার কথা নয়। আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন :

'জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, আমোদ-ফুর্তি, ধনসম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা অর্জনের ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতা।' মহাকালের দীর্ঘ পরিক্রমায় ষাট-সত্তর বছরের হায়াত কয়েক ঘন্টার যাত্রাপালার মতই। এখানকার কানা, খোড়া, অন্ধ, বোবা-ভিক্ষুকরা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত-অসীম জীবনে যদি আরাম আয়েশে থাকতে পারে, দুনিয়ায় কিছুদিন কষ্ট করেছে বলে একটুও আফসোস করবেনা।

নাজিমুদ্দিন সাহেব লোকাল মসজিদ কমিটির সভাপতি। শুধুমাত্র শুক্রবার জুমার নামায পড়েন। বৈঠকের সময় নামাজের টাইম হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে ওয়াক্তীয় নামাজও পড়েন।

মাস্টার হারুন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

- বেনামাজী লোক কি মসজিদ কমিটির সভাপতি হতে পারে?
- সভাপতিতো আর ইমামতি করবেন না। সভাপতির কাজ মসজিদের উন্নয়ন- মূলক কাজ করা। নামায না পড়লেও কাজ ঠেকে থাকবেনা।
- কথাটা ঠিক বলেন নাই। আল্লাহ্ পাক বলেছেন : 'মসজিদের কর্তৃত্ব করার অধিকার তাদেরই যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে ও আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা।
- আল্লাহর নবীর মসজিদের সাথে আমাদের এই মহল্লার মসজিদের তুলনা চলেনা। আমাদের দেশে হিন্দু লোকও মসজিদ কমিটির সভাপতি হয়েছিল এক সময়। পয়সাওয়ালা-দাপটওয়ালা লোক কমিটিতে না থাকলে মসজিদের উন্নয়ন হবে না। ঘামে ভিজে, রোদে পুড়ে নামায পড়তে হবে।
- না হয় পড়লাম। আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবারা খেজুর পাতায় মসজিদে নামায পড়ে নাই?
- তখন পড়েছে। এখন মক্কা মদীনার সব মসজিদ এয়ারকন্ডিশনড। বেনামাজীদের

www.pathagar.com

টাকায়ই মসজিদের বিল্ডিং হয় এখন।

- একজন ইমাম হিসেবে আপনার দায়িত্ব কুরআন, হাদিসের কথাগুলো মানুষকে শুনানো। কেউ না মানলে সেটা তার ব্যাপার।
- আসলে আমি নামেই ইমাম্ কামের বেলা কমিটির গোলাম। ইমামতির কাজে কেমন মজা, যদি দেখতে চান, আজকের দিনটা আমার সাথে একটু ঘুরেন।
- আজকে আপনার ডিউটি কি কি?

সীরাত মাহফিলের জন্য চাঁদা তোলা, মিষ্টির অর্ডার দেয়া, এশার নামাজের পর রাসূলের জীবনী-আলোচনা করা। একটু এদিকে সেদিক হলেই কমিটি রিমান্ডে নিয়ে যাবে।

-ঠিক আছে। আমি মাহফিলে থাকব।

নিমিয়ত নামাযের লোক হয় সাড়ে তিন কাতার। আজ মসজিদ ও বারান্দা ভর্তি। খুবই জজবা নিয়ে ইমাম সাহেব বয়ান শুরু করেছেন। আলোচনার বিষয়, উম্মতের জন্য নবীজী কত কষ্ট করেছেন।

কাফেররা নামাজের সময় নবীর পিঠে উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। গলায় চাদর পেঁচিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে। তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করেছে। আল্লাহর নবী সবসময় দোয়া করেছে, 'আমার কষ্টের বিনিময়ে আমার উম্মতকে সুখে রেখ।' এমনকি মৃত্যুর সময়ও আল্লাহর নবী বলেছিলেন, 'সব কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও। তবু আমার উম্মতকে মৃত্যু যন্ত্রণা দিওনা।'

একেতো নবীর দুঃখ কষ্টের বর্ণনা। তার উপর ইমামের সুললিত করুণ সুর। সারা মসজিদ জুড়ে কান্নার রোল। মুনাজাতের সময় তো মহা কান্না। মাস্টার হারুন সাহেবের মনে হচ্ছে, মানুষগুলো একেবারে নবীপ্রেমে দেওয়ানা হয়ে গেছে। এরা আর কোনদিন কোন অন্যায় কাজ করবেনা।

মুনাজাত শেষ করে ইমাম সাহেব ঘোষণা দিলেন,

- আপনারা আর একটু ধৈর্য্য ধরে বসুন। তাবারক নিয়ে যান।
- মুয়াজ্জিন জিলাপীর গামলা নিয়ে মুসুল্লীদের ভিতর ঢুকলেন। সমবেত মুসল্লীরা লোকের সংখ্যা ও মিষ্টির পরিমান দেখে বুঝতে পারলেন, একটু প্রতিযোগিতা না করলে তাবারক পাওয়া যাবেনা।

অনেক গুলো হাত এক সাথে এগিয়ে আসে। মুয়াজ্জিন সাধ্যমত দিতে থাকে। অধৈর্য্য হয়ে একজন দাঁড়িয়ে যায়। সাথে সাথে আরো কয়জন দাঁড়ায়। একজন নিজ হাতে গামলা থেকে দুই পিছ তুলে নেয়। সাথে সাথে কয়েকটি হাত গামলায় ঢুকে। একজন দূর থেকে গামলা ধরে টান দেয়। তা দেখে আর একজন পাশ থেকে টেনে ধরে। শুরু হয় গামলা ধরে টানাটানি।

এক পর্যায়ে হাত ফসকে গামলা উল্টে পরে মেঝের উপর। মুসুল্লীরা মেঝে থেকে জিলাপী কুড়াতে থাকে। এখন আর জনপ্রতি দুই পিছ বরাদ্দ নেই। যে যত পারে নিতে

www.pathagar.com

পারে। ধাক্কার চোটে একজন পা স্লিপ করে হুমড়ি খেয়ে পরে। ঠেলাঠেলী ধাক্কা ধাক্কিতে মিষ্টির রসে সারা মসজিদ লেপটে যায়।

ঝড় শেষ হলে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়। একসময় মসজিদের হট্টগোলও শান্ত হয়ে আসে। সবাই চলে যায় যে যার ঘরে। ইমাম সাহেব, মসজিদ কমিটির কিছু সদস্য ও মাস্টার হারুন দাঁড়িয়ে আছে এ পাশে। হারুন সাহেব জিজ্ঞেস করেন,

- কিছুক্ষণ আগে যে লোকগুলো আল্লাহর দরবারে হাত তুলে হাউ মাউ করে কেঁদেছে এবং একটু পরে যারা এক পিছ জিলাপীর জন্য সারা মসজিদ লেপটায়ে ফেলেছে, তারা কি একই লোক?
- তবে কি মিষ্টি খাওয়ার জন্য আর একদল লোক এসেছে?
- নবীর প্রেমে বেহুঁশ একদল লোক দুই মিনিটের ব্যবধানে একপিছ জিলাপীর জন্য এমন কাজ করতে পারে? হুজুর, আপনি দুই ঘন্টা ওয়াজ করে এদের কি শিখালেন?
- আমার বলা আমি বলেছি। এরা এরকম করলে আমি কি করব?
- তিহাসে পড়েছি, আল্লাহর নবী এক অসভ্য, বর্বর , উচ্ছশৃঙ্খল জাতিকে সভ্য ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিনত করেছিলেন।
- শুধু আপনি পড়বেন কেন? আমারাও পড়েছি।
- এই মহল্লার মানুষ গুলো কি মক্কার সেই বর্বর লোকদের চেয়ে বেশী অসভ্য? দুই ঘন্টা নবীর জীবনী শুনে একটু ভদ্রতাও শিখতে পারলনা? সব দোষ কি ওদের? না আমাদেরও কিছু ভুল আছে?
- কিচ্ছু বুঝি না ভাই। দুনিয়া ভেজালে ভরা। আমাদের ওয়াজেও ভেজাল।
- সব জায়গায় ভেজাল থাকলেও আল্লাহর কুরআন ও নবীর হাদিস নির্ভেজাল। এই নির্ভেজাল জিনিস দুইটাও কি একটু কাজে লাগানো যায় না। আলো জ্বালালে অন্ধকার চলে যায়। এই কথা কি কোনদিন মিথ্যা হতে পারে? আমাদের সমাজে আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি আছে কিভাবে? এত মসজিদ, এত মাদ্রাসা, এত ওয়াজ, এত মিলাদ! তার পাশাপাশি চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ। আমরা বার বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। সাথে সাথে আমরা পৃথিবীর সেরা মুসলমানও। এসব কি কোন ফর্মুলায় পড়ে?

নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে ফেলে মাস্টার হারুন।
সভাপতি সাহেব বললেন,

- আজকে ইমাম সাহেবের পরিবর্তে আপনার ওয়াজ দরকার ছিল।
- ঠিক আছে, অনুষ্ঠান আর একটা করেন। তবে একটু অন্য রকম করেন। মসজিদের সামনের মাঠে বসার ব্যবস্থা করেন। এলাকার চোর-চোট্টা, গুন্ডা-বদমাস, তাড়ীখোর-মদখোর সবাইকে দাওয়াত দেন। আপনারা শুধু ধরে হাজির করেন। কথা শোনানোর দায়িত্ব আমার।

www.pathagar.com

মসজিদ কমিটির অনেক সদস্যই লোকাল পলিটিক্স এর সাথে জড়িত। অনেকে জড়িত নানা অবৈধ ব্যাবসায়। এসব কাজে সহযোগিতার জন্য ক্যাডার বাহিনীও আছে তাদের। কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রচেষ্টায় অনেকেই হাজির হয় পরবর্তী সীরাত মাহফিলে। বক্তৃতার শুরুতেই মাস্টার হারুন ভয়ানক চমক লাগিয়ে দেন।

- এক পিছ জিলাপীর জন্য যারা মসজিদ লেপটিয়ে ফেলে, কুরআন, হাদিস ও নবীর জীবনী তাদের শুনিয়ে বেশী লাভ নেই। ইসলাম সাহসী মানুষের ধর্ম। কাপুরুষদের জন্য কুরআন নাজিল হয়নি। আল্লাহর নবী সাহসী যুবকদের খুব ভালবাসতেন।

এক ক্যাডার পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন–

- আমাগো মতন মাস্তানদের সাথে কেমন করতেন?
- তোমরা আর কত বড় মাস্তান? তোমাদের চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশী মাস্তান ছিল মক্কার লোকেরা। সেই মাস্তানদের বড় ওস্তাদ ওমর আল্লাহর নবীর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী হয়েছিলেন।
- আলেফ লায়ালার মত মজার ঘটনা কেমনে অইছিল?
- খুব সহজেই। তিনি তার শক্তি ও সাহস মাস্তানীর পরিবর্তে ভাল কাজে ব্যবহার করা শুরু করলেন।
- ভালা কাজতো আমরা পারিনা হুজুর। আমরা পারি মাইনসেরে ডর দেহায়া মোডা মোডা চান্দা উডাইতে।
- আমাদের মত কাপুরুষরা কিছুই পারিনা। পারি কেবল মিলাদের জিলাপী নিয়া কাড়াকাড়ি করতে। তোমরা ভয় না দেখিয়ে সুন্দর করে বলবে 'আল্লাহ আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছে, আমাদের কিছু দেন। আমরা ময়লা পানি জমে থাকা রাস্তায় মাটি ফেলব। জ্যাম হয়ে উপচে পড়া ড্রেনগুলো পরিষ্কার করব। রাস্তার পাশে গাছ লাগাব। চায়ের দোকানগুলোতে টেবিলের উপর ইসলামী বই রাখব। লোকেরা চা খেতে খেতে বই পড়বে। আপনি কিয়ামত পর্যন্ত ছোয়াব পেতে থাকবেন।
- হুজুর, কতা ভালাই কইছেন। এইসব পাবলিক ফাংশনে মজা আছে। মাইনসেও ভালা কইব। কিন্তু আমাগো পেট চলবে কেমনে?
- এত সুন্দর কইরা কোন হুজুর আমাগো বুঝায় নাই। মাস্তানী, চান্দাবাজী, পুলিশের ডরে পালায়া থাহা আর ভালা লাগেনা। যা করে আল্লায়, এইবার ভালা অইয়া যামু। যারা আমাগো আকাম কুকামের অডার দেয়, তাগো কতা আর হুনুম না। বেশী বড়াবাড়ি করলে ফুডা কইরা ফালামু।
- এইতো হযরত ওমরের মতন কথা। তিনিও তলোয়ার উঁচু করে বলেছিলেন, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে জানে মেরে ফেলব। তোমরাও যদি এমন কিছু কাজ করতে পার, হযরত ওমরের সাথে বেহেস্তে যাবে।
- কিযে কন হুজুর। আপনেগো মতন হুজুর আর পীর সাবগো বাদ দিয়া আমাগো

www.pathagar.com

হযরত ওমরের লগে বেহেস্তে রাখবো? লাত্তি মাইরা কোনডাই ফালায়া দেয় ঠিক নাই।

- আমি কুরআন হাদিসের দলিল ছাড়া কথা বলিনা। আল্লাহর নবী বলেছেন, 'বহু আলেম, দাতা ও শহীদকে আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কারণ তারা বুলবুলে ইসলাম খেতাব পাওয়ার জন্য আলেম হয়েছে, স্মৃতি ফলকে নাম লেখার জন্য ডোনেশন দিয়েছে, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক সনদের জন্য যুদ্ধ করেছে।
- হুজুর, এতদিন ভাবছিলাম, জাহান্নামে তো যাওন লাগবই। আকাম-কুকাম কম কইরা লাভ কি? জন্মের মতন কইরা লই। আপনে হুজুর মহাচিন্তায় ফালায় দিছেন।
- আমি আমার কথা বলি নাই। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'আকাম-কুকাম যতই করে থাক, আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। সৎ পথে ফিরে আস। অতীতের সব পাপ মাফ হয়ে যাবে।
- হুজুর এইবার ঠিক অইয়া যামু।
- শুধু মুখে বললে হবেনা। কাজে প্রমাণ দেখাতে হবে। আজ সবাই জামাতে নামায পড়ে যাবে।
- আজ থাক হুজুর। কাপড়-চোপড় ঠিক কইরা লই। ভালা মতন নামায পড়ুম।
- কথাটা ভুল। কাপড়ে নামায ঠিক করেনা। নামাযই কাপড় ঠিক করে। আজ যা পরেছ, তা নিয়েই নামায পড়। দেখবে আগামীতে অতি সহজেই কাপড় ঠিক হয়ে গেছে।

আজও মাহফিল শেষে জিলাপী বিতরণ করে মুয়াজ্জিন সাহেব। কিন্তু কোন হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি নেই।

নাজিম উদ্দিন সাহেব বললেন,

- কেরামতি ভালই দেখিয়েছেন মাস্টার সাহেব।
- আসলে আল্লাহর নবী এভাবেই কেরামতি দেখাতে শিখিয়েছেন। পানির উপর দিয়ে হাঁটা, বাতাসের উপর উড়ে বেড়ানো, ফু দিয়ে আগুন জ্বালানো কোন কেরামতি নয়। উচ্ছৃঙ্খল জনগণকে ভদ্র ও সুশৃঙ্খল করা সবচেয়ে বড় কেরামতি। ◆

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন, প্রিয়জনকে বই উপহার দিন

আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী মণীষী
আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর

বিশ্বসেরা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' ও সীরাতে সরওয়ারে আলমসহ

ইসলামের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের
সকল দিক ও বিভাগের উপর লেখা

বইগুলো পড়ুন

ইসলামকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিন

ঃ যোগাযোগ করুন ঃ

আধুনিক প্রকাশনী

৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১৫১৯১
১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

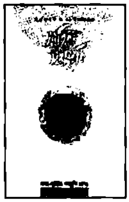

শিশু-কিশোর ও রাসূল (সা)

নাসির হেলাল

রাসূল (সা)-ই ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। মানবতার পথ নির্দেশের জন্য তিনি তাঁর ৬৩ বছর জীবনে প্রতি পদে পদে রেখে গেছেন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সকল স্তরের মানুষের জন্য তিনি আদর্শ হিসেবে নিজকে উপস্থাপন করেছেন। অতি ক্ষুদ্র যে শিশু সেও তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। শিশুরাই যে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের কর্ণধার তা তিনি সকলের চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) ব্যতীত সকল মানুষই একদিন না একদিন শিশু ছিল, কিশোর ছিল। অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শিশুকাল অবধারিত এবং আগামী দিনের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তার পরিচর্যা আবশ্যক। এই জন্য কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন–

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'।

হ্যাঁ! রাসূল (সা) বুঝে শুনেই এ ঘুমন্ত পিতার পরিচর্যা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা যারা রাসূলের (সা) অনুসারী হিসেবে দাবীদার তাদের অনেকেই কিন্তু শিশু-কিশোরদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য করি না। এমনকি মসজিদের মত পবিত্র স্থানে নামায আদায়ের জন্য আগত শিশু-কিশোরদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করি। কোন শিশু বা কিশোর যদি ঘটনাক্রমে মসজিদে নামাজ পড়তে এসে কাতারের মাঝে এসে দাঁড়ায়, তবে আমরা তাকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কাতারের এক পাশে, অথবা সবার শেষে পেছনে পাঠিয়ে না দিতে পারলে স্বস্তি পাই না। অথচ আল্লাহর রাসূলের আচরণ ছিল ঠিক এর বিপরীত। রাসূল (সা) বলেছেন, "যারা আমাদের ছোটাদেরকে আদর করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।"

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "ধন-ঐশ্বর্য ও শিশু সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা"। (১৮ : ৪৬)

রাসূল (সা) বলেছেন– "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (স্বভাব)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে, পরবর্তীতে তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে"। (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, পিতা-মাতা তথা পরিবেশ শিশুকে পথভ্রষ্ট করে। এ জন্য

www.pathagar.com

ছোটদের লালন-পালনসহ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতাসহ গার্জিয়ানদের উপর বর্তায়। আল্লাহপ্রদত্ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ আমানতের মন-মগজ, আদব-কায়দা, চলা-ফেরা, চরিত্র-অভ্যাস ইত্যাদি সঠিকভাবে, সুচারুরূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজনসহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালকদের দায়িত্ব রয়েছে। শিশুর জন্মের পর থেকেই যে রাসূল (সা) শিশুর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়– জন্মের পূর্ব থেকেই তার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

"এদের মধ্যে যে ধর্মভীরু তাকেই যেন অগ্রাধিকার দাও, তোমার হাতে মাটি পড়ুক" (সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২)। অর্থাৎ সুচিন্তিতভাবে, বুঝে শুনে বিয়ে করার কথা এখানে বলা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় রূপের মোহ এবং অর্থ সম্পদের লোভ ধর্মভীরু পাত্রী নির্বাচনে বাধার সৃষ্টি করে। রাসূল (সা) সাবধান করে দিয়েছেন যেন এমন ক্ষেত্রে ধর্মভীরুতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কারণ সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা-মাতা ও বংশের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাদের সুন্দর নামকরণ করাও পিতা-মাতার দায়িত্ব। রাসূল (সা) বলেন–

"পিতার উপর শিশুর অধিকার হচ্ছে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং সুন্দর একটি নাম রাখা"। (ইসলামে নামাকরণের– পদ্ধতি বশীর বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল হামীদ আল মাসুমী, পৃ. ৩২)

রাসূল (সা) আরও বলেন– "মুহাম্মদ নামে বরকত নিহিত আছে, যে ঘরে মুহাম্মদ নামের লোক থাকবে সে ঘরে বরকত হবে, যে সমাবেশে মুহাম্মদ নামের লোক থাকবে সে সমাবেশে বরকত হবে।"

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) আরও বলেন–

"কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো"। (সুনান আবী দাউদ)

সদ্যজাত শিশুকে গুরুত্ব দিয়ে রাসূল (সা) তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দেয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন–

"প্রতিটি সদ্যজাত শিশু তার আকীকার সাথে বন্দী। জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়"। (সুনান আবী দাউদ)

শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন–

"তোমাদের শিশুদের জ্ঞান দান কর। কেননা, তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট"। (ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা, অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস সিকদার, পৃ. ২৩)

রাসূল (সা) বলেন, পিতার উপর শিশু সন্তানের তিনটি অধিকার আছে। জন্মের পর তার একটি উত্তম নাম রাখা, বুদ্ধি হলে তাকে কিতাব তথা দ্বীন শিক্ষা দেয়া, আর বালিগ হলে বিয়ে দেয়া। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফাবা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬৮)

অন্য একটি হাদীসে আছে রাসূল (সা) বলেন, কোন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা অপেক্ষা উত্তম কোন কিছু দান করতে পারে না। (তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩)

আরও বর্ণিত আছে রাসূল (সা) বলেন, কারও সন্তান জন্ম নিলে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দান করে। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফাবা, পৃ. ১৫৯)

রাসূল শিশুদের অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি অনেক সময় তাদের সাথে হাসি ঠাট্টাও করতেন। যেমন- হযরত আনাস (রা)-এর ছোট ভাই ছিলেন আবু উমায়ের (রা)। তিনি

www.pathagar.com

নুগায়ের নামে লাল ঠোঁট বিশিষ্ট একটি পাখি পালতেন। তিনি প্রায়ই পাখিটি নিয়ে রাসূল (সা)-এর দরবারে আসতেন। ঘটনাক্রমে একদিন পাখিটি মারা যায়। ফলে শিশু উমায়ের (রা) প্রচণ্ড শোকাবিভূত হন। তিনি প্রায়ই পাখিটির জন্য কান্নাকাটি করতেন। যে কারণে রাসূল (সা) তার শোক কিছুটা হালকা করার মানসে তাকে ডেকে ছন্দ মিলিয়ে বললেন–

'ইয়া আবা উমায়েরু
মা ফায়লান নুগায়েরু?'

অর্থাৎ – "হে আবু উমায়ের, তোমার পাখির ছানাটির কি হল?" (মিশকাত)

চমৎকার রসিকতা করে বলার কারণে উমায়ের (রা) হেসে উঠলেন।

রুসয়্যিক বিন্‌ত মু'আউবিক ইব্‌ন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর ঘর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার গৃহে তাশরিফ আনলেন। অতপর আমার বিছানায় বসলেন, যেভাবে তুমি এখন আমার সামনে বসেছ। তখন কিছু কচিকাঁচা মেয়ে 'দফ' বাজিয়ে বদর যুদ্ধে তাদের হারানো বাবা-দাদার গুণকীর্তন করছিল। এমন সময় হঠাৎ একজন মেয়ে বলে উঠলো, আমাদের মধ্যে আছেন এমন একজন নবী যিনি আগামীকাল কি ঘটবে 'সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।' রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে তাকে বললেন, এমন কথা বর্জন কর, তুমি যা বলছিলে বরং তা-ই বলতে থাক। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৩)

অন্য এক হাদিসে, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক অথবা খায়বার থেকে আসার পর ঘরে ঢুকলেন। প্রবল বাতাসে আয়েশা (রা)-এর ছোট্ট কুটিরের পর্দা উড়ছিল। ফলে পর্দার আড়ালে রাখা তাঁর খেলনা পুতুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এগুলো কি? আয়েশা (রা) বললেন, এগুলো আমার খেলনা পুতুল। রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন এগুলোর মধ্যে দু'হাত ওয়ালা টুকরো কাপড়ের একটি ঘোড়া। বললেন, মধ্যভাগেরটি কি? আয়েশা (রা) বললেন, ওতো ঘোড়া। বললেন, ঘোড়ার ওপর ও দুটো কি? আয়েশা (রা) বললেন, তার দু'ডানা। আবারও বললেন, ঘোড়ার আবার দুটো ডানা হয় কি? আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি শুনেননি সুলায়মান (আ)-এর ঘোড়াগুলো ডানাওয়ালা ছিল। তিনি বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁতগুলো আমি দেখতে পেলাম। (আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর ঘরে কাপড়েরর পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন সখীও ছিল। তারা আমার কাছে এসে আমার সাথে খেলা করত, তারা রাসূল (সা)কে আসতে দেখলে ঘরের এদিক সেদিক লুকিয়ে থাকতো। রাসূল (সা) এসে তাদেরকে এদিক সেদিক থেকে আবার একত্রিত করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমরা পুনরায় খেলা শুরু করতাম। (আখলাকুন্নবী, পৃ. ৫)

অপর একটি হাদীসে আছে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হুজরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাবশী লোকেরা তখন মসজিদে নববীতে যুদ্ধের কৌশল দেখাচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কসরত দেখছিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমনকি আমি যে পর্যন্ত সেখান থেকে সরে না আসলাম সে পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা অনুমান কর, একজন অল্প বয়সী বালিকার খেলাধূলার প্রতি কতখানি আগ্রহ থাকতে পারে। (আখলাকুন্নবী, পৃ. ১২)

হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে কোন এক সফরে গিয়েছিলাম, আমি তখন অল্প বয়স্কা ছিলাম। শরীর তখন ভারী ছিল না। তিনি লোকদেরকে

www.pathagar.com

বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও, তারা এগিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন– আস, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি তাঁর থেকে এগিয়ে গেলাম। তিনি নিশ্চুপ রইলেন, কিছু বললেন না। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল এবং আমি পূর্বের সেই প্রতিযোগিতার কথাও ভুলে গেলাম, তখন আবার কোন এক সফরে তাঁর সাথে বাইরে গেলাম। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে গেলে আমাকে বললেন– আস, তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করব। এবার প্রতিযোগিতায় তিনি এগিয়ে গেলেন এবং হাসতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, এই জিত সেই জিতের বদলা। (হায়াতুস-সহাবা, পৃ. ৩৩)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত উক্ত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূল (সা) শিশু-কিশোরদের সর্বপ্রকার নির্দোষ খেলাধূলা অনুমোদন করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। আসলে শিশুমন সর্বদা খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। যে কারণে বিবাহিতা অথচ বয়সে কম হওয়ায় রাসূল (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর শিশুসুলভ আচরণকে শুধু অনুমোদনই করেননি বরং পুরোদস্তুর উৎসাহিত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট আসলেন, রাসূলুল্লাহ তখন তাঁর কাছে অবস্থানরত ছিলেন। সেই দিনটি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন ছিল। আয়েশা (রা)-এর কাছে তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা দু'জন মেয়ে বু'আদ যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের প্রচলিত যুদ্ধ সঙ্গীত গাইতেছিল। আবূ বকর (রা) তা শুনে দু'বার বললেন, এতো শয়তানের বাঁশী। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আবূ বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও। কারণ প্রতিটি জাতির জন্য রয়েছে ঈদ আর আমাদের ঈদ হল এ দিনটি। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯ ও ১৩০)

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কিশোর বয়সেই ইসলাম কবুল করেন। অনাথ এই কিশোর রাসূল (সা)-এর স্নেহ-ভালবাসায় লালিত পালিত হয়েছিলেন। তাঁর মূল নাম ছিল আবদুর রহমান। তিনি একটি বিড়াল ছানা পালতেন। রাতের বেলা বিড়াল ছানাটিকে গাছে উঠিয়ে দিতেন, আবার দিনের বেলা গাছ থেকে নামিয়ে তার সাথে খেলা করতেন। এ কাণ্ড দেখে রাসূল (সা) একদিন কৌতুক করে স্নেহমাখা স্বরে বললেন, ইয়া আবা হুরায়রা! অর্থাৎ 'হে বিড়াল ছানার পিতা, কি করছ?' এরপর থেকে যে কেউ আবদুর রহমান নামে ডাকলেও তিনি তাকে বলতেন, আমার নাম 'আবূ হুরায়রা।'। রাসূল (সা)-এর দেয়া আদুরে নামকেই তিনি পছন্দ করলেন এবং সে নামেই জগদ্বিখ্যাত হলেন। একবার আবদুল্লাহ ইবন বশির নামের এক কিশোরের হাতে তার মা রাসূল (সা)-কে দেয়ার জন্য কিছু আঙ্গুর ফল পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আবদুল্লাহ লোভ সামলাতে না পেরে পথিমধ্যে সব আঙ্গুরই খেয়ে সাবাড় করে। ঘটনাটি রাসূল (সা) যখন জানতে পারেন তখন তিনি খুব কৌতুক অনুভব করেন। ফলে আবদুল্লাহকে ডেকে এনে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে কান টেনে বললেন,

'কি হে দেখি বলো
মায়ের দেয়া আঙ্গুরগুলো
কোথায় হারিয়ে গেলো?'

রাসূল (সা) শিশু-কিশোরদের নিয়ে খেলতেন, কৌতুক করতেন। একদিন রাসূল (সা) কোন কাজে রওয়ানা হয়েছেন। পথে হুসাইন (রা)-কে খেলতে দেখলেন। তিনি যখন তার দিকে এগিয়ে গেলেন শিশু হুসাইন (রা)-ও নানার দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূল (সা) তাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন হুসাইনও হাত বাড়ালেন কিন্তু হাত ধরার আগেই হুসাইন (রা)

www.pathagar.com

হাত টেনে নিলেন এবং ভোঁ দৌড় দিলেন। তখন রাসূল (সা) দৌড়ে গিয়ে হুসাইন (রা)-কে ধরে ফেলে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের।'

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দিনের কোন এক প্রহরে বের হলাম। রওয়ানা করে রাসূলুল্লাহ (সা) একেবারে ফাতিমার আবাসস্থলে পৌঁছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন এখানে কি হাসান আছে, এখানে কি হাসান আছে? ডাক শুনে হাসান (রা) কোন কালবিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। অতপর উভয়েই মুনাকা (কোলাকুলি) করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ! আমি তাঁকে ভালবাসি আর তাঁকে যে ভালবাসে আমি তাকেও ভালবাসি"। (মিশকাত, পৃ. ৫৬৮)

রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল তিনি কোন সফর শেষে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন ঘরে প্রবেশের আগে শিশু-কিশোরদেরকে নিজের–সওয়ারীর পিঠে তুলে নিতেন এবং তাদেরকে আগে পিছে বসিয়ে তবে বাড়িতে ঢুকতেন।

একবার দু'জন শিশু রাসূল (সা)-এর উটের পিঠে উঠে বসেছে। একজন তাঁর সামনে অপরজন পেছনে। সামনের শিশুটি পেছনের শিশুকে লক্ষ্য করে বললো, "আমি নবীজীর (সা) সামনে বসেছি, তুমিতো বসেছো পেছনে।

পেছনের শিশুটিও কম যায় না, সে রাসূল (সা)-কে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বললো, "আমি তো নবীজীর গায়ের সঙ্গেই মিশে আছি।" সামনের শিশুটি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বুকে হেলান দিয়ে বললো, "আরে আমি নবীজীর (সা) গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছি।" পেছনের শিশুটি তার ছোট্ট হাত দু'টি দিয়ে রাসূল (সা)কে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি রাসূল (সা)-কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছি।' সামনের শিশুটি আর বলার কিছু না পেয়ে চুপ করে রইলো। তখন রাসূল (সা) তার গায়ে হাত রাখলেন। শিশুটি তখন খুব আনন্দ পেল।

হাসান ও হুসাইন (রা)-এর সাথে রাসূল (সা) প্রায়ই খেলাধূলায় মেতে উঠতেন। হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাসান-হুসাইন (রা)-এর ঘরে গিয়ে হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা)-এর পদযুগল নিজের পবিত্র পদযুগলের উপর স্থাপন করে বললেন, আরোহণ কর। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১)

একবার রাসূল (সা) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা)-কে কাঁধে বহন করে বাইরে বের হলে জনৈক বললেন, মণিরা! তোমরা কত ভাগ্যবান যে, অতি উৎকৃষ্ট সওয়ারী পেয়েছ। রাসূল (সা) বললেন, আরোহীও তো কত উত্তম। (তিরমিযী)

একবার রাসূল (সা)-এর দরবারে বিখ্যাত হাবশী সাহাবী খালিদ বিন সাঈদ (রা) তাঁর কন্যা উম্মে খালিদকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। উম্মে খালিদের পরণে ধূসর বর্ণের একটি জামা ছিল, যা দেখে রাসূল (সা) খুব প্রশংসা করলেন। হাবশায় 'হুসনা'কে 'সানাহ' বলে অর্থাৎ সুন্দর। সে জন্য রাসূল (সা) কৌতূহল বশে উম্মে খালিদকে 'সানাহ' বলে সম্বোধন করলেন। (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা)-এর দরবারে কাপড় বন্টনের সময় দুই দিক সুন্দর আঁচলযুক্ত একটি কালো রংয়ের চাদর পাওয়া গিয়েছিল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ চাদরটি কাকে দেয়া যায়? সকলেই চুপ থাকলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, উম্মে খালিদকে নিয়ে এসো। তাকে আনবার পর রাসূল (সা) নিজ হাতে তাকে সেই চাদরটি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এ চাদরে তোমাকে খুব মানিয়েছে। পুরনো না হওয়া পর্যন্ত এটা পরবে। এটা কী 'সানাহ' (সুন্দর) নয়?"

www.pathagar.com

উম্মে খালিদ নিজেই বলেছেন, একবার আমি আমার পিতা খালিদ ইবন সাঈদ (রা)-এর সাথে রাসূল (সা)-এর দরবারে এসেছিলাম। ঐ সময় আমার গায়ে ছিল ধূসর বর্ণের জামা। জামাটি দেখে রাসূল (সা) বললেন, 'সানাহ'! 'সানাহ'!

তিনি বলেন, অতপর আমি রাসূলে করীম (সা)-এর 'মহরে নবূওয়াত' নিয়ে খেলা করতে লাগলাম। আমার পিতা 'মহরে নবূওয়াত' নিয়ে খেলতে নিষেধ করলেন। রাসূল (সা) বললেন, উম্মে খালিদকে 'মোহরে নবূওয়াত' নিয়ে খেলতে দাও। (বুখারী)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার ছোট মেয়েদের মধ্যে কোন এক মেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসতো এবং তাঁর হাত ধরতো। তিনি মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন না। সে যেখানে ইচ্ছে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেত। (আখলাকুন নবী, পৃ. ১০)

হযরত আনাস (রা)-কে একবার রাসূল (সা) দুই কানওয়ালা বলে কৌতুক করেছিলেন।

রাসূল (সা) শিশুদেরকে নিজে থেকেই আগে সালাম দিতেন। আজ আমরা বড়রা ছোটদের কাছে আগে সালাম আশা করি। এমনকি ছোটরা আগে সালাম না দিলে তাদেরকে বেয়াদব ভাবি। অথচ নবীর সুন্নাত হলো নিজের পক্ষ থেকে আগে সালাম পেশ করা। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে পথ চলছিলাম। পথের পাশে একদল ছেলে খেলা করছিল। রাসূল (সা) তাদের কাছে থেমে গেলেন এবং সালাম জানালেন।

হযরত জাবির বিন সামুরা (রা) তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ছোট সময় একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরের দিকে রওনা হন। আমিও পিছে পিছে তাঁকে অনুসরণ করি। কিছু পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ একদল শিশু এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে ধরলো। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। রাসূল (সা) শিশুদেরকে আদর করলেন, মুসাফা করলেন, মাথায় হাত বুলালেন, এমনকি আমাকেও আদর করলেন।

অনেক সময় সাহাবীগণ নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনের বাচ্চাদেরকে দেখানোর জন্য রাসূল (সা)-এর কাছে নিয়ে আসতেন। রাসূল (সা) তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন। নিজের মুখে খেজুর চিবিয়ে ছোট শিশুদের মুখে দিতেন এবং দোয়া করতেন।

একবার উম্মে কায়স বিনত মিহসান (রা) তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে রাসূল (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। ঐ সময় তিনি খেতে বসেছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি খাওয়া শুরু করেননি।

শিশুটিকে দেখা মাত্র রাসূল (সা) খাওয়ার স্থান থেকে উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং যথাস্থানে গিয়ে বসে আদর করতে লাগলেন। এ সময় শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো।

রাসূল (সা) এ ঘটনায় স্মিত হাসলেন, তাঁর চেহারায় কোন বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল না। একজনকে দিয়ে কিছু পানি আনিয়ে কাপড়ের যে যে জায়গায় পেশাব লেগেছে তা ধুয়ে ফেললেন। (বুখারী, দিল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫)

এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি শিশুকে কোলে তুলে তাকে তাহনীক মিষ্টি মুখ করাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। অতপর তিনি পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দেন। (বুখারী, দিল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৮)

নামাযের সময়ও রাসূল (সা) শিশুদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের প্রতি ঘূর্ণাক্ষরেও

www.pathagar.com

কোন রূঢ় ব্যবহার করতেন না।

রাসূল (সা) তাঁর প্রথমা কন্যা হযরত যয়নব (রা)-এর শিশু কন্যা উমামাকে খুবই আদর করতেন। এ প্রসঙ্গে আবু কাতাদা (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা এক সময় মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে তশরিফ আনলেন। কাঁধের উপর আসীন দৌহিত্র শিশু উমামা। ঐ অবস্থায়ই রাসূল (সা) সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি যখন রুকুতে যেতেন তখন শিশু উমামাকে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন, তখন তাকে কাঁধে তুলে নিতেন। এভাবে তিনি পুরো সালাত আদায় করেন।

রাসূল (সা) যখনই হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরে যেতেন তখনই বলতেন, 'যাও আমার নাতিদের নিয়ে এসো'। মা ফাতিমা (রা) সন্তানদের নিয়ে এলে রাসূল (সা) তাদের শরীরের সুবাস নিতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

একদিন রাসূল (সা) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন– এ সময় দেখলেন লাল জুব্বা পরিহিত শিশু হাসান-হুসাইন মসজিদে ঢুকছেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (সা) এ অবস্থা দেখে খুতবা দেয়া বন্ধ করে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে সামনে বসিয়ে দিলেন।

হাসান-হুসাইন (রা) অনেক সময় নামাযরত রাসূল (সা)-এর পিঠে উঠে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন। হাদীসে আছে– যখন নবীজী (সা) সিজদায় যেতেন তখন হাসান ও হুসাইন (রা) রাসূলের পিঠে চড়ে বসতেন। তখন নবীজী অনেক সময়ব্যাপী সিজদায় থাকতেন। তবু যখন ওরা নামত না, তখন তিনি বা হাত দিয়ে পিঠে জড়িয়ে ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

রাসূল (সা) বলেন, "কখনও কখনও জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় আমার ইচ্ছে হয় আমি কেরাত দীর্ঘ করি। কিন্তু পেছন থেকে কোন শিশুর কান্না শুনতে পেলে আমি নামায সংক্ষেপ করে ফেলি। কান্নায় মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠতে পারে।"

রাসূল (সা) চলার পথে শিশু-কিশোকে কাঁদতে দেখলে কোলে তুলে নিতেন, মুখে চুমো দিতেন, আদর করতেন, এমনকি ছড়া কবিতা শুনাতেন। একবার তিনি দেখতে পেলেন, একটি শিশু খুব কাঁদাকাটি করছে। তিনি নির্দ্বিধায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ছড়া কাটলেন :

'খারকা খারকা
ফি কুলে আইনিন
বাককাহ।'

অন্য একদিন সুন্দর একটি শিশুকে দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন–

'ইন্নাহুম লা মিন রায়হানিল্লাহ'

অর্থাৎ– এই শিশুরাইতো আল্লাহর বাগানের ফুল।'

রাসূল (সা) শিশু-কিশোরদের হক আদায়ের ব্যাপারেও অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতেন।

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাক। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক হাঁড়ি হালুয়া হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রত্যেককে এক চামচ করে হালুয়া দিতে থাকলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকেও এক চামচ হালুয়া খাওয়ালেন। আমি তখন ছোট ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাকে আরও দেই? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি ছোট হওয়ার কারণে তিনি আমাকে আরো এক চামচ দিলেন। এভাবে তিনি শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত বিতরণ করলেন। (হাফিজ আবূ শায়খ

www.pathagar.com

আল-ইসফাহানী (র), আখলাকুন নবী (সা), অনুঃ ইফাবা, পৃ. ৩২৪)
উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) তাঁকে নিয়ে আসলেন এবং আমার কাছে কিছু চাইলেন। আমার কাছে তখন একটা খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আমি তাকে তাই দিলাম। তিনি খেজুরটি দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। অতপর সে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে আসলে আমি তাকে ঘটনাটা বললাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের সন্তান নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সে যত্নবান থাকবে, এ সন্তানগুলো তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৭)
হযরত খাদিজা (রা)-এর ক্রীতদাস হযরত যায়িদ বিন হারিছার পুত্র ছিলেন উসামা (রা)। শিশু উসামা (রা) রাসূল (সা)-এর একান্ত স্নেহধন্য ছিলেন। অনেকের ধারণা রাসূল (সা) উসামা (রা)-কে হযরত হুসাইন (রা)-এর মতই ভাল বাসতেন। তিনি উসামা (রা)-কে ধারে কাছেই রাখতেন, তার নাক পরিষ্কার করে দিতেন। রাসূল (সা) ঠাট্টা করে বলতেন, "উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে অলঙ্কার পরাতাম।"
শিশু উসামা একবার দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। তার কপাল ফেটে রক্ত বের হতে লাগলো। রাসূল (সা) প্রথমে হযরত আয়েশা (রা)কে রক্ত মুছে দিতে বললেন, কিন্তু তাতে স্বস্তি পেলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে রক্ত মুছে ক্ষতস্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি মধুর কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করতে লাগলেন।
আসলে রাসূল (সা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি ছোটদের কষ্ট দেখলে নিজেই কেঁদে ফেলতেন।
উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একজন মেয়ে এই সংবাদ পাঠালেন যে, আমার ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। আমাদের ঘরে আপনি তাশরিফ আনুন। এ সময় তাঁর কাছে স্বয়ং উসামা, সা'দ ও উবায়্যি (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁর নিকট সালাম পাঠিয়ে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর জন্য, তিনি যা গ্রহণ করেন এবং যা দান করেন, তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। মেয়েটি তখন কসম দিয়ে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যেন তার নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উঠে রওনা হলেন। আমরাও তাঁর সাথে রওনা করলাম। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে ছেলেটাকে তাঁর নিকট দেয়া হল। তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। ছেলেটার প্রাণ তখন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছিল। উপস্থিত সা'দ (রা) তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনার চোখ দিয়ে এ কি গড়াচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ হৃদয়ের কোমলতা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অন্তরে তা প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ করুণা করেন তাঁর করুণাশীল বান্দাদের প্রতি। (আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৪)
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা) একবার তাকে একটি কাজে যেতে বললেন। উত্তরে আনাস (রা) সরাসরি বললেন, "আমি যাব না। আমি কখনও যেতে পারবো না।" উত্তর এমন হলেও রাসূল (সা) জানতেন আনাস কাজটি করবে। এ ব্যাপারে আনাস (রা) নিজেই বলেন, "আমার মনে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যে কাজের আদেশ করেছিলেন তা আমি অবশ্যই করবো।"
তিনি ঘর থেকে বেরও হয়েছিলেন কিন্তু পথে অন্য ছেলেদের খেলতে দেখে নিজেও সে দলে শামিল হয়ে গেলেন। আর কাজটির কথা বেমালুম ভুলে বসলেন।
খেলার এক পর্যায়ে তিনি অনুভব করলেন পেছন থেকে কে যেন তার ঘাড় ধরেছেন। ঘাড়

www.pathagar.com

ফিরিয়ে দেখেন রাসূল (সা)! তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "যাও, তোমাকে যে কাজটি করতে বলেছি তা করে এসো।" আনাস (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (সা)-এর বহু বছর (দশ বছর) খিদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি আমাকে গালি দেননি, মারপিট করেননি, ধমক দেননি, চোখ রাঙাননি। আর কোন বিষয়ে তিনি আমাকে তিরস্কারও করেননি, যা তিনি আমাকে করতে আদেশ করেছেন অথচ আমি তা করতে আলস্য করেছি। তাঁর ঘরের কেউ যদি এ ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করত, তবে তিনি বলতেন, আরে রাখতো! যদি সম্ভব হত তা হলে তো করতই। (আখলাকুন নবী, পৃ. ১৮)

জনৈক সাহাবী ছোট বেলা আনছারদের খেজুর বাগানে যেতেন। শিশু সুলভ চপলতার কারণে খেজুর গাছে ঢিল ছুড়তেন। একদিন বাগানের মালিক সঙ্গী সাথীসহ তাকে তাড়া করে এবং ধরে ফেলে। তারা তাকে রাসূল (সা)-এর কাছে নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে ঐ সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢিল ছুড়েছো কেন'? আমি বললাম, খেজুর খাওয়ার জন্য। সোজা উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) একটু চুপ রইলেন। আমাকে বকাবকি বা তিরস্কার করলেন না। বরং স্নেহের সাথে বললেন, 'যে ফল নিজে গাছ থেকে তলায় পড়ে, সেগুলো কুড়িয়ে খাবে। ঢিল ছুড়বে না।' এরপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

একবার এক যুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণকালে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে কয়েকটি শিশু মারা যায়। এ সংবাদে মহানবী (সা) খুবই মর্মাহত হন। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনের দুঃখ কমাবার জন্য বললেন, 'নিহত শিশুরা ছিল অমুসলিম।' এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) ভীষণ রেগে গেলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'তারা তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর। সাবধান! কখনও শিশু হত্যা করবে না।' দ্বিতীয়বার বললেন, 'সাবধান! শিশু হত্যা করবে না।'

রাসূল (সা) কোন একদিন শিশু নাতি হাসান (রা)-কে চুমু খাচ্ছিলেন, তা দেখে উপস্থিত আফরা বিন হারিস তামীমী (রা) বললেন, 'আমার দশটি সন্তান হয়েছে। আমি কোনদিন তাদের একটিকেও চুমু দেইনি।' রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া একান্তই তুলে নিয়ে থাকেন, তবে আমার কি করার আছে? যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়া পায় না'। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেদুঈন কিছুলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগমন করল। তারা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনারা কি স্বীয় শিশুদেরকে চুম্বন করে থাকেন? জওয়াব আসল হ্যাঁ, আমরা তা করে থাকি। তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা কিন্তু চুম্বন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে করুণা বঞ্চিত করে দেন তাহলে আমি কি সেই জন্য দায়ী হব? (ঈমাম মুসলিম, সহীহ কিতাবুল আদাব বাবু রাহমাতু (সা) সিব ইয়ান ওয়াল ঈয়াল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫)

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিশুপুত্র হযরত ইবরাহীম (রা) মদীনার বাইরে কোন এক ধাত্রীর দুধ পান করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখার জন্য সেখানে চলে যেতেন এবং তাকে কোলে উঠিয়ে আদর ও চুম্বন করতেন। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে অন্য কোন লোককে সন্তানাদির প্রতি এত বেশি স্নেহশীল দেখিনি। (মুসলিম)

www.pathagar.com

অন্য একটি হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ মমতা পোষণকারী অন্য কারো দেখিনি। তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা) মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রী মাতার কাছে দুধ পান করতেন। প্রায়ই সেখানে তিনি গমন করতেন। আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি যে ঘরে যেতেন সেটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মাতার স্বামী ছিল একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং চুমো দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবরাহীম (রা)-এর ইনতিকাল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধ পানের বয়সে ইনতিকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধ পান করাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা নগরীতে প্রবেশকালে উটের পিঠে রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন শিশু দৌহিত্র আলী এবং উসামা বিন যায়িদ বিন হারিসা (রা)।

অপরদিকে রাসূল (সা) যে দিন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন বড়দের সাথে মদীনার শিশুরা সুর করে বলছিল–

শান্তির রাজা আসুন!
আল্লাহর রাসূল আসুন!
বেহেশতের নিয়ামত আসুন!
আমরা আপনাকে বরণ করি।

ঘরের ছাদে অবস্থানকারী মহিলারা ও শিশুরা সুর করে গাইতেছিলো–

তালা'আল বাদরু আলায়না
মিন সা'নিয়াতিল বিদা
ওজাবাছ শুকরু আলায়না
মাদা'আ লিল্লা হিদা।

ছোট ছোট মেয়েরা রাসূল (সা)-কে ঘিরে সুললিত কণ্ঠে গাইতে থাকলো–

'আমরা নজ্জার বংশীয় বালিকা
মুহাম্মাদ (সা) কত ভাল প্রতিবেশী।'

এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন, "সত্যিই তোমরা আমাকে ভালবাসো?" সমস্বরে তারা উত্তর দিলো, 'আলবত! আলবত! তখন তিনি বললেন, "আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।"

রাসূল (সা)-এর এহেন আশ্বাসবাণীতে ছোট ছোট শিশুরা আরও জোরে জোরে দফ্ বাজিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো।

মদীনাতে প্রবেশ করতেই রাসূল (সা) সেখানকার ফুলের কলির মত তারতাজা শিশুদেরকে তাঁর আত্মার আত্মীয় বানিয়ে নিলেন। শিশুরাও তাদের স্বভাব সুলভ মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে রাসূল (সা)-কে আপন করে নিলেন।

রাসূল (সা) নিজে ছিলেন চির ইয়াতীম। যে কারণে তিনি সব থেকে বেশী ভাল বাসতেন ইয়াতিম শিশুদেরকে। ইয়াতিম শিশু-কিশোরদেরকে তিনি গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন।

ছোটদের সাথে কথা বার্তা হিসেব করে বলা উচিৎ। তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ করা উচিৎ। কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে কোন ধোকা বা প্রতারণা করা উচিৎ নয়। এমনকি হাসি তামাসাচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেছেন, একদিন আমার মা আমাকে ডাকলেন, যখন

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে বসেছিলেন। মা বললেন, এদিকে এসো, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। এ সময় রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তাকে কি দিতে চাও। আম্মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূল (সা) বললেন, তুমি ওকে কিছু দেবার জন্য ডেকে যদি না দিতে তাহলে তোমার আমল নামায় এ মিথ্যা রেকর্ড হয়ে যেতো।"

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা জায়েজ নয়, না স্বাভাবিক অবস্থায় না হাসি-তামাসাচ্ছলে। আর তোমাদের কারো জন্য নিজ সন্তানকে কিছু দেবার ওয়াদা করে না দেয়াও জায়েজ নয়।

সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এ বিষয়ে হযরত নোমান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি আমার এই পুত্রকে একজন গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূল (সা) বললেন, তাহলে তুমি যা দিয়েছ তা ফেরত নাও।"

শিশু সন্তান প্রতিপালন করা অবশ্যই মহত্তম কাজ। বিশেষ করে কন্যা সন্তান লালন-পালন করা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা, বিবাহ যোগ্য হলে বিবাহ দেয়া পিতা-মাতা, অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য। আর এ কাজ যারা সুচারুরূপে সম্পাদন করবে রাসূল (সা) তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার কন্যা সন্তান রয়েছে, আর সে তাকে জীবন্ত দাফন করেনি এবং তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন (আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

অন্য হাদীসে আছে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটা কন্যা সন্তান অথবা তিনজন বোনকে প্রতিপালন করল, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি করুণা করল যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিবেন। কেউ জিজ্ঞেস করল দু'জনকে প্রতিপালন করলে কি সেই মর্যাদা লাভ হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, দু'জনকে প্রতিপালন করলেও সেই মর্যাদা পাবে। এমনকি লোকজন যদি একজনের কথাও কেউ জিজ্ঞেস করত তাহলেও তিনি একজনের ব্যাপারেও হ্যাঁ সূচক জবাব দিতেন (শারহুস সুন্নাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

শিশু বয়সে যেসব সন্তান মারা যায় তারা নিজেরা তো বেহেশতে যাবেই সাথে সাথে পিতা মাতাকেও তারা বেহেশতে প্রবেশ করানোর উছিলা হবে।

একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) পরকালীন বহু দৃশ্য দেখাইলেন। কোন্ কোন্ পাপের পরিণামে কি কি শাস্তি অবধারিত তা দেখানো হল। অতপর অবলোকন করলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সবুজ শ্যামল একটি বাগানের গাছের গোড়ায় কতিপয় শিশুকে নিয়ে বসে আছেন। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে জিবরাঈল (আ) ও মীকাঈল (আ) বললেন, 'তারা হল–সেই সকল নবজাতক যারা ফিতরাতের উপর ইনতিকাল করেছে।' এ কথা শুনার পর কোন একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সন্তানগণের কি অবস্থা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মুশরিকদের সন্তানগণের অবস্থাও তাই-ই হবে (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪৪, ও ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮)।

শিশুর মৃত্যুর ফলে শোকগ্রস্ত পিতা-মাতাকে রাসূল (সা) সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক আনসার মহিলাকে বলেন, তোমাদের

www.pathagar.com

কারও তিনটি সন্তান মারা গেলে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে, সওয়াব কামনা কওে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপস্থিত মহিলাদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো দু'টি সন্তান মারা গেলে কি জান্নাত লাভ করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, দু'টি সন্তান মারা গেলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫০)।

আরও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের যার দু'টি সন্তান অগ্রবর্তী হিসেবে ইন্তেকাল করবে আল্লাহ তা'আলা ওদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যার একটি মাত্র সন্তান অগ্রবর্তী হিসেবে মারা যাবে তার কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সেও জান্নাতে যাবে (তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত)।

আরও ইরশাদ হয়েছে–

আবূ মূসা আল-আস'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করলে? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলবে হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বান্দা সন্তান হারা হবার পর কি বললো? তারা বলবেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং বায়তুল হামদ বলে তার নামকরণ কর (আহমদ, তিরিমিযী)।

কুররাহ বিন আয়াস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই কোন বৈঠকে বসতেন, তাঁর কিছু সাহাবী তাঁর চারপাশে বসতেন। তার মধ্যে একজনের একটি ছোট ছেলে ছিল। ঐ শিশুটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসতো পেছন দিক থেকে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ছেলেটিকে তাঁর সামনে বসাতেন। শিশুটি মারা গেল এবং তার পিতা মনের দুঃখে কয়েকদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈঠকে উপস্থিত হননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে চাইলেন কি ঘটলো? লোকটি আসছে না কেন? লোকজন জানালো, তার ছোট ছেলেটি যাকে আপনি দেখেছেন– মারা গেছে। সম্ভবত এ কারণেই সে আসছে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখতে গেলেন এবং তার বাচ্চাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। যখন সে তার শিশুটির মৃত্যু সংবাদ জানালো, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে শান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, "আমাকে বলুন, আপনি কোনটি চান? আপনি কি চান যে, শিশুটি জীবিত থাকুক অথবা আপনার আগে চলে গিয়ে শিশুটি আপনার জন্য বেহেশতের দরজা খুলুক। আপনি যখন ওখানে পৌঁছান, সে যেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাক।"

ব্যক্তিটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, "আমি এটাই চাই যে, সে প্রথমে জান্নাতে যাক এবং আমার জন্য দরজা খুলুক।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আপনার জীবনকালে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে এবং আপনার জন্য সে জান্নাতে দরজা খুলে দেবে" (আত-তারগীব ওয়া-আত তারহীব)।

এবার আমরা একটু অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাই। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ মক্কী জীবনের সেই ভয়াবহ বৈরী পরিবেশে বয়স্কদের পাশাপাশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ শিশু-কিশোরদেরকেও ইসলাম কবুল করতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে বয়স্করা না হয় বুঝে শুনে ইসলাম কবুল করার মত সাহস ও ঝুকিপূর্ণ কাজ বেছে নিল! কিন্তু ছোটরা কেন এ পথে পা বাড়াবে? প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, বিধি-বিধানের বিপক্ষে তাদের তো যাওয়ার কথা নয়। তারা কি সত্যি সত্যিই ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করে ইসলাম কবুল করেছিলেন? মনে হয় না। আসলে তাঁরা রাসূল (সা)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েই তা করেছেন। তাদের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, মায়া-মমতা, ভালবাসা দেখেই

www.pathagar.com

তাঁরা ইসলাম কবুল করতে আগ্রহী হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কিশোর বয়সেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সংবাদে আবু জেহেল ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ধরে প্রহার করে। এ সময় আবু জেহেলের গালে ইবনে মাসউদ কায়দা মতো একটা চড় বসিয়ে দৌড়ে পালায়। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের পক্ষে কিশোর ইবনে মাসউদ (রা)-ই সর্ব প্রথম কাফেরদের গায়ে হাত তোলেন। পরবর্তীকালে এই ইবনে মাসউদই বদর যুদ্ধের সময় আবু জেহেলের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন।

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (আশ- শোয়েরা : ২১৪)

এ আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল (সা) বানু হাশিম গোত্রের প্রভাবশালী লোকজন নিজ বাড়িতে এক ভোজের দাওয়াত দিলেন। এ দাওযাত পেয়ে রাসূল (সা) এর নিজ গোত্র বানু হাশিমের ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং ভোজ পর্ব ও সমাধা করলেন। কিন্তু রাসূল দাওয়াত পেশ করার আগেই আবু জেহেল টের পেয়ে অনাবশ্যক হৈচৈ শুরু করে। ফরে ঐ দিন মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এজন্য দু'চারদিনের মধ্যে আবারো ভোজের দাওয়াত দেয়া হয় এবং ভোজ শেষ হতেই রাসূল (সা) অন্যকে কোনও সুযোগ না দিয়েই বলতে শুরু করেন।

"উপস্থিত আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আমি আপনাদের কাছে দোজাহানের কল্যাণের বাণী নিয়ে এসেছি। আমার আগে আরবের কোন লোক তার জাতির জন্য এ ধরনের কোন বাণী আনেনি। আলোর দিকে সত্যের দিকে আমাদের যিনি শ্রষ্টা সেই আল্লাহর দিকে আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন এক আল্লাহর ইবাদাত করি, আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।"

উপস্থিত কোরেশ নেতাগণ এ আহ্বানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা বললো, 'মুহাম্মদ! ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর। তোমার শ্রদ্ধেয় চাচা ও চাচাত ভাইয়েরা এখানে উপস্থিত আছেন। তাদের সামনে বাতুলতা করো না। তুমি কুলাঙ্গার, তোমার আত্মীয় স্বজনের উচিত তোমাকে বন্দি করে রাখা।"

এ পর্যন্ত বরেই তারা ক্ষ্যান্ত হলো না- তারা সবাইকে নিয়ে ভোজসভা ত্যাগ করতে উদ্যত হলো এ সময় কিশোর হযরত আলী (রা) সাড়া দিয়ে বললেন, "যদিও আমি চক্ষুরোগাক্রান্ত অল্প বয়স্ক, জীর্ণশীর্ণ বালক, তথাপি আমি এই মহাব্রত পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি।" কিন্তু নবী করীম (সা) তাকে বসতে বললেন এবং পরপর তিনবার ঘোষণা দিলেন, 'উপরোক্ত কাজে কে কে আমার সঙ্গী হবেন।'

নবীর আহ্বান অথচ বালক আলী (রা) ব্যতীত কেউই সাড়া দিলো না। এ সময় হযরত আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা) বলেছিলেন, "আলী আমার ভাই, আমার উত্তরাধিকারী এবং তোমাদের মধ্যে আমার অসিয়ত বাস্তবায়নকারী। অতএব তার কথা শোন এবং তাঁকে মান্য কর।"

কিশোর আলীর সাহস দেখে কোরেশ নেতৃবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই রেগে মেগে আবূ লাহাব, আবূ তালিবকে উদ্দেশ্য করে বললো, "ভাতিজার কল্যাণে আজ থেকে তোমাকে বোধ হয় তোমার ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্রের কতা মতোই চলতে হবে।"

হিজরতের বিষয়ে অহী নাজিল হওয়ার সাথে রাসূল (সা) কিশোর আলী (রা)-কে ডেকে সব কথা খুলে বললেন। অন্যদের যেসব মাল-সামান, টাকা-পয়সা নিজের কাছে গচ্ছিত ছিলো তা সবই আলীকে বুঝিয়ে দিলেন স্ব স্ব মালিকদের ফেরত দেয়ার জন্য। এরপর কিশোর আলী (রা)-কে নিজের বিছানায় শুয়ে দিয়ে বাড়ির পেছন পথ দিয়ে বের হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

সারারাত পাহারা শেষে ভোর বেলা যখন রাসূল (সা)-এর ঘরে ঢুকে দেখল আলী (রা) শুয়ে আছেন তখন আবু জেহেলের মাথায় খুন চেপে গেল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আলী (রা)-এর গালে চড় বসিয়ে দিয়ে বললো, বল দুরাচার, মুহাম্মদ কোথায়?

বীর কেশরী আলী (রা) ততোধিক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মনে হয় তোমরা আমাকে নিযুক্ত করে রেখেছো, যে আমাকে জিজ্ঞেস করছো? দরকার হয় নিজেরাই খুঁজে দেখো।" এ কথা বলেই আলী (রা) ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আমরা জানি সকল সহাবীই রাসূল (সা)-কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তাদের এ ভাল বাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, তারা বুঝে শুনেই এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু শিশু-কিশোরদের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা ভালবাসার কাঙাল। যেখানে স্নেহ ভালবাসা আছে সেখানে তারা আছে। কথায় বলে–

যেখানে গুড় সেখানেই মিষ্টি
পিঁপড়েই করে ঝগড়া সৃষ্টি।

ঠিক তেমনি রাসূল (সা) উদার হৃদয়ের স্নেহ, ভালবাসা, আদর পেয়ে শিশু-কিশোররা তাঁকে প্রাণদিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করেছিলেন। আফরার পুত্র মু'আজ এবং মা'আজ তেমনি দু'জন বালক ছিলেন। এ দু'ভাই যখন জানতে পারেন যে, আবূ জেহেল ভীষণ একজন যালিম লোক। সে বিনা কারণে রাসূল (সা)-এর ওপর যখন তখন নির্যাতন চালায়। তখন তাঁরা আলাদা আলাদা করে আবূ জেহেলকে হত্যা করার জন্য মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে জন্য তাঁরা সুযোগ খুঁজছিল। বদর যুদ্ধের দিন তাঁরা সে সুযোগ পেয়ে যায় এবং তাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে।

এ ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ বলেন, 'আমি যুদ্ধে আছি, এমন সময় আমার দু'দিকে দু'জন কিশোরকে দেখতে পেলাম। তাদের একজন অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলো, আবূ জেহেল লোকটি কে এবং সে এখন কোথায়? আমি বললাম, তার পরিচয় কেন জানতে চাও? সে বললো, আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তাকে যেখানেই দেখবো, সেখানেই হত্যা করবো, অথবা যুদ্ধ করে শহীদ হব। আমি উত্তর দিতে না দিতেই অপর কিশোরটিও আমাকে কানে কানে ঐ কথায় জিজ্ঞেস করলো। আমি তাদেরকে ইঙ্গিতে আবূ জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা ব্যূহভেদ করে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে আবূ জেহেলকে আক্রমণ করলো। তাদের তরবারির আঘাতে আবূ জেহেল মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। এই কিশোরদ্বয় আফরার পুত্র মু'আয এবং মা'আয (সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২)।

পিতার এ করুণ অবস্থা দেখে আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা পেছন দিক থেকে এসে মু'আযের বাম বাহুতে তলোয়ারের আঘাত করলো, ফলে বাহুটি প্রায় ছিন্ন হয়ে ঝুলতে লাগলো। তিনি ইকরামাকে পাল্টা আঘাত করলেন কিন্তু সে পালিয়ে গেল। মু'আয দেখলো তার ঝুলন্ত বাহুটি যুদ্ধের কাজে বেশ অসুবিধা করছে, তখন সে তাঁর বাহুটি পায়ের তলে চেপে ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন। তখন আবূ জেহেল জীবিত। রাসূল (সা)-এর অপর স্নেহ ভাজন কিশোর আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ এ দৃশ্য দেখে এগিয়ে এসে তার বুকের উপর বসলেন। আবু জেহেল চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলো, কে? উত্তর দিয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ জানতে চাইল, তোমার খবর কি? আবু জেহেল বললো, "দুঃখ আমার, মদীনার কৃষকের দু'জন ছেলে আমার এ অবস্থা করেছে, কোন বীর পুরুষ আমাকে ধরাশায়ী করেনি।" যখন মাসউদ তার মাথা কেটে নেয়ার কথা জানাল, তখন আবু জেহেল বললো, "গর্দানের গোড়া থেকে কাটিশ, তাহলে আমার মাথাটা নেতার মতই বড় দেখাবে।" আবূ

www.pathagar.com

জেহেলের কর্তিত মাথা নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং আবূ জেহেলের সাথে তার কথোপকথোনের বর্ণনা দিলেন। বর্ণনা শুনে রাসূল (সা) বললেন, "সব নবীর জন্যই কোন না কোন ফেরাউন ছিল। তবে আমার ফেরাউন হলো সবচেয়ে বড়। নবী মূসা (আ)-এর ফেরাউন মৃত্যু আসন্ন দেখে বলেছিল, আমি মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। আর আমার ফেরাউন আবূ জেহেল মৃত্যুর প্রাক্কালে মাথা বড় করে নেতার মত কেটে তাকে হত্যা করার অনুরোধ করেছেন।"

হযরত খাদিজা (রা)-এর ক্রীতদাস যায়েদকে স্বামীর খেদমতের জন্য উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁকে স্বাধীন করে দিলেন। যায়েদের আব্বা ও চাচা সুদূর ইয়েমেন থেকে মক্কায় এসেছিলেন হারানো পুত্রকে ফিরিয়ে নিতে। তারা অর্থের বিনিময়ে হলেও যায়েদকে ফিরিয়ে নিতে চাই বলে রাসূল (সা)-কে তাদের অভিপ্রায় জানালো। রাসূল (সা) জায়েদকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এদেরকে তুমি কি চেনো? জায়েদ হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে বললেন যে, উনি আমার আব্বা এবং উনি আমার চাচা। তখন রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন, আমি জায়েদকে অবাধ স্বাধীনতা দিচ্ছি, যদি সে আপনাদের সঙ্গে যেতে চায়, কোন রকম প্রতিদান ছাড়া আমি তাকে মুক্ত করে দেবো। আর সে যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে না চায় আমি মোটেই তাকে বিদায় করবো না। জায়েদ তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, আব্বা ও চাচার সাথে যাওয়ার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে থাকা তাঁর পছন্দ। তখন রাসূল (সা) জায়েদকে হারাম শরীফে নিয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, আজ থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত জায়েদ পরিচিত হবে, জায়েদ ইবন মুহাম্মদ নামে (মুহাম্মদ-এর পুত্র)। রাসূল (সা)-এর এহেন ঘোষণায় তাঁর আব্বা ও চাচা যারপরনাই খুশি হলেন এবং যখন তারা দেখল যে, জায়েদ স্বাধীনতার চেয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে থাকাকে বেশি পছন্দ করছে তখন তারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট চিত্তে মক্কা ত্যাগ করলেন।

দুনিয়ার ইতিহাসে এমনতর ঘটনা কেউ কি কখনো প্রত্যক্ষ করেছে? জায়েদকে যখন মায়ের বেদনাময় স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর আব্বা-চাচা বাড়ি যাওয়ার জন্য বলেছিল তখন উত্তরে যায়েদ বলেছিল, 'মাকে বলবেন, আমি ভাল আছি। যে সোনার মানুষ পেয়েছি তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না।"

"হে নবী! আপনাকে আমি সারা বিশ্বের রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি (আম্বিয়া, ১০৭ আ.)। আল্লাহ পাকের এ চিরন্তন ঘোষণার বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন রাসূল (সা)। সত্যিই তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্যই রহমত ছিলেন। আমরা এ লেখার বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। ক্ষুদে শিশু-কিশোরদের বিষয়েও কত গুরুত্ব ও মমত্বের সাথে তিনি দেখেছেন। এত আদর, এত স্নেহ, এত মমতার পরও কিন্তু রাসূল (সা) শিশুদের শাসন করেছেন ও করতে বলেছেন।

একবার হযরত হাসান (রা) সরকারি গুদামের একটি খেজুর মুখে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) ছি. ছি. বলে হাসানকে মুখে থেকে তা ফেলে দিতে বলেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- রাসূল (সা) এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে বয়স যখন ৭ বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ কর। ১০ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য হালকা মার দাও এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও (আবু দাউদ)।

অবশ্য রাসূল (সা) নিজে কখনও কোন শিশুকে মারেননি। ◆

www.pathagar.com

প্রকৃতির মত বিশুদ্ধ

আলফা

মিনারেল ওয়াটার

আমাদের অগণিত গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে এখন থেকে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিসে এবং হ্রাসকৃত মূল্যে আপনার অফিস, বাসা ও অনুষ্ঠানাদিতে ২০ লিটার জারসহ বিভিন্ন সাইজের বোতল ও পলিব্যাগে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ

মাওঃ এ.কে. এম মুস্তাফিজুর রহমান (কুয়েত)

ALPHA
LEVEL

আলফা লেভেল পোল্ট্রি ফুডস এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ

১৮০/৬/১১ পূর্ব রামপুরা (ইসলামী ব্যাংক কলোনী) ঢাকা-১২১৯

ফোন ঃ ৮৩১২২৬০, ০১৮-২৭২৩২৬, ১০৯-৩৬০৮৯৭

www.pathagar.com

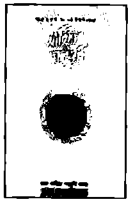

মিলাদুন্নবী'র নামে শির্কী ও বিদয়াতী ষড়যন্ত্র

মোহাম্মদ আব্দুর রহীম খান

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম, ওয়ালাআলিহি ওয়াসহাবিহী আজমাইন, ওয়ালা মান তাবিইয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন।

আমাদের দেশে বর্তমানে মিলাদ পাঠ ও মিলাদের মজলিস অনুষ্ঠানের রেওয়াজ বেশ জোরে ও বড় সোয়াবের কাজ বলে প্রচার করা হচ্ছে। সাধারণ মুসল্লিদের সাথে দেশের আলিম সমাজেরও একটা বড় অংশ এ কাজে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু এরা একবারও ভেবে দেখতে রাজি হয় না যে, এ কাজ শরীয়ত সম্মত কিনা, কিংবা সেই সুন্নাত মুতাবিক কিনা যা মুসলমানেরা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর নিকট থেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার কারণে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা? তারা হচ্ছে সেই সকল লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সব ঠিক কাজ করছে।' (সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪)

রাসূল (সা) তাঁর নিজের সময়কার ও তার পরবর্তী যুগের বিষয়ে বলেন, 'অতীব কল্যাণময় ইসলামী যুগ হল আমার এ যুগ, তারপর পরবর্তীকালের লোকদের যুগ তারপরে তৎপরবর্তীকালের লোকদের যুগ।"

এ কথা সবাই জানেন ও স্বীকার করবেন যে, এ তিনটি যুগের কোন একটি যুগেই অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা)এর জীবনে, তাঁর সাহাবীদের জীবনে এবং তাবেয়ীদের যুগে মিলাদের প্রচলিত এ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল না। এরূপ ইসলামী যুগে যে কাজ ইবাদত বা সোয়াবের কাজ হিসেবে প্রচলিত হয়নি, পরবর্তীকালের কোন লোকের পক্ষেই তেমন কোন কাজকে সোয়াবের কাজরূপে চালু করার কোন অধিকার দেয়া

www.pathagar.com

হয়নি।

আমাদের মধ্যকার অনেকেই বলেন, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ মিলাদের অনুষ্ঠান করতে দেখেছি- তাই আমরাও করবো। বাপ-দাদারা কেন, আরও অনেক পূর্ব-পুরুষের কাল থেকে (৫৮৬ হিজরি) এ মিলাদের প্রচলন শুরু হয়। আমরা যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূল (সা)কে ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীদেরকে মানদণ্ড ধরলেও এ মিলাদের ব্যাপারে তাদেরকে মানদণ্ড ধরতে চাই না। তাদের জীবনীতে না পেলেও যেন বাপ-দাদাদের জীবনীতে পাওয়ার কারণে এ ইবাদতে সোয়াবের কাজে আমরা থাকবো এ প্রত্যয় ঘোষণা করছি। অথচ আমরা জানি ইবাদতের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হলো- 'কোন ইবাদত শুরু করা যাবে না যতক্ষণ না তার দলিল পাওয়া যাবে'। (কুরআন ও হাদিসে)

রাসূল (সা)এর জীবনে ও তাঁর হাদিসের একটি ছোট সুন্নতের কথাই দেখুন- যেমন মুসাহাফা। যে মুসলমান পরস্পরের সাথে হাত মিলাবে এবং দোয়া পড়বে- তার গুনাহ মাফ করা হবে যতক্ষণ না তাদের হাত পৃথক হয়। রাসূলে করীম (সা) এমনটি বলে যাওয়ার এ ছোট সুন্নতেরও ভিত্তি কত মজবুত ইসলামী শরীয়ায়। কিন্তু যে ইবাদতের কোন দলিল পাওয়া যায়নি বা কেউই দিতে পারবে না সেরূপ ইবাদত পালনে আমরা কেন এতটা আগ্রহান্বিত হলাম তা বুঝে আসে না।

কুরআনের আয়াত দিয়ে ধোঁকাবাজি

সূরা মায়েদার ১১৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, "এই সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম দোয়া করল : হে খোদা, আমাদের প্রতি আসমান হতে একটি খাদ্যভরা পাত্র নাযিল কর যা খুশি ও আনন্দের উপলক্ষ হবে এবং তোমার নিকট হতে তা একটি নিদর্শন স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রিজিক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রিজেকদাতা।' – আয়াতের মায়েদা অর্থাৎ খাদ্যভরা পাত্র নাযিল হওয়ার এবং সে উপলক্ষে খুশি হওয়ার বিষয়ের সাথে মুহাম্মাদ (সা)এর নাযিল হওয়ার বিষয়ে এবং সে উপলক্ষে আনন্দ, খুশি অর্থাৎ ঈদ পালনের সম্পর্ক এ বিদয়াতীরা কোথায়, পেল তা বুঝে আসে না।

সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াত আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী বলুন : এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা (কুরআন) পাঠিয়েছেন। এ জন্য তো লোকদের আনন্দ-ফূর্তি করা উচিত। এটা সেই সব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ত করছে।"- এ আয়াতের পূর্বের আয়াত

'হে মানব সমাজ। তোমাদের কাছে তোমাদের খোদার পক্ষ থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে। এটা দিলের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়াত ও রহম নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (সূরা ইউনুস-৫৭) একটু খেয়াল করে পড়লে যে কোন লোকই উপলব্ধি করতে পারবে যে কোরআন নাযিল সম্পর্কে এখানে

www.pathagar.com

বলা হয়েছে এবং এ কুরআন প্রাপ্তির কারণে আনন্দ-স্ফূর্তি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার কথা যে বিদায়াতীরা কুরআন-এর পরিবর্তে এ আনন্দের কারণ হিসাবে রাসূল প্রেরণের কথা ধরে বসে আছে এবং এ আয়াতের যুক্তিকে রাসূলের জন্মদিনে মিলাদসহ অন্যান্য আনন্দ উৎসব এমনকি এ দিনকে শ্রেষ্ঠ ঈদ বলে প্রচার করছে। এছাড়াও সূরা মরিয়মের ১৫নং ও ৩৩ নং আয়াতে যথাক্রমে ইয়াহইয়া (আ) ও ঈসা (আ)এর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দিনে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণের বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা রাসূল (সা)এর জন্মদিনকেও এরূপ এমনকি এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সেদিনের আনন্দ উৎ াব পালনকে সোয়াবের মনে করে। অথচ রাসূল (সা) নিজে কখনো এরূপ করেননি বা .কান সাহাবীকে এরূপ করতে বলেন নি। বরং তিনি বলেছেন,

'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এরূপ উর্ধ্বে তুলো না যেমন করেছিল নাছারা জাতি ঈসা ইবনে মরিয়মকে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন : 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদিস রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরি করুক।' (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে এরশাদ করেছেন : 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হতে হবে।' (সূরা বনী ইসরাইল-৩৬)

মিলাদি ভাইরা কেউবা জেনে বুঝে আবার কেউ বা অন্যের কাছে শুনে এ ভিত্তিহীন এ অনুষ্ঠানের পক্ষে কুরআনের মিথ্যা দলিল কিভাবে পেশ করছেন তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন ও হেদায়েত দান করুন।

মিথ্যা হাদিস দিয়ে প্রতারণা

মিলাদি বিদয়াতীরা রাসূল (সা)এর চার খলিফার নামে মিথ্যা হাদিস রচনা করে তা মিলাদের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছে যা সত্যিই ধৃষ্টতাপূর্ণ। তাদের বিভিন্ন বইয়ে তারা লিখেছে -

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, যে কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের সময় মিলাদ শরীফ পাঠে এক দিরহাম খরচ করলো - সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে।

হযরত উমর (রা) বলেন, যে কেউ মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনকে বিশেষ ভাবে সম্মান করলো- সে যেন দ্বীন ইসলামকে জিন্দা করলো।

হযরত উসমান (রা) বলেন, যে কেউ মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের সময় মিলাদ শরীফ

www.pathagar.com

পাঠে এক দিরহাম খরচ করলো সে যেন বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।

হযরত আলী (রা) বলেন, যে কেউ মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনকে বিশেষ মর্যাদা দিল মিলাদ শরীফ পাঠের কারণে সে ঈমান না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেনা এবং বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(আন-নি'মাতুল কোবরা আলাল আ'লাম)।

উপরোক্ত চার খলিফার বাণী পড়ে তাও আবার একটি নির্দিষ্ট কিতাব (আল নি'মাতুল কোবরা আলাল আ'লাম) এর রেফারেন্সে যা সত্যিই খুবই বেদনাদায়ক। পৃথিবীর আলেমদের স্বীকৃত সিহাহ সিত্তার হাদিসে নেই এমনকি আলেমদের দ্বারা স্বীকৃত কোন কিতাব নয়, এমন কিতাবের কিইবা মূল্য আছে। আশ্চর্য লাগে যে, যারা এমন মিথ্যা হাদিস রচনা করে তা তাদের মিলাদের পক্ষে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছেন- আদালতে আখেরাতে তাদের জবাবটা কিরূপ হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন ও হেদায়েত দান করুন।

প্রচলিত মিলাদে রাসূলের শানে যা পড়া হয় তা সত্যিই দুঃখজনক। রাসূল প্রেমের নামে তা সুস্পষ্ট ভণ্ডামি। কথায় ও গানের ভাষায় রাসূলকে মহব্বত করলেও যাবতীয় ইসলাম বিরোধী সংগঠন ও দলের লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক। রাসূলের আনীত দ্বীনকে জিন্দা করার পরিবর্তে দ্বীনকে বিভক্ত ও দ্বীনের বিরোধী শক্তির হাতকে মজবুত করাই এদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এদের নৈতিক চরিত্রে রাসূল (সা)এর সুন্নত সমুন্নত নেই। লেবাসি বিষয়ে তারা সতর্কতা অবলম্বন করলেও সম্ভবত তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়। প্রতারকের প্রতারণা ধরা না পড়ার জন্যেই তারা এমন ছদ্মবেশী লেবাস ধারণ করে এমনকি সুফিবাদ ও মুহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবন দানকারীরূপে নিজেদেরকে জাহির করে।

মুসলমানদের এ বিষয়ে জানতে হবে যে, কোন ইবাদতের কাঠামোয় রাসূলকে স্মরণ করা হলে তা শিরকে পরিণত হবে। কেননা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, রাসূল নন। রাসূল (সা) সৃষ্টি এবং আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র আলেমুল গায়েব, রাসূল (সা) আলেমুল গায়েব নন। রাসূল (সা) ততটুকু গায়েব জানতেন যতটুকু গায়েব আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন। এব্যাপারে আল কুরআনে অনেক দলিল রয়েছে। হাদিসেও রয়েছে। রাসূলকে সর্বত্র হাজির নাজির জেনে ও মেনে মিলাদে কিয়ামের যে প্রচলন রয়েছে তা সুস্পষ্ট শিরক ও বিদয়াত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, '(মৃত্যুর পরে) তাদের সামনে পর্দা আছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত'। (সূরা মু'মিনুন-১০০)

www.pathagar.com

হানাফি কিতাব 'ফিকহে আকবরে' পরিষ্কার বলা আছে ' যে ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহর নবী (সা) গায়েব জানতেন, সে ব্যক্তি কাফের।' অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে 'যারা ধারণা করে যে মিলাদের মজলিসগুলোতে রাসূল (সা)এর রূহ মুবারক হাজির হয়ে থাকে, তাদের এ ধারণা স্পষ্ট শিরক।'

হানাফি মাযহাবের কিতাব 'ফাতওয়া বাযাযিয়া' তে বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাজির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের।' (মিলাদ মুহাম্মদী)

রাসূল (সা) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোকে পছন্দ করতেন না এবং এ ব্যাপারে সাহাবিদেরকে তিনি নিষেধ করতেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা) সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন : 'সাহাবীদের নিকট রাসূলে করীম (সা) সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তারা যখন রাসূলকে উপস্থিত দেখতে পেতেন, তারা তাঁর জন্যে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তাঁর তাজীমের উদ্দেশে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করেন।"

নবী (সা) নিজে মোটেই পছন্দ করতেন না চাইতেন না যে তাঁর তাজীমের জন্য লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তার প্রমাণ স্বরূপ হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, "নবী করীম (সা) লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। তখন আমরা তাঁর তাজীমের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী (সা) বললেন, অমুসলিম লোকেরা যেমন পরস্পরের তাজীমের জন্যে দাঁড়ায়, তোমরা তেমনি করে দাঁড়াবে না।"

কেউ কেউ রাসূল (সা) এবং এ কথাটিকে তাঁর স্বভাবজাত বিনয় বলে অভিহিত করে বলেন, তাই বলে আমরা কি দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান দেখাব না?

একথাটি যে কত মারাত্মক ও ভয়াবহ ভুল, তা হয়তো বা যারা বলেন তারা চিন্তা করেন না। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি যদি কৃত্রিমভাবে বলে থাকেন অথচ তিনি পছন্দ করতেন, খুশি হতেন যার মাধ্যমে সোয়াব সম্ভব- তাহলে প্রশ্ন এই যে, যে যে কাজ করলে মুসলমানরা সওয়াব পেতে পারে কিংবা যে যে কাজ তাদের করা কর্তব্য তার কোন্ কথাটি রাসূল (সা) গোপন করে গেছেন? তাঁর জন্যে তাজীমার্থে দাঁড়ানো যদি সওয়াবই হতো বা তা যদি নবীর প্রতি মুসলমানদের কর্তব্যই হতো তবে এভাবে নিষেধ করার কি কোন কারণ থাকতে পারে?

নবীর পক্ষে কৃত্রিমতা করা বা কৃত্রিমতা করেছেন বলে মনে করা দীনের মূলে কুঠারাঘাত সমতুল্য। কোন ঈমানদার লোকই এরূপ ধারণা করতে পারে না। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঈমানের পরিপন্থী। রাসূলের নির্দেশের বাইরে যেয়ে- তাকে মহব্বতের চেষ্টা করার পিছনে ইসলাম বিরোধিদের কিছু ষড়যন্ত্র রয়েছে- যার বাস্তবায়নে রয়েছে এসব মুখোশধারীরা। এছাড়াও সাহাবীদের চেয়ে রাসূলকে বেশি ভালবাসার আসনে আসীন হওয়ার আগ্রহ কেন তা সকলের চিন্তা করে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

তাই মিলাদের নামে এরূপ দলিলবিহীন সাওয়াবের কাজ তাও আবার বিভিন্ন গর্হিত চিন্তা চেতনাসহ খুবই নির্বুদ্ধিতা ও সুস্পষ্ট বিদয়াত। কেননা বিদয়াত হলো 'ঐ সকল নতুন সৃষ্টি যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। শারঈ অর্থে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরীয়তের কোন সহীহ দলিলের উপরে ভিত্তিশীল নয়। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা) বলেনঃ

'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তের এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করলো, যা তার মধ্যে নেই- তা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারি ও মুসলিম)। তিনি আরো বলেন, '.. তোমাদের উপরে পালনীয় হলো আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা সেটা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধর এবং মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদয়াত ও প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহি।" জাবির (রা) থেকে নাসাঈ শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে 'এবং প্রত্যেক গোমরাহির পরিণাম জাহান্নাম।'

পরিশেষে সকল মুসলমানের নিকট আমার অনুরোধ, আসুন আমরা এমন সব আমল করি– যা কুরআন, হাদিস এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বারা স্বীকৃত। এর বাইরে সুন্দর ও সোওয়াবের আশায় এসব শিরকি ও বিদআতি আমল বর্জন করি। রাসূল (সা)এর উপর সালাম ও দরূদ পাঠের বিষয়টি যে পদ্ধতিতে কুরআন হাদিস দ্বারা স্বীকৃত সেভাবে পড়ার চেষ্টা করি। সাথে সাথে বেশি বেশি ইস্তেগফার করি। কেননা রাসূল (সা)এর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর গজব নাযিল করবেন না যতদিন তার উম্মত ইস্তেগফার করতে থাকবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "তখন তো আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহর এটাও নিয়ম নহে যে, লোকেরা ক্ষমা (ইস্তেগফার) চাইবে, আর আল্লাহ তাদের উপর আযাব দিবেন।' (সূরা আল আনফাল-৩৩)

আল্লাহর রাসূল আমাদের মাঝে বর্তমান নেই। কিন্তু তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অবিকৃত আল কুরআন ও তাঁর বাণীসমূহের বিশাল ভাণ্ডার হাদিস রয়েছে। সেগুলোকে ধারণ করে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ করতে পারি। গজব ও যাবতীয় বালা-মুসীবত থেকে হেফাজতের জন্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা হিসাবে বেশি বেশি দরূদ ও ইস্তেগফার পাঠ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যাবতীয় আমল কবুল করুন। আমীন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা, আশহাদু আল্লাহ-ইলাহা ইল্লা আন্তা আসতাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলাইকা।' ◆

www.pathagar.com

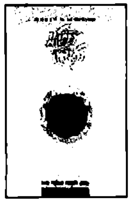

যত ভালোবাসা রাসূলের জন্য

আলতাফ হোসাইন রানা

নবুওয়াতের তখন একদম শিশুকাল। মক্কার ছোট্ট গণ্ডির ভেতর নবুওয়াতের বাতি তখন জ্বলছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার এই আলোকবর্তিকা গলা টিপে মারার চেষ্টায় রত। কিন্তু নবুওয়াতের আলোকশিখা যে, ভবিষ্যৎ আলোকিত শিশুদের তৈরি করছে। তারা সকল সহনশীলতা নিয়ে নীরবে আত্মরক্ষা করতে চলেছে। চলেছে নিজেদের তৈরি করতে।

এ রকম এক ভবিষ্যৎ আলোকিত শিশু হযরত শোয়াইব (রা)। শোয়াইব (রা) ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছেন অনেক সহনশীলতার মধ্য দিয়ে। তার উপর দিয়ে অত্যাচারের স্টীম রোলার চলেছে। আর এসব নির্যাতন, অত্যাচার নীরবে সয়ে যাচ্ছেন হযরত শোয়াইব (রা)। আল্লাহর এই বীর সৈনিকের উপর এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতন কেমন করে, কতোদিন কেইবা সহ্য করে যাবেন? যেমন সহ্য করতে পারেননি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। প্রিয়নবীর মন কেঁদে উঠলো সাহাবা হযরত শোয়াইব (রা)-এর অবস্থা দেখে। সে সময় মক্কা থেকে হিজরতের জন্য অনেক জনকে'ই আমাদের প্রিয়নবী পরামর্শ দিতেন। সকলের মতো একদিন মহানবী (সা) সাহাবা শোয়াইব (রা)-কেও মক্কা থেকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নির্দেশকে অমান্য করে এমন ভাবনা কার হতে পারে? হযরত শোয়াইব (রা) মহানবীর নির্দেশকে খুশী মনে কবুল করে নেন। মহানবীর (সা) আদেশের কাছে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কাছে, খোদার সন্তুষ্টির কাছে, স্বদেশের মায়া, স্বীয় সহায়-সম্পদের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মায়া মুহূর্তে উঠে গেলো। তার যতো ভালোবাসা সবটুকু ছিলো আল্লাহ আর রাসূল (সা)-এর জন্য উৎসর্গীকৃত।

প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক তখন শোয়াইব (রা)। কোন কিছুরই অভাব ছিলো না তার। এত বিত্ত-সম্পদ সবকিছু ফেলে কাউকে কিছু না বলেই একদিন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে শুধু পরিধানের পোশাকটুকু আর আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের যখন কঠিন সময় এবং ইসলামের ইতিহাসে যাকে বলা হতো অন্ধকার যুগ, সে সময়ে মক্কার চারিধারে গুপ্তচরের বেশ আনাগোনা ছিলো। তাদের নজরদারী ছিলো সকলের উপর। সাহাবা হযরত শোয়াইব (রা) এ যাত্রা ধরা পড়ে যান কুরাইশ গুপ্তচরের চোখে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো একদল কুরাইশ। তারা শোয়াইব (রা)-কে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। শোয়াইব (রা)-কে কুরাইশরা মক্কায় ধরে নিয়ে যাবে। কারণ, তাদের ধারণা সাহাবা শোয়াইব মক্কার বাইরে গিয়ে দল পাকাবে। মুসলমানদের দল ভারী করবে। সুসংগঠিত করবে। কুরাইশরা তা হতে দেবে কেন?

মহানবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রিয় সাহাবা শোয়াইব (রা)ও দমে যাবার লোক নন। তিনিও ছিলেন অনেক শক্তিধর। একজন তীরন্দাজ। শোয়াইব (রা) একাই রুখে দাঁড়ালেন মারমুখো কুরাইশ দলটির বিরুদ্ধে। চোখে-মুখে তার এতটুকু ভয় নেই। হযরত শোয়ইব (রা) কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললেন– শোনো কুরাইশ দল। তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গেলে তরবারী আছে। তরবারী ভেঙ্গে গেলে কিংবা হাত ছাড়া হলে তারপর তোমরা আমাকে যা খুশী করতে পারো। তার চেয়ে বরং ভালো, তোমরা মক্কায় আমার যা কিছু ধন সম্পদ যেখানে যা রয়েছে সব নিয়ে নাও আর আমিও চলে যাই। আমাকে যেতে বাধা দিও না।

গুপ্তচর কুরাইশ দল ভাবলো, হযরত শোয়াইব (রা)-কে বন্দি করা সহজ ব্যাপার নয়, অনেক বিপদজনক। তার সাথে সংঘর্ষে আমাদেরও অনেক লোক মারা পড়তে পারে। তার চেয়ে তাকে ছেড়ে দিলেই বরং ভালো। তার প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে, সেসব পাওয়া যাবে।

দুনিয়ালোভী কুরাইশ দল পথ ধরলো মক্কার। আর ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ, মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে রিক্ত নিঃস্ব রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রিয় সাহাবা হযরত শোয়াইব (রা) অনিশ্চিতের পথে পাড়ি জমালেন হিজরতের জন্য।

মহানবী (সা)-এর হিজরতের পর মদিনার সন্নিকটবর্তী কুবা পল্লীর এক জায়গায় একদিন উঁচু মর্যাদাবান, জ্ঞানতাপস, ইসলামের বীর সৈনিক, রাসূল মুহাম্মাদের (সা) প্রিয় সাহাবা হযরত শোয়াইবের (রা) সাক্ষাত হলো আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে। রাসূল মুহাম্মাদ (সা) শোয়াইব (রা)-কে কাছে ডাকলেন। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি শোয়াইব (রা)-র এমন উদারতা এবং ভালোবাসা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শোয়াইব (রা) কে বললেন– ধনসম্পদ-ঐশ্বর্য আর স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে বড় লাভের ব্যবসাই করলে শোয়াইব। ◆

www.pathagar.com

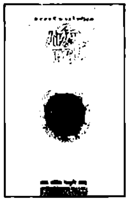

প্রথম বিজয়ী বীর

নাসীমুল বারী

সর্দাররা সব ক্ষেপে আছে।

শত বছরের ঐতিহ্য বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মুত্তালিবের নাতিটা কিযে শুরু করছে! না পারছে মারতে। না পারছে তাড়াতে।

কাবা ঘরের পাশেই আবু সুফিয়ানের আড্ডাখানায় সর্দাররা বসেছে। আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, জহল, ওয়াইল, সাইবা, আসওয়াদ-বিন-মুত্তালিব প্রমুখ সেরা সেরা সব সর্দাররাই উপস্থিত। আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। বাপ দাদার ধর্মবিশ্বাস, দেব-দেবীকে অসম্মান করছে- তা তো হতে পারে না।

উৎসুক্য অনেক জনতাও জমেছে সর্দারদের সিদ্ধান্ত জানতে। এমনি সময় এক নতুন আগন্তুককে দ্রুত এ দিকে আসতে দেখে। সর্দাররা একটু নড়ে চড়ে বসে। জনতাও তাকায় তার দিকে।

কে সে মেহমান?

কে করবে তাকে মেহমানদারী? আরব তথা মক্কাবাসীর মেহমানদারীর সুখ্যাতি আছে অনেক।

লোকটি কারো সাথে কোন কথা না বলে হন হন করে ঢুকে যায় কাবা ঘরে। তারপর চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর নবী।'

কুরাইশ নেতারা সব হতচকিয়ে গেলেন।

কার এমন দুঃসাহস!

বাঘা বাঘা সব সর্দারদের সামনে এভাবে তাদের বিশ্বাস-ঐতিহ্য-ধর্মকে পদদলিত করে

www.pathagar.com

মুহাম্মাদের কথা বলছে? কে দিল তাকে এমন সাহস?
চমকের ঘোর না কাটতেই সর্দাররা জনতাকে উসকে দেয় লোকটাকে ধরতে। মারতে।

আর যায় কোথায়!

শত শত জনতার গণধোলাইয়ে লোকটি কাবু হয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। এমনি সময় মক্কারই অতি পরিচিত একজন আব্বাস ভিড়ের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে এলেন! লোকটির কাছে এসেই চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, আরে থামো! করছ কী তোমরা? কী বিপদই না ডেকে আনলে?

- কী হয়েছে? কী! সবাই থমকে যায়।
- আরে তোমরা কাকে মারছ?
- ঐযে আমাদের জাতশত্রু মুহাম্মাদের নতুন চেলাকে।
- আরে না না, ওযে আবুযর গীফার গোত্রের মানুষ। জান না তোমরা, আমাদের এখন কী সমস্যা হবে?
- কী হবে?
  উত্তেজিত জনতা জানতে চায়
- আরে মূর্খের দল! তোমরা জান না ঐ গীফার গোত্রের এলাকা দিয়েই এ আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথ প্রসারিত। ওরা যদি এখন প্রতিশোধ নেয়, তবে এ মক্কাবাসীকে ব্যবসা-বাণিজ্য বাদ দিয়ে উপোসে মরতে হবে!

আব্বাসের ভয় মেশানো এমন কথায় জনতা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আব্বাস লোকটিকে তোলে। তারপর ক্ষতস্থান ধুয়ে শুশ্রুষা করে অতি আদর যত্নে।

ঘটনাটা ভয়াবহই হতো যদি আবু যর বিগড়ে গিয়ে তার গোত্রকে এর প্রতিশোধ নিতে বলত। কিন্তু তিনি তো তেমন নন।

মক্কার পাশেই গীফার গোত্রের অধিবাসী আবুযর। আরবসহ সারা জাহানই তখন বহু দেব-দেবীর আরাধনায় ছেয়ে আছে। মূর্তি আর অগ্নি উপাসকের সমাজে দু'একজন অবশ্য ব্যতিক্রম। তেমন একজন গীফার গোত্রের আবুযর। তার কাছে দেব দেবী অসার মূর্তি এসব কিছুই মূল্যহীন মনে হয়। তিনি মনে করেন এ পৃথিবী একজনই বোধহয় নিয়ন্ত্রণ করে, পরিচালনা করে।

আবুযর তাই দেব দেবীর উপাসনায় বিশ্বাসী নয়। স্বভাব চরিত্রেও সমাজের একজন চমৎকার মানুষ। তাই সবাই তাকে সমীহ করে।

সেই আবুযর লোকমুখে শুনে মক্কায় মুহাম্মাদ নামে এক লোক আছে। সে মানুষকে মূর্তিপূজা, দেব দেবীর পূজা করতে নিষেধ করছে।

www.pathagar.com

ঘটনাটা শুনে চমকে ওঠে আবুযর।

সত্যি হলে নিজের মনের সাথেই মিশে গেছে লোকটির চিন্তাধারা।

খবরটা শুনার সাথে সাথেই মনটা উসখুশ করছে সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে। ছোট ভাই আনিসকে ডেকে বলে মক্কায় যেতে। মুহাম্মাদের সঠিক খোঁজ খবর নিয়ে আসতে। বড়ভাই আবুযরের সে আদেশ পেয়েই আনিস রওয়ানা দেয় মক্কার পথে।

উটের পিঠে চলছে আনিছ।

ধু ধু মরুর বুক চিরে উটটি চলছে আনিসকে নিয়ে মক্কার দিকে। মক্কায় নতুন লোকের আগমন ঘটেছে। বড় ভাইয়ের আদেশ সে লোকটির খোঁজ খবর জানতে হবে; বুঝতে হবে। কী যেন লোকটির নাম? এই ভুলে গেলাম। মনে এসেও আসছে না।

নামটা প্রচলিত কোন নাম নয়- তাই হয়ত মনে করতে পারছে না আনিছ।

উটের উপর বসেই ভাবতে থাকে আনিছ। হঠাৎ মনে পড়ে মুহাম্মাদ। হ্যাঁ মুহাম্মাদই। বড় ভাইজান তো তা-ই বলেছে। উটটাকে তাড়া দেয় দ্রুত চলতে।

মক্কায় গিয়ে জানতে হবে আসলেই মুহাম্মাদ নামের কেউ আছে কিনা। থাকলে কী করে, কী কথা বলে। তার চালচলন কেমন? ধর্ম বিশ্বাসটা কী? জানতে হবে সবই।

উটটিও চলছে বেশ দ্রুত।

নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছল মক্কায়। নতুন আগন্তুককে দেখে এক মক্কাবাসী এগিয়ে এসে জানতে চায়- হে অতিথি তুমি কোত্থেকে এলে?

আমি গীফার গোত্র থেকে এসেছি। তোমাদের এখানে মুহাম্মাদ নামের কেউ আছে নাকি? থাকলে আমি দেখা করতে এসেছি।

হায় হায় মেহমান, তুমি এ কী কথা বললে? সে তো আস্ত যাদুকর। তোমায় যাদুর জালে আটকে ফেলবে। ভয় পায় নি আনিছ।

সে খুঁজে বের করেছে মুহাম্মাদকে। তার সাথে মিশেছে। ভাল করে পরখ করেছে তার কাজকর্মকে। তারপর নিজ গোত্রে বড় ভাইয়ের কাছে ফিরে এসেছে। আবুযর তাকে দেখে বলে– কী দেখে এলে?

- আমি এক যথার্থ মানুষই দেখেছি। তার প্রতিটি কাজই যথার্থ। মক্কার লোকদের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সে।
- আর?
- তিনি নিজেকে আল্লাহর বাণী বাহক বলে দাবি করে।

মক্কার লোকজন তাঁর সম্পর্কে কী বলে?

কেউ তাকে কবি বলে। কেউ যাদুকর, কেউবা গণক।

www.pathagar.com

তোমার কী মনে হয়?

আমার মতে তিনি একজন সত্যবাদী মানুষ এবং তার শত্রুরাই মিথ্যেবাদী।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবুযর চুপ হলেন। মনে মনে ভাবলেন- লোকটি কি তাহলে সত্যি সত্যি আল্লাহর বাণী বাহক?

কেটে গেল কদিন। ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন এ ঘটনায়। এখন মুহাম্মাদকেই স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছে হয় আবু যরের। একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি নিজেই মক্কায় যাবেন। পরখ করে দেখতে হবে মুহাম্মাদ নামের লোকটিকে। সত্যি কি আল্লাহর বাণী বাহক? একত্ববাদী? সত্যবাদী?
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ।
রওয়ানা দিলেন মক্কার পথে।

ধু ধু মরু পথ মাড়িয়ে আনিছের মতো তিনিও যথাসময়ে পৌছুলেন মক্কায়।

মক্কায় পৌছেই দেখা হয় মক্কার অত্যন্ত সাহসী, তেজস্বী, মেধাবী, বীর যুবক আলীর সাথে। তাকে মনের কথা বলার সাথে সাথেই সে চুপি চুপি নিয়ে যায় মুহাম্মাদের কাছে।

মুহাম্মাদকে দেখে অভিভূত হয়ে যান আবুযর। প্রশান্তিতে ভরে যায় মন।

ইসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় নিয়েই বীরের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে মুহাম্মাদ গৃহ থেকে দ্রুত কাবা ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

দীর্ঘক্ষণ আব্বাসের শুশ্রুষায় জ্ঞান ফিরে আসে আবু যরের। তিনি আবুযরকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। রাত কাটান ওখানেই। পরদিন একটু সুস্থ বোধ করেন তিনি। না আর দেরী নয়- আজও আবার বিজয় ঘোষণা দিতে হবে ইসলামের। কারো নিষেধ মানতে রাজি নয় আবুযর। তার মনে ভয় নেই, ডর নেই। ইসলাম গ্রহণ করেছে সে, অতএব আল্লাহ আছে তার সাথে।

আবার গিয়ে প্রবেশ করেন কাবা ঘরে। আজ আরও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দেন গতকালের মতোই।
না, আজ কেউ বাধা দেয়নি তাকে।
ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য বিজয় ঘোষিত হল।

বীরদর্পে বিজয়ীর বেশে আবুযর ফিরে গেলেন নিজ দেশে ইসলামের সুমহান শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে। ◆

www.pathagar.com

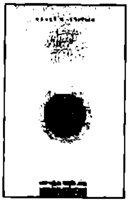

যিনি চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর

আবেদুর রহমান

হযরত আলী (রা) রাসূলে করীম (সা) এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি অস্বাভাবিক লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝারি ধরনের গঠন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাঁর চুল কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার খাড়াও ছিল না- ছিল উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের। তাঁর কপোল মাংসলও ছিল না আবার শুকনোও ছিল না বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের ছিল। তাঁর কপাল ছিল প্রশস্ত, গায়ের রং ছিল গোলাপি গৌর-এর মিশ্র রূপ। চোখ সুর্মারঙ্গা লালচে, ঘন পল্লব বিশিষ্ট। বুকের উপর নাভি থেকে হালকা চুলের রেখা, দেহের অন্য অংশ লোমশূন্য। হাত পা মাংসল, চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন। তাঁকে হেঁটে যেতে দেখে মনে হতো তিনি যেন উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছেন। কোন দিকে লক্ষ্য করলে পুরো মনোযোগের সাথেই লক্ষ্য করতেন। উভয় কাঁধের মাঝখানে তাঁর মহরে নবুয়ত ছিল ।

উম্মে আবাদ স্বামীর কাছে রাসূল (সা) এর যে পরিচয় তুলে ধরেন তা নিম্নরূপ : চমকানো রং, উজ্জ্বল চেহারা, সুন্দর গঠন, সটান সোজাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়াও নয়। অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক গঠন। লম্বা পলক, ঋজু কণ্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, সাদা কালো চোখ, চমকানো কালো চুল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাছার (রা) বলেন, নবী (সা) এর নিচের ঠোঁটের সংলগ্ন দাড়িতে কয়েকটি সাদা হয়ে গিয়েছিলো।

হযরত আবু তোফায়েল বলেন, তিনি ছিলেন গৌর রং এর, চেহারা ছিল মোলায়েম। তার উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের।

হযরত জাবির ইবনে ছামুরা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) এর পেশী ছিল চওড়া, চোখ ছিল লালচে, পায়ের গোড়ালী ছিল সরু ধরনের।

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এমন কোন রেশম দেখিনি, যা নবী (সা) এর হাতের তালুর চেয়ে বেশি নরম ছিল। এমন কোন মেশক আম্বর শুকিনি যা নবী (সা)এর সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুবাসিত ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা)এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোন মানুষ আমি দেখিনি। মনে হতো সূর্য যেন তার চেহারায় জ্বল জ্বল করছে। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে যমিন যেন তাঁর পায়ে সংকুচিত হয়ে আসতো। হাঁটার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার। হযরত বারা ইবন আযেবকে (রা) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নবী (সা)এর চেহারা কি তলোয়ারের মতো ছিল? তিনি বললেন, না বরং তাঁর চেহারা ছিল চাঁদের মত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী (সা) এর চেহারা ছিল গোলাকার।

রবি বিনতে মোয়াওয়েজ (রা) বলেন তোমরা যদি রাসূল (সা) কে দেখতে তখন মনে হতো যে, যেন উদিত সূর্যকে দেখছ। হযরত জাবির ইবনে ছামুরা (রা) বলেন, এক চাঁদনি রাতে আমি নবী (সা)কে দেখেছিলাম। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিল লাল পোশাক। আমি একবার নবী (সা)এর প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমার নবী (সা) চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। দেখে মনে হতো যেন এক টুকরো চাঁদ।

একবার তিনি হযরত আয়েশার (রা) কাছে অবস্থান করছিলেন। ঘামে চেহারা ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়িশা (রা) আবু কোবায়ের হাজলির এই কবিতা আবৃত্তি করলেন,

"তাঁর চেহারা তাকিয়ে দেখতে পেলাম
চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে দেখে এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

"ভালোর পথে দেন দাওয়াত পূরণ করেন অঙ্গীকার
চতুর্দশীর চাঁদ, লুকোচুরি খেলে যেন অন্ধকার।"

তিনি যখন ক্রোধান্বিত হতেন তখন তাঁর চেহারা লাল হয়ে যেতো, মনে হতো উভয় কপালে আঙ্গুরের দানা যেন নিংড়ে দেয়া হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) এর ঘাম ছিল মুক্তোর মতো। হযরত উম্মে যুলহিম (রা) বলেন, এই ঘামেই ছিল সবচেয়ে উত্তম খুশবু। হযরত আবু যোহায়রা (রা) বলেন আমি রাসূল (সা) এর হাত আমার চেহারার উপর রেখেছিলাম সেই সময় আমি অনুভব করলাম যে, সেই হাত বরফের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা এবং মেশকের চেয়ে বেশি খুশবুদার। হযরত জাবের ইবনে

www.pathagar.com

ছামুরা (রা) বলেন, নবী (সা) আমার কপালে হাত রেখেছিলেন এতে আমি এমন শীতলতা এক সুবাস অনুভব করলাম যে, মনে হলো তিনি তাঁর পবিত্র হাত আতরের আতরদানি থেকে বের করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা)এর সামনের দুটি দাঁত পৃথক পৃথক ছিল। তাঁর কথা বলার সময় উভয় দাঁতের মধ্য থেকে আলোক আভা বিচ্ছুরিত হতো।

তাঁর গ্রীবা ছিল রৌপ্যের নির্মিত পাত্রের মত পরিচ্ছন্ন চোখের পলক ছিল দীর্ঘ। দাড়ি ছিল ঘন, ললাট ছিল প্রশস্ত, ভ্রূ পৃথক, নাসিকা উন্নত, বাহুতে কিছু লোম ছিল। পেট এবং বুক ছিল সমান্তরাল, বুক প্রশস্ত, হাতের তালু প্রশস্ত। মধ্যম গতিতে তিনি পথ চলতেন।

তথ্যপঞ্জি

১. সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড

২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড

৩.মেশকাত - ১ম খণ্ড

৪. মেশকাত ২য় খণ্ড

৫. তিরমিযি ২য় খণ্ড

৬. রাহমাতুললিল আলামিন ২য় খণ্ড

৭. শামায়েলে তিরমিযি ২য় খণ্ড

৮. ইবনে হিশাম- ১ম খণ্ড

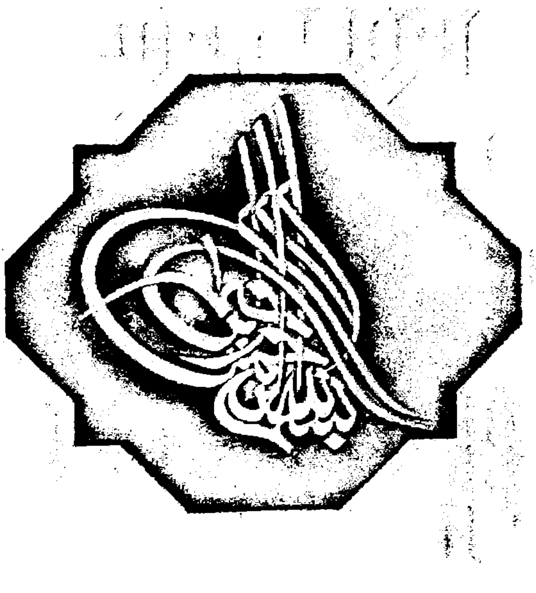

www.pathagar.com

খাবার স্যালাইন

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানাজনিত পানি স্বল্পতা পুরণের জন্য ইবনে সিনা'র নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত খাবার স্যালাইন ব্যবহার করুন।

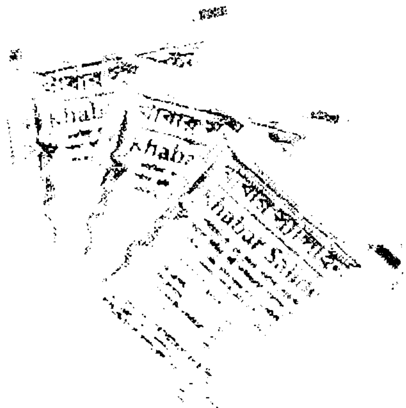

ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ (আইপিআই) বাংলাদেশের মানুষকে সেবা করার মহান প্রত্যয় নিয়ে মানুষের দ্বোর গোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে। দুঃস্থ মানুষের খেদমত এবং দেশ গড়ার অঙ্গীকার আইপিআই -এর প্রেরণার উৎস এবং চালিকা শক্তি। কাঁচামাল আমদানী থেকে শুরু করে ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল স্তরেই গুণগতমান ও সততা সংরক্ষণ করা ইবনে সিনার প্রাণশক্তি। এক্ষেত্রে আইপিআই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং মান নিয়ন্ত্রণে **WHO** প্রণীত **cGMP** অনুসরণে আপোষহীন।

IBN SINA

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ

ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

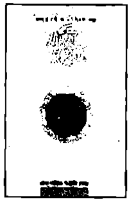

শিশুদের প্রতি রাসূল (সা) এর ভালবাসা

আহসান হাবিব বুলবুল

"রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ" (আল কুরআন)

হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন আল্লাহর নবী; একই সঙ্গে মানুষ। বিশ্বমানবের ইতিহাসের মহানবীর স্থান সবার ওপরে। তাঁর তাকওয়া অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য আমাদের সকলের জন্য অনুসরণযোগ্য। রাসূল (সা) ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ। এই উভয় পরিচয়ে দরিদ্র, দুর্বলের নিরাশ্রয় অত্যাচারিত এবং সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানবতার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করে গেছেন। শিশু কিশোররাও মহান নবীর এই প্রোজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

শিশুর জন্য হ্যাঁ বলুন– শিশু অধিকার রক্ষার প্রশ্নে দুনিয়াব্যাপী আজ এই শ্লোগানটি উচ্চারিত হচ্ছে, রাসূল (সা) আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে শিশুদের প্রতি সেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে গেছেন।

একদা রাসূল (সা) একদল শিশুর সঙ্গে আনন্দ করেছেন। শিশুরাও নবীজিকে ঘিরে খুশিতে মেতেছে। এমন সময় সেখানে এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হল। সে বললো, 'শিশুদের নিয়ে এমন আমোদ-আহলাদ করা আমার পছন্দ নয়।"– রাসূলের হাসি-খুশি মুখখানি মলিন হয়ে গেল। তিনি শুধু বললেন, 'যে ব্যক্তির হৃদয়ে মায়া নেই, আল্লাহ যেন তাকে দয়া করেন।" (মুসলিম)

রাসূল (সা) শিশুদের সুখ-দুঃখ সমান ভাগ করে নিয়েছেন। ঈদের দিনের একটি ঘটনা। রাসূল (সা) নামাজ শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন। হঠাৎ শত আনন্দের মাঝেও কান্নার সুর ভেসে এল। মহানবী দেখলেন, পথের ধারে একটি শিশু বসে বসে কাঁদছে। তিনি ছুটে গেলেন শিশুটির কাছে। আদর করে বললেন, কি হয়েছে

www.pathagar.com

তোমার, কাঁদছো কেন? ছেলেটি বললো, যুদ্ধে আমার আব্বা মারা গেছেন। আম্মাও বেঁচে নেই। আজ ঈদ ....।' –রাসূল (সা) ছেলেটিকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, "আমিও ছোট বেলায় আম্মাকে হারিয়েছি। আর আব্বাকে তো দেখিইনি।' – শিশুটি মহানবীর কোলে মাথা রাখলো। রাসূল (সা) বললেন, 'আজ থেকে আমি তোমার আব্বা, আমার স্ত্রী তোমার মা আর কন্যা ফাতিমা হবে তোমার বোন। কেমন! তুমি খুশি হবে তো!"– কি অপূর্ব অফুরন্ত ভালবাসা।

মহানবী কোন শিশুর মনের কষ্ট প্রশমনে শিশুর মতই আচরণ করেছেন। আরেকটি ঘটনা : ছোট শিশু আবু উমায়র। তার একটি পোষা পাখি ছিল। পাখিটি বেশ রঙিন। আরবিতে লাল পাখিকে 'নুগায়র' বলে। ও বড় আদর করত পাখিটি। আবু উমায়র পাখিটি নিয়ে প্রায়ই প্রিয় নবী রাসূলের (সা) কাছে আসতো। রাসূল (সা) তাকে আদর দিতেন। ওর লাল টুকটুকে পাখিটি নিয়ে খেলা করতেন। একদিন উমায়ের পাখিটি অসুখ হয়ে মারা গেলো। এতে সে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের কাছে এল। নবীজি অবস্থা আঁচ করতে পারলেন। তিনি উমায়রকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর সুন্দর করে ছড়া কাটলেন, 'ওহে আবু উমায়র, কি হল তোমার নুগায়র?'

নবীজির ছন্দ ও সুর শুনে সে হেসে ফেলল। (বুখারীও মুসলিম)

রাসূল (সা) শিশু মনের অভিব্যক্তি বুঝতে পারতেন। তাদের চাওয়া-পাওয়া মান-অভিমান সবই আপন করে নিতে পারতেন। তাই শিশুরাও একাকার হয়ে যেত রাসূলের (সা) ভালবাসায়। রাসূল (সা) বলেছেন 'শিশুরা আল্লাহর দেয়া খোশবু। ওরা ফুলের মত।' (মিশকাত)

বর্তমানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শিশুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতিসংঘ শিশুদের রক্ষায় বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট। আল্লাহর রাসূল (সা) অনেক আগেই শিশুদের যুদ্ধে ব্যবহার ও হত্যা না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বদর যুদ্ধের ঘটনা : রাসূল (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিজে তদারকি করছেন। দেখা গেল, যোদ্ধাদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক বালকও প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূল (সা) বালকদের জিহাদী প্রেরণা দেখে খুশি হলেন। তিনি এই কচি শিশুদের ঘরে ফিরে যেতে বললেন। অবশ্য উমাইয়ার নামক একটি শিশুর দৃঢ় সংকল্পের জন্য শেষে তাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

অন্য এক যুদ্ধের কথা। সে যুদ্ধে কয়েকজন শিশু মারা যায়। তারা ছিল শত্রুপক্ষের। এ খবর এসে পৌছলে রাসূলের (সা) প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি খুবুই আফসোস ও দুঃখ করতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে একজন সৈনিক বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি যাদের জন্য এত মর্মবেদনা ভোগ করছেন তারা বিধর্মীদের সন্তান। রাসূল তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, 'এখন থেকে সাবধান হও। কখনো শিশুদের হত্যা করবে

www.pathagar.com

না। প্রতিটি শিশুই নিষ্পাপ ওরা ফুলের মত।"

হাদিসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা থেকে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) শিশুদের প্রতি উদার মনোভাব ও সৌহার্দ্যের পরিচয় পাই। মসজিদে নববীর সামনে নিয়মিত খেলতে আসা এক দুরন্ত ইয়াহুদি বালককে কয়েকদিন দেখতে না পেয়ে রাসূল (সা) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি সাহাবীদের খোঁজ নিতে বলেন। জানা যায়, ছেলেটি অসুস্থ। তিনি তাৎক্ষণিক সেই ইয়াহুদি বালকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাকে নিজ হাতে তুলে খাওয়ান। তার সেবা শুশ্রূষায় বালকটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

রাসূল (সা) সব সময় শিশুদের অগ্রাধিকার দি:তন। তিনি যখন কোন বৈঠকে বসতেন, তখন তাঁর কিছু সাহাবা তার চারপাশে বসে েন। তাদের মধ্যে একজনের একটি ছোট বালক ছিল। ওই শিশুটি রাসূলের কাছে আসতো পেছন দিক থেকে। কিন্তু নবীজি ছেলেটিকে তার সামনে এনে বসাতেন।

রাসূল (সা) কখনো সফরে বের হলে কোন শিশুকে দেখলে তাকে উটের পিঠে উঠিয়ে নিতেন এবং তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতেন। এসব ঘটনা থেকে শিশুদের প্রতি রাসূলের (সা) অকৃত্রিম ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশু ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে থাকে। এসব শিশু কখনো দুর্ঘটনায় পতিত, কখনো মালিকের দ্বারা নির্যাতিত হয়। রাসূল (সা) তার অধীনস্তদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। আনাস বিন মালিক (রা) এর বর্ণনায় জানা যায়, দশ বছর বয়সে তার মা তাকে রাসূলের (সা) খেদমতে পেশ করেন। আনাস প্রায় দশ বছর রাসূলের (সা) কাছে ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, 'এই দীর্ঘ সময়কালে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কোন ধরনের মেজাজ দেখাননি। অথবা আমার প্রতি কোন অভিযোগসূচক ভাষা ব্যবহার করেননি। কোন ক্ষতি করে বসলেও রাসূল (সা) কখনো আমায় তিরস্কার করেননি। বরং পরিবারের সদস্যদের উপদেশ দিয়েছেন এটাকে ভুলে যেতে। এই ঘটনা ঘটবার ছিল তাই ঘটেছে। ক্ষতির জন্য তাকে (আনাসকে) দোষী সাব্যস্ত করা উচিৎ হবে না। (বুখারী)

খ্রিস্টান বালক জায়িদ। শৈশবে সে অপহৃত হয়। দস্যুরা তাকে বিক্রি করে দেয়। অনেক হাত ঘুরে জায়িদ শেষ পর্যন্ত রাসূলের (সা) স্নেহ ছায়ায় আসে। খোঁজ পেয়ে একদিন জায়িদের আব্বা ও চাচা রাসূলের (সা) কাছে আসেন, জায়িদকে ফিরিয়ে নিতে। রাসূল (সা) জায়িদকে ডাকলেন। সে তার আব্বা ও চাচাকে চিনতে পারলো। পিতার করুণ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) জায়িদকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু জায়িদ বললো, আমি যাব না। আপনি আমার আব্বা আম্মার চেয়েও বেশি প্রিয়। আমি আপনাকে ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসব।

www.pathagar.com

আব্বা ও চাচা যখন প্রত্যক্ষ করলেন, তাদের পুত্র স্বাধীনতার চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে থাকাকে বেশি পছন্দ করছে, তখন তারা সন্তোষ্টচিত্তে মক্কা ত্যাগ করলেন। জায়িদের প্রতি রাসূলের (সা) আদর ও স্নেহের কারণেই জায়িদ পিতা-অভিভাবক ও স্বাধীনতার চেয়ে রাসূলকেই অধিক পছন্দ করেছিল।

রাসূল (সা) বিদায় হজের ভাষণে বলেন, তোমরা তোমাদের অধীনস্তদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দিবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দিবে। রাসূল (সা) শিশুদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তিনি তাদের অভিবাদন করতেন, বলতেন, সালামু আলাইকুম। (বুখারী)

রাসূল (সা) যেমন শিশুদের ভালবাসতেন, তেমনি শিশুরাও মহানবীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। মদিনায় হিজরতের ঘটনা : রাসূল (সা) এক সোনালি প্রভাতে মদিনার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেন। চারদিকে আল্লাহর নবীর আগমন বার্তা ঘোষিত হল। মদিনায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচতে নাচতে রাস্তায় নেমে আসে রাসূল (সা)কে এক নজর দেখবে বলে।

রাসূল (সা) তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ফুলের মত শিশুদের কাছে টেনে নিলেন। সোহাগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, "তোমরা আমায় ভালবাসবে তো!"

শিশুরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'নিশ্চয় ভালবাসব। প্রয়োজন হলে আপনার জন্য আমরা জীবন দেব। আপনি আমাদের পড়শি।" (রাসূলুল্লাহর সংগ্রামী জীবন)

এভাবেই রাসূলুল্লাহর (সা) প্রোজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েছিল শিশুরা। হয়েছে বিশ্ব ভুবন। ◆

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানীর রাহীম

আইকাব হাউজিং

Plot — Shop — Plot

Location Map of ICAB City

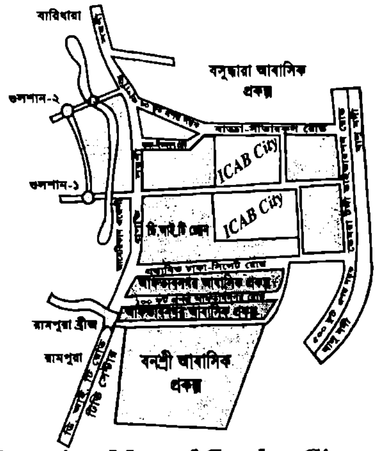

★ বারিধারার নিকটস্থ প্রকল্প।

★ অত্র বিশাল মাঠে দেশের বড় হাউজিং প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকল্প থাকায় এবং প্রকল্পের পূর্বদিকে সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনায় পূর্বাচল উপশহর নামে একটি উপশহর গড়ে উঠায় *ICAB CITY* এলাকার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেছে নিন
আপনার স্বপ্নের আবাস...

Location Map of Garden City

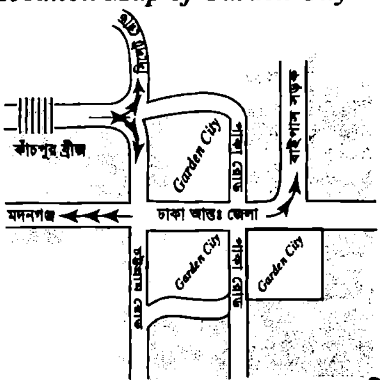

★ ঢাকার আশপাশের যে কোন উপশহরের তুলনায় *Garden City* -কে ঢাকার আভ্যন্তরীণ প্রকল্প বলেই ধরা যায়।

★ অচিরেই ঢাকা আন্তঃজেলা বাইপাস সড়ক চালু হয়ে গেলে সারা বাংলাদেশের গাড়ী *Garden City* এলাকায়ই পাওয়া যাবে।

আইকাব-এর প্লট ক্রয় মানে অধিক লাভের ব্যবসায় বিনিয়োগ

আপনার কাঙ্খিত *Plot, Shop* -এর জন্য আইকাবের প্রতিনিধিদের সাথে বা সরাসরি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার ঠিকানা উল্লেখ করে পত্র পাঠালে কোম্পানী আপনার ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাঠিয়ে দেবে।

Mohammod Ullah
Managing Director
ICABCompany (Pvt.) Ltd.

59/3-2, Purana Paltan, Dhaka-1000
Tel : 9566903, 9566519
E-mail : icabl@bdonline.com

www.pathagar.com

পরিবর্তীত সিলেবাসে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর!!

বের হয়েছে বের হয়েছে বের হয়েছে বের হয়েছে

মিল্লাত

Communicative
Model Question

গাইড সিরিজ প্রশ্ন সাজেশান্স

দাখিল আলিম ফাযিল   দাখিল আলিম ফাযিল   পঞ্চম শ্রেণী   অষ্টম শ্রেণী   ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

মিল্লাত একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজস্ব কম্পিউটার, ডিজাইন, প্রেস ও সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে, মাদরাসা ছাত্রদের কল্যাণে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু প্রকাশনা করার চেষ্টা করে আসছে। মেধাবীদের আমাদের ভুবনে স্বাগতম।

মিল্লাত পাবলিকেশন্স

SMILE 2000 DENTAL CLINIC
775, Saat Masjid Road, (Near Sankar Bus Stop)
Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209
Tel : 8117603, 017-542128 (Mobile)
Consulting Hours : 5.00pm - 9.00 pm

Dr. Mohammad Shafi Ullah
MS (Norway), DDS, BDS, MCPS, MADRA (USA)
Dental Specialist (Conservation & Aesthetics)
Ex-Dental Consultant, Badar Al-Samah.Jeddah, KSA.
Assistant professor of Dentistry.

Dr. Nurul Amin
B.D.S. (Dhaka), Ph D. (Japan)
Dental & Maxillofacial Surgeon
Ex-Dental Consultant, A.F. Hospital, K.S.A.
Associate Professor, City Dental College

ক্রিসেন্ট ডেন্টাল ফেয়ার
৪৩, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬২৮২৪৩ (ক্লিনিক) ০১৮৯-২৮৭১৮৬ মোবাইল

www.pathagar.com

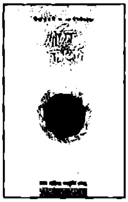

হাদীসে-রাসূলে উপমার প্রয়োগ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীসে রাসূল বা সুন্নাহ। অন্য কথায় আল কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নবুওয়াতী জীবন বা হাদীস ও সুন্নাহ।

হাদীস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, আচরণ বা কাজ এবং সাহাবাদের আচরণ ও কাজের অনুমোদন। আল কুরআনের মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও তা বাস্তবায়নের নির্দেশ সম্বলিত বিষয়ই হচ্ছে হাদীস। হাদীস বা সুন্নাহ আল কুরআনের পরিপূরক।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষা ছিলো বিশুদ্ধ, পরিমার্জিত, সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। নবী করীম (সা) নিজেই বলেছেন– 'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কারণ আমার জন্ম কুরাইশ গোত্রে আর লালিত-পালিত হয়েছি সা'দ ইবনু বকর গোত্রে। তিনি যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতেন। অপরিচিত কঠিন শব্দ পরিহার করতেন। প্রতিটি কথা-ই জ্ঞানগর্ভ। অল্প কথায় অধিক ভাব বুঝাতে সক্ষম। আল জাহিয বলেন– 'রাসূলুল্লাহর কথার বৈশিষ্ট্য হলো, এতে শব্দ হবে কম অর্থ হবে বেশী এবং চমৎকার বাক-শৈলী।' তিনি অনেক সময় উপমা প্রয়োগ করে কথা বলতেন। যেসব উপমার সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্য রয়েছে। আমরা নিচে এরূপ কিছু উপমার উল্লেখ করছি।

তখন আরব সংস্কৃতি ছিলো, কাউকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠালে সে যদি দেখতো শত্রু সৈন্য তাদের আক্রমণ করতে আসছে, তাহলে সে উটের উপর উল্টো দিকে মুখ করে বসতো, তারপর গায়ের জামা খুলে মাথার উপর ঘুরাতে থাকতো আর চিৎকার করতে করতে ফিরে আসতো। লোকজন তার চিৎকার শুনে বুঝতে পারতো বিপদ অত্যাসন্ন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে লেগে যেত। তদ্রূপ পথ ভুলে জাহান্নামের দিকে ধাবমান জাতিকে সতর্ক করার জন্য রাসূলদের আগমন। তাই নবী করীম (সা) তাঁর জাতির সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ ভাষায় কী সুন্দর উপমা দিয়েছেন–

'হে লোক সকল! আমার ও তোমাদের উদাহরণ হলো সেই ভীত সন্ত্রস্ত জাতির ন্যায়,

www.pathagar.com

যাদের উপর শত্রুর আক্রমণ অত্যাসন্ন। পর্যবেক্ষণের জন্য তারা এক ব্যক্তিকে পাঠালো। সে ফিরে এসে জাতিকে শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করতে চাইলো। কিন্তু সে আশংকা করলো, তার সংবাদের আগেই শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে বসবে। তখন সে কাপড় খুলে মাথার উপর তিনবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললো– হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে এসে গেছি।' (মুসনাদ আহমদ ৫/৩৪৮)

নবী রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে– যারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফিরিয়ে আনা। জাহান্নামের শাস্তির পরিবর্তে চিরসুখের জান্নাতের দিকে পথ দেখানো। মানুষের কর্মপদ্ধতি ও রাসূলদের দায়িত্বের কথা বুঝাতে কত সুন্দর একটি উপমার প্রয়োগ করেছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন–

'আমার এবং তোমাদের উপমা সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো। সেই আগুনে পতঙ্গের দল ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো, তখন সে সেগুলোকে তাড়াতে শুরু করলো। তেমনিভাবে আমিও তোমাদেরকে আগুন থেকে রক্ষার জন্য কোমর ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছো সেই দিকে।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৭৫৯)

সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথের উপমা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– 'আল্লাহ তাআলা সরল পথের একটি উপমা দিয়েছেন। একটি রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো দরোজা। প্রত্যেক দরোজায় রয়েছে পর্দা ঝুলানো। রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করছে– হে লোক সকল! তোমরা সোজা রাস্তায় চলো, বাঁকা পথে চলো না। আর রাস্তার উপরে একজন আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে ডাকছে– যারা সেই দরোজার পর্দা উঁচু করে ঢুকতে চাচ্ছে, তাদেরকে বলছে, সাবধান ওটা খুলবে না। যদি খোল তাহলে (আর ঠিক থাকতে পারবে না) সেখানে ঢুকে পড়বে।

এখানে রাস্তা হলো ইসলাম। প্রাচীর হলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা। দরোজাগুলো হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ। রাস্তার মাথা থেকে আহ্বানকারী হলো আল কুরআন এবং রাস্তার উপর থেকে আহ্বানকারী হচ্ছে আল্লাহ-প্রেরিত রাসূলগণ।' (জামি আত-তিরমিযী, হাদীস ২৮৫৯)

হিদায়াত ও জ্ঞান সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

'আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উপমা হচ্ছে সেই বৃষ্টির মত যা এমন ভূমির উপর বর্ষিত হলো যার কিছু অংশ পানি গ্রহণের উপযোগী। ফলে সেখানে অনেক তৃণলতা ও শস্য জন্মালো। আবার ভূমির কিছু অংশ নিচু সেখানে পানি আটকে জলাশয়ের সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তাআলা সেই পানি দিয়ে লোকজনকে উপকৃত করলেন। তারা এ পানি পান করলো, ক্ষেতে সেচ করলো এবং আবাদ কাজে ব্যবহার করলো। আবার ভূমির কিছু অংশ এমন কঠিন, যেখানে পানি গ্রহণ করে না কিংবা পানি জমেও থাকে না, তাই সেখানে কোনো ঘাস জন্মালো না। উপরিউক্ত দুটো উদাহরণ (পানি ধারণ করা ও পানি জমিয়ে রাখা) তাদের বেলায় প্রযোজ্য–যাকে আল্লাহ দীনের

www.pathagar.com

জ্ঞান দান করলেন এবং যে জ্ঞান দিয়ে (আমাকে পাঠানো হয়েছে তা থেকে উপকৃত করলেন। সে নিজে শিখলো এবং অন্যকেও শেখালো।

তৃতীয় উদাহরণটি সেই ব্যক্তির, যে মাথা তুলে সেই জ্ঞানের দিকে তাকালো না এবং আমাকে যে হিদায়াতসহ পাঠানো হয়েছে তা গ্রহণ করলো না।' (সহীহ আল-বুখারী, ইল্‌ম অধ্যায়)

আরেকটি রূপক উপমা দেয়া হয়েছে সম্রাট, বাড়ি, ঘর ও আহ্বায়কের। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলূল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে বললেন– 'আমি স্বপ্নে দেখেছি মাথার কাছে বসা জিবরীল (আ) এবং পায়ের কাছে মিকাঈল (আ)। একজন আরেকজনকে বলেছেন, এই ব্যক্তির একটি উপমা দিন। অপরজন বললেন– শুনুন, ... আপনার ও আপনার উম্মতের উদাহরণ হলো, এক সম্রাট একটি বাড়ি তৈরী করলেন, তারপর সেখানে ঘর উঠালেন, অতঃপর বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় দিয়ে ঘর ভরে রাখলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য একজনকে নিযুক্ত করলেন। একদল সেই আহ্বায়কের দাওয়াতে সাড়া দিল, আরেক দল প্রত্যাখ্যান করলো।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সেই সম্রাট। ইসলাম হচ্ছে সেই বাড়ি। ঘর হচ্ছে জান্নাত আর আহ্বানকারী হচ্ছেন হে মুহাম্মাদ! আপনি। যে আপনার ডাকে সাড়া দিলো সে ইসলামে প্রবেশ করলো, আর যে ইসলামে প্রবেশ করলো সে মূলত জান্নাতে প্রবেশ করলো। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানকার জিনিস ভোগ করবে।' (জামি আত তিরমিযী, হাদীস ২৮৬০)

ইবাদাত, সাওম, দান-সাদকা ও যিকিরের গুরুত্ব বুঝাতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী কিছু উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব উপমা মানুষের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার না করেই পারে না। যেমন :

'... যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক করে তার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তার নির্ভেজাল সোনা কিংবা রূপা দিয়ে একটি দাস কিনলো। তাকে বললো, এ হলো আমার বাড়ি আর এগুলো তোমার কাজ। তুমি কাজ করে আমাকে তার হিসেব বুঝিয়ে দেবে। সে কাজ করতে থাকলো ঠিকই কিন্তু মালিককে হিসেব না বুঝিয়ে সে অন্যকে হিসেব বুঝাতে লাগলো। তোমরা কি কেউ চাও, তোমাদের দাস এরূপ হোক?

... তোমাদের আমি সাওম (রোযা)-এর নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হলো তার মতো যে একটি কাফেলার সাথে রয়েছে। তার কাছে আছে মিশ্‌ক-এর সুগন্ধিভর্তি একটি পাত্র। দলের প্রত্যেকের কাছেই সেই সুগন্ধ ভালো লাগে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশ্‌ক–এর সুগন্ধি অপেক্ষা রোযাদারের মুখের গন্ধ অনেক ভালো।

তোমাদের আমি দান সাদকার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো,

www.pathagar.com

যাকে শত্রুরা বন্দী করে ঘাড় পেচিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলেছে এবং হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বললো আমার যা আছে সবকিছু তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি আমার মুক্তিপণ হিসেবে। এভাবে সে নিজেকে মুক্ত করে নিলো। (সাদকার মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত করে নেয়)।

তোমাদেরকে আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ দিচ্ছি। যিকিরের উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যাকে তার শত্রুরা ধাওয়া করেছে। পরিশেষে সে একটি সুন্দর কেল্লার ভেতর আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করলো। তেমনিভাবে বান্দা আল্লাহর যিকিরের কেল্লা ছাড়া নিজেকে হিফাযত করতে পারে না।' (জামি আত-তিরমিযী, হাদীস ২৮৬৩)

আরেকটি মজার উপমা দেয়া হয়েছে যারা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং যারা কুরআন তিলাওয়াত করে না তাদের, নবী করীম (সা) বলেছেন–

'কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিনের উপমা জাম্বুরা ফলের মত, যার গন্ধও ভালো, খেতেও সুস্বাদু। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ খেজুরের মতো যে খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধ নেই। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে তার উপমা রায়হানা ফলের মতো যার সুগন্ধি ভালো কিন্তু স্বাদ তিতা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়েনা তার উদাহরণ মাকাল ফলের মতো, যার গন্ধ ও স্বাদ উভয়টিই তিক্ত।' (জামি আত-তিরমিযী, হাদীস ২৮৬৫)

বিপদাপদ ও মুমিনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে–

'মুমিনের উদাহরণ শস্যের ছোট চারা গাছের মত বাতাস যাকে নুইয়ে ফেলে। বাতাস কমে গেলেই সে আবার কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে যায়। বিপদাপদ মুমিনকে তদ্রূপ ম্রিয়মান করে দেয় পরে সে আবার উঠে দাঁড়ায়। আর মুনাফিকের উদাহরণ বট গাছের মত, বাতাসে সহজে হেলে না, এক সময় তা সমূলে উৎপাটিত হয়।' (তিরমিযী হাদীস ২৮৬৬)

মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। একজন মুমিনও ভুল করতে পারে। তবে মুমিনের ভুল তাকে ঈমানের গণ্ডির বাইরে ফেলে দিলেও সে সাথে সাথেই আবার ঈমানের দিকে ফিরে আসে। এই কথাগুলোকে কত চমৎকার একটি উপমায় তুলে ধরা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন–

'মুমিন ও তার ঈমানের উপমা সেই ঘোড়ায় ন্যায়, যে সারাদিন ঘুরেফিরে আঁস্তাবলে আশ্রয় নেয়। মুমিনও ভুল করে, তারপর আবার ঈমানের দিকে ফিরে আসে।' (বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ)

আক্ষরিক অর্থে ভালো মানুষ যে শতকরা একজনও পাওয়া মুশকিল সেই কথাটি নবী করীম (সা) কত সুন্দরভাবেই না একটি উদাহরণের সাথে বলেছেন। তিনি বলেছেন–

'মানুষের উদাহরণ যেমন একশ'টি উট, যার মধ্যে আরোহণযোগ্য নেই একটিও।' (জামি আত-তিরমিযী, হাদীস ২৮৭২)

www.pathagar.com

তিনি আবার বলেছেন–

'আমার উম্মাত হচ্ছে বৃষ্টির মত। জানা নেই এর প্রথম ভাগ ভালো, না শেষ ভাগ।' (জামি আত-তিরমিযী, হাদীস ২৮৬৯)

নবী করীম (সা) যে শেষ নবী তারপরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না– এ কথাটিও খুব সুন্দর একটি উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

'আমার এবং আমার আগের নবীদের উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে একটি (সুদর্শন) প্রাসাদ নির্মাণ করলো। কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রাখলো। দর্শনার্থী যে-ই সে প্রাসাদটি দেখছে সেই বলেছে– আহা! প্রাসাদটি কতইনা সুন্দর। তবে আরও বেশী সুন্দর হতো যদি ইটের খালি জায়গাটি না থাকতো। জেনে রেখো (নবুওয়তের প্রাসাদের) আমি সেই ইট (যাকে দিয়ে নবুওয়াতের প্রাসাদ পরিপূর্ণ করা হয়েছে)। (তিরমিযী, হাদীস ২৮৬২; মুসলিম, হাদীস ৫৭৬০)

এরূপ অসংখ্য উপমা হাদীসে রয়েছে যেগুলোকে একত্রিত করতে পারলে অলংকার ও কারুকাজের পুরো চিত্রটিই আমাদের সামনে চলে আসবে। ◆

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর নিয়োগ পরীক্ষা-২০০৩ সালের MCQ পদ্ধতির আলোকে ও ইন্টারনেটের সর্বশেষ তথ্য নিয়ে সংকলিত।

বেসিক ইসলামী ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষা

50 Model Test-2004

• MCQ • লিখিত • ভাইভা

নিয়োগ পাবলিকেশন্স
[এম.এ. ওহাব এন্ড সন্স]
৩৮/৩, (কম্পিউটার কমপ্লেক্স), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন ৭১১১৪৩১, ০১৭১-৫৭১১৪৩, ০১১-০৬১২৬০

www.pathagar.com

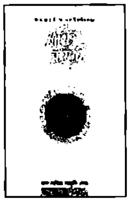

বদর : ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ

ড. আবদুল ওয়াহিদ

ইসলামের ইতিহাসে কোন যুদ্ধের কথা স্মরণ করা হলে সর্বাগ্রে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বদর যুদ্ধের কথাই উত্থাপন করতে হয়। ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার এটাই সর্বপ্রথম যুদ্ধ। কুরআনুল করীমেও এ যুদ্ধের প্রসঙ্গে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এটি হিজরি দ্বিতীয় সনের রমযানুল মুবারকে সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধকে বদরুল কুবরা এবং বদরুল কিতাল বলেও অভিহিত করা হয়। এটাই প্রথম যুদ্ধ যার মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা ও হত্যাকাণ্ডের সুযোগ ঘটে। এ যুদ্ধ তেমন বড় যুদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরিণাম ফলের বিবেচনায় এ যুদ্ধ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

যুদ্ধোপকরণ

ইসলামের ইতিহাসের অগণিত গ্রন্থে বদর যুদ্ধের সমরোপকরণ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা যুদ্ধোপকরণের একটি কারণ এও বিবৃত করেছেন ঃ যে বাণিজ্যিক কাফেলা গাযওয়ায়ে জিল আশীরার সময়ে শামে চলে যায়। তাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে আটক করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক আনসার ও মুহাজিরকে নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু বদর নামক স্থানে পৌছার পর জানলেন যে, কাফেলা চলে গেছে। অবশ্য, কুরাইশদের সেই বাহিনী যারা আবু সুফিয়ানের সাহায্যের জন্যে মক্কা থেকে এসেছিলো তারা অতি নিকটে এসে পড়েছে। এ সময় হুজুর (সা) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ মুহূর্তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াই সময়ের দাবি। কিন্তু, তাবারী যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা প্রকৃত অর্থেই মূল সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তিনি লেখেন যে, এক সময় আসমা বিনতে আবু বকর (রা)এর সন্তান উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের অবস্থা জানতে চান। তার জবাবে উরওয়া (রা) হিজরি দ্বিতীয় সনের রজব মাসে হুজুর (সা) তার ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশকে একটি কাফেলার (যাদের মধ্যে উকাশা ইবনে মুহসিন (রা), উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা), খালিদ ইবনে বুকাঈর (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) আমের ইবনে রাবীয়া (রা), সোহাইল ইবনে বায়জা (রা)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) নেতা নির্বাচিত করে নাখলার দিকে পাঠিয়ে দেন।

কাফেলার সংখ্যা ইবনে সাদ ১১ জন বলেছেন। মাসউদী বলেছেন ৮ জন, আর ইবনে হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বাধীন কাফেলার সংখ্যা ৮ জন বলেছেন। নবী করীম (সা) আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশকে এই বলে একটি চিঠিও দেন যে, মদিনা থেকে চলে যাবার দু'দিন পর যেন পত্রটি খোলা হয়। আব্দুল্লাহ নির্দেশানুযায়ী দু'দিন পর পত্রটি খুলে পড়তে গিয়ে তার মধ্যে লেখা দেখতে পেলেন:

তুমি এ লেখাটি গভীর মনোযোগের সাথে পড়ে তায়েফে ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান নাখলা নামক উপত্যকায় চলে যেয়ো, আর সেখানে কুরাইশদের সব ধরনের কার্যকলাপের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখবে এবং আমাকে খবর দিতে থাকবে। হুজুর (সা)এর এ লেখা পড়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। হঠাৎ সফরের মধ্যেই একটি উট (যার ওপর সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও উতবা ইবনে গাযওয়ান আরোহী ছিলেন) হারিয়ে যায়। এ দু'জন সাহাবীই উটের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। বাকিরা সামনে অগ্রসর হয়ে যান। তাঁরা নাখলায় পৌঁছার পর একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে পেলেন। যে কাফেলার সাথে উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরা, নওফল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরা, হাকাম ইবনে কায়ান এবং আমর ইবনুল হাজরামীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে বাণিজ্যিক কাফেলাটি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের দেখেই আঁতকে ওঠে। কিন্তু পরে উকাশা ইবনে মুহসিনকে চিনতে পেরে বলতে লাগলো: এ তো এখানকারই স্থানীয় বাসিন্দা। হতে পারে, উমরা করার জন্যে যাচ্ছে। সেজন্যে এদের ভয় করার কি বা আছে!

অতএব সে নিজে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্তির ব্যাপারে আশ্বস্ত হবার পর তাদের পশুগুলোকে চরতে ছেড়ে দেয়। এটা ছিলো রজবের শেষ দিন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ভাবলেন, আজ শাবানের প্রথম তারিখ। তাই, তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ বিগ্রহ তো সে সময়ের প্রথানুযায়ী কেবলমাত্র রজব মাসেই নিষিদ্ধ। আর আজ তো শাবানের প্রথম তারিখ। তবে কেন এ দলের ওপর আক্রমণ করা যাবে না? সে জন্যে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং অন্যান্য সাথী একত্রিত হয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল্লাহর

www.pathagar.com

নিক্ষিপ্ত একটি তীর দ্বারা আমর ইবনুল হাজরামী মারা যায়। আর উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ও হাকাম ইবনে কায়ামকে করা হয় বন্দি। ওদিকে, নওল ইবনে আব্দুল্লাহ পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ বন্দিকৃত কয়েদি এবং গনীমতের সম্পদ নিয়ে সঙ্গী সাথীসহ হুজুর (সা) এর খেদমাতে উপস্থিত হলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইরশাদ করলেন, আমি তো তোমাকে শুধুমাত্র কুরাইশদের কার্যকলাপ আর গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্যেই পাঠিয়েছি– যুদ্ধ করার জন্য তো পাঠাইনি।

বাণিজ্যিক কাফেলা এমনিভাবে পরাস্ত হওয়ায়, সম্পদ হাতছাড়া হওয়ায় এবং আমর ইবনুল হাজরামী হত্যা করায় মক্কার কাফেরগোষ্ঠী চরম অসম্মান বোধ করলো। এ ঘটনাকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের চোখে দেখলো যে, মুসলমানরা আমাদের এলাকায় এসে এতোবড় সাহস দেখালো, যে তারা বাণিজ্যিক কাফেলাকে লুণ্ঠন করেছে আর আমরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে! মক্কার কাফেররা পরস্পর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, যেভাবেই হোক তারা আমর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেই। এমনিভাবেই তারা বদর যুদ্ধের যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে বিভোর হয়ে যায়।

ঘটনাবলী

আমর ইবনুল হাজরামীর মৃত্যুর একমাস পর নবী করীম (সা) জানতে পারেন যে, মক্কার কাফেরগোষ্ঠী খুনের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। অতএব তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করলেন এবং সবার মতামত জানলেন। এর পূর্বে কোন গাযওয়া বা সারিয়াতে কোন আনসারকে অন্তর্ভুক্ত করার আবশ্যকতাই ছিলো না। কিন্তু, সেদিন হুজুর (সা) আনসারদেরও ডেকে পাঠালেন। তাদের থেকেও নিলেন পরামর্শ। মুহাজিরদের থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) অগ্নিঝরা বক্তৃতা করেন। তারা তাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু হুজুর (সা) বারংবার আনসারদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। শেষোক্ত সাদ ইবনে মুয়াজ বুঝতে পারলেন যে হুজুর (সা) আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। সাদ ইবনে মুয়াজ অকৃত্রিম সহযোগিতার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। তিনি এও বললেন ঃ আপনি যদি আমাদের সাগরেও ঝাঁপ দিতে নির্দেশ প্রদান করেন তাতেও আমরা পিছপা হবো না। সাদ (রা)এর পর মিকদাদ(রা) বলেন ঃ আমরা মূসা (আ)এর সম্প্রদায়ের মতো নই যে, বলবো, আপনি আর আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন আমরা ঘরেই অবস্থান করবো।

হুজুর (সা) আনসারদের এরূপ সীসাঢালা প্রত্যয় দেখে যারপরনাই খুশি হন। আর তখনই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়।

www.pathagar.com

হুজুর (সা) যে বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা হন তাতে আনসারদের সংখ্যা ছিলো ২৩১। তার মধ্যে ৬১ জনের সম্পর্ক ছিলো আওসের সাথে, আর ১৭০ জনের সম্পর্ক ছিলো খাজরাজের সাথে। ৮৩ জন সাহাবী মুহাজিরদের মধ্য থেকে। মুজাহিদ বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিলো ৩১৪জন। কিন্তু তার মধ্য থেকে ৮ জন সাহাবী (রা)কে হুজুর (সা) অন্যান্য আবশ্যকীয় নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেন। সে জন্যেই তাঁরা যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। যে ৮ জন সাহাবী (রা) এ জিহাদে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জন ছিলেন মুহাজির, আর ৫ জন ছিলেন আনসার। কিন্তু হুজুর (সা) এদের সবাইকে বদরী বলে অভিহিত করেছেন।

এমনিভাবে জিহাদের মাঠে যে মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হন, তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৩০৬ জন। তন্মধ্যে ৮০ জন ছিলেন মুহাজির, ২২৬ জন আনসার। সর্বমোট উটের সংখ্যা ছিলো ৭০টি, ঘোড়া ছিল মাত্র ২টি, ওদিকে, মক্কার কাফেরগোষ্ঠীর জঙ্গী বাহিনীর সংখ্যা ছিলো এক হাজার।

নবী (সা) হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)কে মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তারা রমযান শরীফের ৮ তারিখ মদিনা থেকে গমন করেন। হুজুর (সা)এর মুজাহিদ বাহিনী আকীক, জুল হুলাইপার, জাতুল জায়েশ ও আমীসুল হিমাম হয়ে সীমালাহ গিয়ে পৌছেন। অতঃপর আরকুত তাবিয়্যাহর মধ্য দিয়ে দেহকান উপত্যকায় প্রবেশ করেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সাফরা নামক স্থানে পৌছেন। সেখানে গিয়ে আবারো রাস্তা পাল্টান। এবার ডানদিকে মোড় নিয়ে জাফরান উপত্যকা অতিক্রম করে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। জাফরান উপত্যকা থেকে হুজুর (সা) এবং তাঁর বাহিনী কিছু টিলার উপর দিয়ে এগিয়ে একেবারেই বদরের কাছে পৌছে যান। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য মতে, মুসলিম বাহিনী রমযানুল মুবারকের ১২ তারিখ বদরে পৌছেন।

বদরে পৌছেই সাহাবায়ে কিরাম তাঁবু টানান। ইবনে উমর আনসারী (রা) ও আদী ইবনে আবীর বান আনসারী (রা) উটনীতে আরোহণ করে পানি আনার জন্যে বদর কূপে যান। সেখানে দু'জন মহিলা পানি উঠাচ্ছিল। তারা পরস্পর কথা বলছিলো। তাদের কথাবার্তায় দু'জন আনসারী সাহাবা অনুমান করলেন যে, কাফেলা আগামীকাল বা পরশু এখান দিয়েই পথ অতিক্রম করবে। তারা ফিরে এসে হুজুর (সা)কে জানালেন। তারপর পরামর্শ সভা বসলো যে, প্রথমে বাণিজ্যিক কাফেলাকে আটকানো হবে, না-কি কাফেরদের মুকাবিলা করা হবে। এ প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা অব্যাহত ছিলো। ওদিকে আবু সুফিয়ান, কাফেলাকে কিছু দূর রেখে সরেজমিনে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে বদরে পৌছে। বদরে পৌছেই সে সার্বিক অবস্থা অবগত হয়। তৎক্ষণাৎ

www.pathagar.com

কাফেলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে রাস্তা পরিবর্তন করে অতিদ্রুত অনেক দূর চলে যায়।

রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে হযরত আলী (রা) যুবাইর (রা) এবং সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)কে কাফের বাহিনী সম্পর্কে এবং তাদের গতিবিধি জানার জন্যে বদরের ঝরনার দিকে পাঠান। এসব সাহাবী সেখানে গমন করলেন এবং সেখান থেকে পানি নিতে আসা দু'জনকে ধরে রাসূলের (সা) খেদমতে হাজির করলেন। হুজুর (সা) দু'জনের সাথে কথাবার্তা বলেন। তারা স্বীকার করে যে, আমরা কাফের বাহি-নীর অন্তর্ভুক্ত আছি। কাফের বাহিনী এখন আকানকাল এর টিলার পেছনে অবস্থান করছে।

সে দু'জন থেকে শত্রু বাহিনী সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হবার পর কোন কোন সাহাবী (রা) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, আমরা তো সংখ্যার দিক থেকে কাফেরদের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু হুজুর (সা) সবাইকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর খাবাব ইবনুল মুনাইজির (রা) এর পরামর্শক্রমে হুজুর (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে একটু উঁচু জায়গা ওদওয়াতুদ দুনিয়া-তে চলে যান। ◆

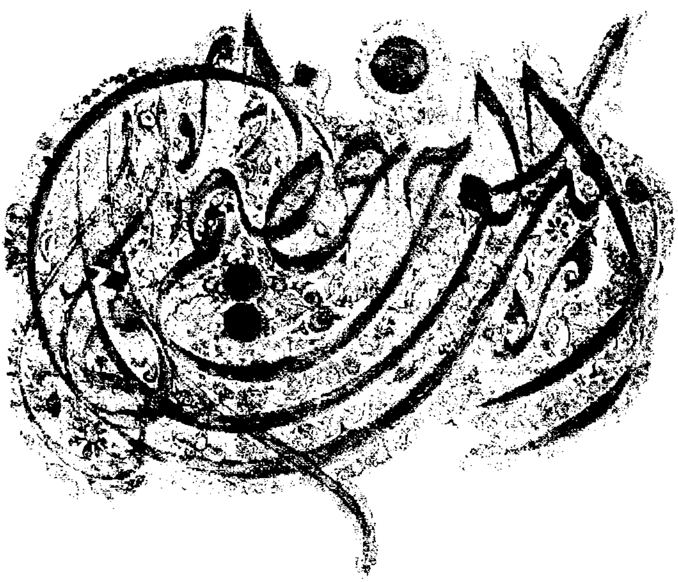

www.pathagar.com

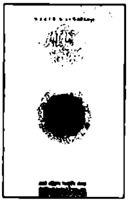

নবী মুহাম্মাদের (সা) ব্যক্তিজীবন ও আমরা

ইবরাহীম বাহারী

হযরত মুহাম্মাদের (সা) জীবন ছিলো পবিত্র কুরআন তথা ইসলামী বিধিবিধানের এক প্রোজ্জ্বল চিত্র। মানুষের সামগ্রিক জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক ও আলোকময় তৌহিদী দিক নির্দেশনা পেতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই মহামানব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল, প্রিয় নবী মুহাম্মাদের (সা) সান্নিধ্যে। তাঁর বর্ণাঢ্য ও আদর্শ জীবন, তাঁর সমগ্র জীবন চরিত তথা সীরাতের বর্ণিল সমুদ্রে অবগাহন করতে হবে। তাঁর ব্যক্তি জীবনের সাথে আমাদের জীবনকে মিলিয়ে নিতে হবে। তাঁর জীবন আদর্শ ও দিক নির্দেশনার আলোকে আমাদের ব্যক্তি জীবনকে সাজাতে হবে।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশাকে (রা) রাসূলের (সা) চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমরা কি কুরআন পড়ো না? কুরআনই তাঁর চরিত্র। অর্থাৎ কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা) তা জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। কুরআন আল্লাহর বাণী। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বাণীর সার্থক বাস্ত বায়নকারী। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহর (সা) সার্থক অনুসরণ ও অনুকরণকারী। এই অনুসরণ ও অনুকরণ নিছক নীতিকথায় সীমাবদ্ধ নয় বরং ব্যবহারিকভাবে যথার্থরূপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত। তিনি ইয়াতিম ছিলেন। দাদা-চাচার সংসারে লালিত পালিত হয়েছেন। তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য বালক বয়সে মেষ চরাতেন। যৌবনে তিনি সমাজের দুর্গত মানুষের কল্যাণে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। তাদের জন্য চিন্তা করতেন, তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর হুকুম পালনে ব্যাপৃত থাকেন। মক্কায় তের বছর এবং মদিনায় দশ বছর তিনি নবুওয়তের জিন্দেগী কাটান। এ সময়ে তিনি নিজ জীবনে কুরআন প্রতিষ্ঠা করে

www.pathagar.com

দেখিয়ে যান। নবুওয়তের পূর্বে চল্লিশ বছর তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করে গেছেন অথচ এই সময়ে দেশবাসী তাঁকে আল আমিন খেতাবে ভূষিত করে তাঁর ব্যক্তি জীবনের আচরণের যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। যাদের মাঝে তিনি চল্লিশটি বছর কাটালেন, তারা তাঁকে সত্যবাদিতার জন্য, তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য আল আমিন বলতো। তাদের বিচার-আচারে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিত। যেমন কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁর সিদ্ধান্তই সবাই মেনে নিয়েছিল। সেদিন এমনটি না হলে, তাদের মধ্যে ভীষণ রাক্তপাত সংঘটিত হত। কুরাইশরা এ চল্লিশ বছর তাঁর মধ্যে মানবিক গুণাবলীর যে ব্যবহারিক আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছিল তার জন্যই তাঁকে আল আমিন হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেকের জীবনে যাতে তিনি ব্যবহারিক আদর্শের নমুনা হতে পারেন সে জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যোগ্য করে তৈরি করেন।

তাঁর জীবনের সকল আচরণ ও ব্যবহার হাদিস গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে নিখুঁতভাবে। মানুষ যেন তাঁর জীবেনর, ঘটনাবলী বিশুদ্ধতার সাথে আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে; শিশু হিসেবে, বালক হিসেবে, কিশোর হিসেবে, যুবক হিসেবে, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসেবে নবুওয়ত পূর্ব সময়ে তিনি যে আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন তা সর্বকালের জন্য কালজয়ী আদর্শ হয়ে আছে। তাই তো তাঁকে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা রাসূলের (সা) মধ্যে রেখে দিয়েছেন মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ।

নবুওয়তউত্তর কালের তাঁর জীবন তো কুরআনে বিধৃত। পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে যা করণীয়– তা তিনি করে দেখিয়ে গেছেন। এ সবই মানুষের জন্য আচরিত আদর্শ। কুরআন ও হাদিস থেকে তা চয়ন করে পালন করা একজন প্রকৃত মুমিনের ঈমানের দাবি। নবজাত শিশুর জন্য ও তার জননীর জন্য কি করণীয়, বিয়ে শাদী কেমন করে করতে হবে, মজলিশের আদব, আগন্তুক ও মেহমানের সঙ্গে আচরণ, পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার, খাওয়া, চলাফেরায় কি আদব হবে এমন কি প্রশ্রাব-পায়খানা, ঘুম-বিশ্রাম পর্যন্ত কিভাবে হবে ইত্যাদি, সব বিষয়ে শিক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যক্তি জীবন থেকে আমরা পাই। একজন মানুষের ছোট বড় যাবতীয় প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (সা)এর জীবন যথাযথ উত্তরের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহারিক আচরণের জন্য তাঁর আদর্শ-ই একমাত্র আদর্শ। সমগ্র বিশ্বের জন্য, সর্বকালের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য যাবতীয় পরিস্থিতির জন্য শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছে– 'তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে উত্তম আদর্শ।' তাঁর সম্পর্কে কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

এইভাবে তাঁর পরিচয় কুরআনে নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা তাঁর কার্যক্রম ইত্যাদি বিষদভাবে কুরআনে বিবৃত হয়েছে, যাতে মানুষ তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে অনুসরণ করতে পারে।

নিখিল বিশ্বে মহানবী (সা) ছাড়া অন্য কোন ঃানুষ আজ পর্যন্ত জন্মলাভ করেনি– যার জীবনের সব কিছুকে অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়। কারণ, মানুষের জীবন এক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। বিভিন্ন পেশায়, রুচিতে, অভিরুচিতে, ভাষা, বর্ণে, গোত্রে ও জীবন যাপনের উপায় উপকরণে মানবজীবন বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। আবার একই পেশার, বর্ণের ও গোত্রের প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এক একজন মানব যেন একটা স্বতন্ত্র জগত। কালের ব্যবধানে সভ্যতার ক্রমবিকাশে এর বিস্তৃতির দিগন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে। এত বিশাল বিস্তৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের জন্য কোন একজন মানব সকলের জন্য সকল সময়ে, সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ আদর্শ হওয়ার চিন্তা করাও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আর এ অচিন্তনীয় ব্যাপারই নবী মুহাম্মাদের (সা) তাঁর জীবনে বাস্তব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজকের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি আনার জন্য আমাদের প্রয়োজন নবী মুহাম্মাদের (সা)এর জীবন বা সীরাতকে অনুসরন করা। তাঁর ৬৩ বছরের জীবনে যা কিছু হয়েছে তাই হচ্ছে সীরাত। হতাশাগ্রস্ত বর্তমান বিশ্ব যদি সেখান থেকে শিক্ষা নিত তবে বর্তমান দুনিয়ায় আবার শান্তি ফিরে আসতো। ◆

www.pathagar.com

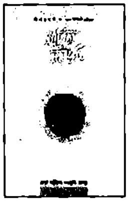

সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

ভালো ব্যবহারও ইবাদাত

হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : তোমরা অপরকে দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত হইও না–এভাবে যে, তোমরা বলবে : অপর লোক ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার করলে আমরাও ভাল কাজ, ভাল ব্যবহার করব, অপর লোক যদি জুলুমের নীতি গ্রহণ করে, তবে আমরাও জুলুম করতে শুরু করব। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এদিক দিয়ে দৃঢ় ও শক্ত করে নাও যে, অপর লোকেরা যদি অনুগ্রহ ও ভাল ব্যবহার করে, তবে তোমরাও তা করবে, আর অপর লোকেরা খারাপ ব্যবহার বা জুলুম করলেও তোমরা জুলুম ও খারাপ কাজ কখনো করবে না। -তিরমিযী

ভালো মানুষের কাজ

সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করা মানুষ হিসাবেই কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা যায় না। দুনিয়ার লোকেরা পারস্পরিক দয়া অনুগ্রহ ও ভাল ব্যবহার করুক আর না-ই করুক, ইনসাফ করুক কিংবা জুলুম করুক, উভয় অবস্থায় ইহ্সান করা, ভাল ব্যবহার করা, লোকদের হক আদায় করা, সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ করা ঈমানদার লোকদের একমাত্র কর্তব্য। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা মন্দের জবাব ভালোর দ্বারা দাও, তাহলে তোমার শত্রুও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে পরিণত হবে।

ভালো মানুষের খুবই অভাব

দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি অভাব হলো ভালো মানুষের। ভালো মানুষ হতে হলে ভালো

www.pathagar.com

কাজ করতে হবে। ভালো কাজ করার জন্য ভালো জ্ঞানের প্রয়োজন। দুনিয়ায় অনেক ডিগ্রি অর্জন করার সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া কুরআন ও রাসূলের (সা) হাদিসসহ বিভিন্ন ইসলামী বই পড়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারলে ভালো মানুষ হওয়া যায়। অন্যথায় হয়তো ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব কিন্তু ভালোমানুষ হওয়া সম্ভব নয় । ভালো মানুষ না হলে সমাজে শুধু নিন্দিত হতে হয়।

মূর্খদের এড়িয়ে চলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশি দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন না। এ কথায় উমার (রা) ক্রোধান্বিত হলেন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তখন (হিস্ন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সা)কে বলেছেন : "ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো" (সূরা আল আরাফ : ১৯৯)। রাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! এ আয়াত শুনে উমার (রা) আর অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ শুনামাত্রই অনুগত হয়ে যেতেন। (বুখারী : ৪২৮১ ও ৬৭৭৬)

ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন

ক্ষমা ও উদারতা মানুষের সবচেয়ে বড় ধরনের কুরবানি। মানুষকে ক্ষমা করতে সকলে পারে না। অধিক রাগের সময় ক্ষমা তো দূরের কথা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন। এ অবস্থায় যদি কেউ ক্ষমা করতে পারে তবে সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যকে ছাড় দেয়া বা উদারতা দেখানো মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভালো কাজের নির্দেশ

ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ। প্রত্যেক মানুষ পরস্পর ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং ভালো কাজের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করবে। একজন খারাপ লোকও যদি ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এক্ষেত্রে দোষের কিছু নেই। কেননা ভালো কাজ করা ও নির্দেশ দেয়া উভয়টিই ফরজ। নির্দেশ দিয়ে সেতো অন্তত একটি ফরজ আদায় করলো। পরবর্তীতে দু'টোই করবে।

হাতের উপযুক্ত ব্যবহার

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ডান হাত ছিল উযু ও

www.pathagar.com

পানাহারের কাজের জন্য এবং বাম হাত ছিল শৌচকার্য ও এ ধরনের নাপাক পরিষ্কারের জন্য।" (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)

সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়ামত

মানুষকে দেয়া সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যাদের ডান হাত আছে বাম হাত নেই, আবার অনেকের বাম হাত আছে কিন্তু ডান হাত নেই। এ ধরনের লোকের কষ্ট যাদের দু'হাত আছে তারা অনুভব করতে পারবে না। হাত না থাকা মানুষের কিংবা যাদের একটি হাত নেই তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে বুঝা যাবে হাতটি আল্লাহর কত বড় নিয়ামত। এ রকম নিয়ামত আল্লাহ আমাদের অনেক দিয়েছেন। এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

ডান হাতের ব্যবহার

দু'টো হাতই আল্লাহর দান। যাদের দু'টো হাত আছে, তারা কি বাম হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করে? তারা কি ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য পরিচালনা করে? অবশ্যই করে না। এটা পরিচ্ছন্ন ও রুচির ব্যাপার। আর এ রুচিটাই হলো রাসূলের (সা) সুন্নাত। ভালো কাজের ব্যাপারে সবসময় আমাদের ডান হাত ব্যবহার করতে হবে। ছোট-বড় সকলের হাতে কোন কিছু দিতে হলে বা কোন কিছু নিতে হলে তা ডান হাতের মাধ্যমেই নিতে ও দিতে হবে। খাবার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমরা ডান হাত ব্যবহার করে তৃপ্তি লাভ করি, তেমনি সকল ভালো কাজের জন্য আমাদেরকে সবসময় ডান হাত ব্যবহার করে রাসূলের (সা) ভালোবাসা অর্জন করতে হবে।

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন

হযরত হারেসুল আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি, সেগুলো এই-- সংঘবদ্ধ জীবন, আদেশ শুনতে প্রস্তুত থাকা ও (নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে লোক সংঘবদ্ধ জীবন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে চলে গেল, সে ইসলামের রজ্জু তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো- যতক্ষণ সে পুনরায় সংঘবদ্ধ জীবনে ফিরে না আসবে। আর যে লোক জাহিলিয়াতের কোন মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।

– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরজ

আলোচ্য হাদিসে ইসলামী জীবনের পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে সংঘবদ্ধ থাকা, সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করা, কেননা এ কাজ আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন। নিয়ম-কানুন মেনে চলার চেষ্টা করা, সংগঠনের নেতার তরফ থেকে যখন যে কাজের নির্দেশ আসে, তা মনোযোগ সহকারে শুনা ও যথাযথভাবে পালন করতে প্রস্তুত থাকা। সকলের মধ্যে এমন মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে সংঘবদ্ধ জীবন যেমন গঠন হতে পারে না, তেমনি সংঘবদ্ধ জীবনের নিহিত কল্যাণ লাভ করাও সম্ভব হয় না। মনে রাখা আবশ্যক, সংঘবদ্ধ জীবনের অর্থ মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে জীবনযাপন করা, আধুনিক কালের উচ্ছৃংখল জীবন নয়।

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করা ফরজ

আলোচ্য হাদীসের সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। একে সকলের শেষে উল্লেখ করার কারণ এই যে, জিহাদ করার জন্য পূর্বোল্লেখিত চারটি কাজ সর্বপ্রথম করা অপরিহার্য। তা না করে জিহাদ করতে চাইলে তা প্রকৃত জিহাদ হবে না, হবে না তা 'আল্লাহর পথে জিহাদ'।

'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা। 'আল্লাহর পথে জিহাদ' ইসলামের বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দীন পূর্ণ মাত্রায় কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করা।

জিহাদকে অন্য অর্থে বুঝার কোন কারণ নেই। জিহাদ মানে মারামারি বা কাটাকাটি নয়। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা করার নামই জিহাদ। ◆

www.pathagar.com

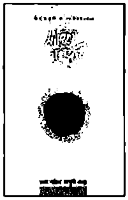

শিশু মুহাম্মাদ (সা)

মোহাম্মদ সফিউদ্দিন

রবিউল আউয়াল মাস। চারদিকে আনন্দের প্লাবন। ভোরের সূর্যের আলোর সঙ্গে অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে এলো এক মানব শিশু। যে শিশুর মুখ দেখে চমকে উঠে তৎকালীন সমাজের স্বার্থবাদীরা। তারা বুঝতে পারেন কুরাইশ বংশের এই শিশু যে সত্যি আলোর ঝলকানি। তা না হলে আজ মক্কার বুকে এতো সুবাস কেন?

ধূ ধূ মরুর চর মক্কার ঘরে ফুটলো এক মনলোভা লাল গোলাপ। সেই ফুলের সুবাসে মেতে ওঠে আকাশ, বাতাস, গাছপালা, তরুলতা। গাছের ডালে ডালে পাখিরা গান গায়। ক্ষণিকের জন্য সমস্ত পৃথিবী থমকে দাঁড়ায়। মক্কাবাসীরা দেখতে পেলো পুণ্যবতী মা আমিনার কোল উজ্জ্বল করে বসে আছেন সেই চিরবাঞ্ছিত আলোক-শিশু মুহাম্মাদ (সা) যিনি ব্যথিত বঞ্চিত মানুষের ধ্যানের ছবি। কুটিল সমাজের ব্যথিত জনের আশ্রয়স্থল হয়েই যেনো আল্লাহর পিয়ারে বান্দা হাজির হয়েছেন।

মুহাম্মাদ (সা) জন্মের আগেই হারিয়েছেন পিতাকে। মায়ের কোলে পিতৃহারা শিশু। আহ কি প্রাণহরা দীপ্তি। কতো নির্মল মাধুরীময় দেখাচ্ছে। তাঁর রূপের কাছে সবকিছুই যেন ম্লান। কে এ শিশু? মা আমিনা শিশু মুহাম্মাদ (সা)-কে বুকে জড়িয়ে নিতেই তার বুক চিরে কান্না বেরিয়ে আসে। কারণ এ সময়ে সারা আরব জাহানেই চলছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মানুষে মানুষে জবরদস্তি। এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর আক্রমণ করছে। কে কার সম্পদ লুটে নেয় তার হিসেব নেই। মায়ের চিন্তা আমার...। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ভাবেন অন্য কিছু।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা জানেন এ শিশুই একদিন পৃথিবীর মানব সমাজ, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য, সৃষ্টিকর্তার আরাধনা বাদ দিয়ে যারা শত্রুতা, হালাল হারাম, ভালো মন্দ বাছবিচার না করে দুনিয়ার মায়াজালে আটকে আছেন তাদেরকে এক আল্লাহর অনুগামী করে সমাজ ও ধর্মে কর্মের পথে এনে শুধু মানুষের কল্যাণকর চির সুন্দর ও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সা) জন্মের আগে থেকেই আরব জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ চলছে। পুরো মক্কা নগরীর মানুষ অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। হালিমা বিবিও খুব গরিব। তাই জীবন ধারণের জন্য মাঠে মাঠে গিয়ে ঘাস সংগ্রহ করে তা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে কোনো রকমে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলেন।

এভাবেই দিন চলছিলো। হালিমা বিবি মনে মনে স্থির করলেন, মক্কা নগরীতে ধাত্রীদের কদর আছে। ওখানে গেলে হয়তো একটি সন্তান লালন পালনের জন্য পাওয়া যাবে। তাতে নিজের সংসারে কিছু আয় বাড়বে। হালিমা বিবি একদিন মক্কা নগরীতে ছুটে এলেন। এ সময় আরবদের মাঝে রেওয়াজ ছিলো শিশুদের ধাত্রীদের কাছেই লালন পালন করতে দেওয়া। তাই হালিমা বিবি সোজা কুরাইশ গোত্র আবদুল মোতালেবের সামনে হাজির হলেন। হালিমা বিবিকে পেয়ে আবদুল মোতালেব মনস্থির করলেন তাঁর শিশু নাতি মুহাম্মাদ (সা)-কে ধাত্রী হালিমা বিবির কোলেই তুলে দিবেন। কিন্তু মা আমিনা কি বলেন? তাই হালিমা বিবি মা আমিনার ঘরে এসে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

তাঁরা যখন কথা বলছেন তখন শিশু মুহাম্মাদ (সা) বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। হালিমা বিবি মনে মনে ভাবলেন আমি যাকে লালন-পালন করবো তাকে একটু দেখে নিই। একথা ভেবেই তিনি ঘুমন্ত শিশুর বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন এবং শিশুকে দেখা মাত্র তাঁর একটি হাত শিশুর কচি শরীরে চলে গেলো আপন গতিতে।

আশ্চর্য হলেও সত্যি; হালিমা বিবি হাত রাখতেই শিশু মুহাম্মাদ (সা) ঘুম ভেঙে জেগে উঠছেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। মন হচ্ছে হালিমা বিবি যেনো তাঁর আপনজন।

হালিমা বিবি মনে মনে খুশি হলেন। মা আমিনা পুত্রের চেহারা ও হালিমা বিবির মনের ভাব বুঝতে পেরে নিজ পুত্রকে আপন বুকে জড়িয়ে নিয়ে আদর সোহাগে ভরে দিলেন। তারপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে পুত্রকে হালিমার কোলে দিয়ে তাঁর ভালোমন্দ সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। শিশু মুহাম্মাদ (সা)-কে পেয়ে হালিমা বিবির বুক যেনো ভরে উঠলো। তিনি কাল বিলম্ব না করে শিশু মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। শোঁ শোঁ বাতাস বয়ে যায় জীর্ণ কুটিরের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে কিছু জমি সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। ওখানে মেষ পাল আর উটের বহর ঘুরে বেড়ায়। শিশু মুহাম্মদ (সা) হালিমা বিবির কুটিরে আসার পর থেকে তাঁর অলস ছেলে মেয়েরা খুশি মনে মেষ পাল চড়াতে মাঠে যায়। তাদের মনে আনন্দ বেড়ে যায়। তাঁরাও দুধ ভাইকে আপন ভাই বলে স্নেহ করতে লাগলো। তাদের মাঝে কে আগে স্নেহ করবে এই নিয়ে লেগে যায় প্রতিযোগিতা। এদিকে ভাইয়ের জন্য তাদের কর্মচঞ্চলতা বেড়ে যায়। তারা কেউ

www.pathagar.com

মেষ নিয়ে মাঠে যায়। কেউ কেউ সবুজ ঘাস কেটে এনে বিক্রি করে সাম৷ বিনিময়ে।

পূর্ব দিগন্তে ভোরের রক্তিম আলো ঝলমল। দুপুর বেলা ভেসে আসে তপ্তময় ঝাঁঝালো বাতাস। বাতাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চকমকে দানাদার বালুকণা। প্রতিদিনই হালিমা বিবির ছেলে মেয়েরা মেষ নিয়ে মাঠে যায়। তাদের সঙ্গে শিশু মুহাম্মাদ (সা)ও যেতে বায়না ধরেন।

অবশেষে হালিমা বিবি একদিন মাঠে যেতে অনুমতি দিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন একে আর ঘরে আটকে রাখা যাবে না। তাই তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে শিশু মুহাম্মাদ (সা)-কে অনুমতি দিলেন।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) প্রকৃতির পাঠশালায় এসে দেখতে পেলেন, আহ কি সুন্দর চারণভূমি! চারণভূমির অদূরেই বিশাল বিশাল পর্বতমালা। পর্বতমালার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশ। তার পাদদেশেই ফুল আর ফলে ভরা সবুজ বাগান। বাগানের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ পানির ধারা। গাছে গাছে বসে থাকা নানা পাখির কণ্ঠে মিষ্টি মধুর সুর। পাখির সুরে ভরে ওঠে প্রাণ। অপূর্ব এক পরিবেশ।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) মেষ চরাতে এসে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যান। শুনতে পান অদৃশ্য কারো বাণী। তাই অসীম চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন তিনি।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) মুক্ত আকাশের নিচে আসলেও তিনি অন্য ছেলে মেয়েদের মতো ছুটোছুটি করেন না। তিনি আকাশ, বাতাস, জীবজন্তু, পাহাড় পর্বত, সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন। তাইতো সবসময় তাঁর মন ভাবগম্ভীর থাকে।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) আপন মনে সৃষ্টির রহস্য দেখছেন। তিনি দেখতে পেলেন বেদুঈনদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। তাদের জীবন প্রকৃতির মতোই গড়ে ওঠে।

মরুর বুকের বেদুঈন জীবনের সঙ্গে থেকে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে তা সঞ্চারিত হচ্ছে। স্বদেশ প্রেম কাকে বলে তা উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন শান্ত, সুসংহত, সংযমী জীবনের বিকল্প নেই।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) তাঁর মিষ্টি কথায় মিষ্টি আচরণ দিয়ে বেদুঈন ছেলেমেয়েদের মনে গেঁথে যান। তাইতো তারা শ্রেষ্ঠ মানবশিশুকে সম্মান দিয়ে করেন মেষ পালকদের দলপতি। শিশু কালের শিক্ষাই মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। শিশু মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা এমন স্থান হতে সংগৃহীত হচ্ছে যার বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার কেউ দেখতে পায়নি। তিনি তিল তিল করে সৃষ্টিকর্তার শিক্ষায় দীক্ষিত হচ্ছেন। আল্লাহ যাকে করবেন জগৎবাসীর পথ প্রদর্শক তাকে তো আর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন না।

একদিন মাঠে গিয়ে শিশু মুহাম্মাদ (সা) হারিয়ে যান। ধাত্রী মা হালিমা বিবি পাগলের ন্যায়

www.pathagar.com

খোঁজাখুঁজি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে; তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

অনেক জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাঁকে পেলেন একটি গাছের নিচে। কিন্তু একি! আমার নয়নের মনি এভাবে গাছের নিচে পড়ে আছে কেন? হালিমা বিবি তাড়াতাড়ি মুহাম্মাদ (সা)-কে কোলে তুলে নিলেন।

হালিমা বিবি অবাক হলেন। তিনি বুঝতে পারছেন আমার মুহাম্মাদ (সা) কেনো সাধারণ মানুষ নয়। একে সবসময় নজরে নজরে রাখতে হবে। মনে মনে বললেন, আমিনা, ওগো আমিনা, তোমার নয়নকে এনে আমি ধন্য।

শিশু মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর আহ্বানে ঘন ঘন সাড়া দিয়ে শুনছেন... কোন সে সুগভীর বাণী...। তাঁর মনে হতো কে যেন বহু দূর থেকে ডাকছেন।

এদিকে স্নেহময়ী গর্ভধারণী মা আমিনা তাঁর শিশু পুত্রকে কাছে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর মনে কতো প্রশ্ন জাগছে, তাঁর আদরের দুলাল মানব কুলের শিরমনি শিশু নবীকে কতদিন দেখেন না।

দিন যায়। মাস যায়। ধাত্রী মা হালিমা বিবির কাছে কেটে গেলো কয়েকটি বছর। শিশু মুহাম্মাদ (সা) বেড়ে উঠছেন তরতর করে। মা হালিমা তাঁকে ছাড়া কিছুই বুঝেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন এ শিশুই একদিন হবে বিশ্ব ভূখণ্ডের জ্যোতিষ্ক। একে জীবনভর রাখতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সময়ের দাবী অনুযায়ী তাঁর গর্ভধারণীর কাছে ফিরিয়ে দিতে হলো।

একদিন মা আমিনা আবার ফিরে পেলেন তাঁর নয়নের মনিকে। কোলে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলেন। মায়ের মনে আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু যিনি আল্লাহর প্রেমের আলোক সম্বল করে এসেছেন তিনি কি শুধু মায়ের কোলে বসে থাকতে পারেন? ◆

www.pathagar.com

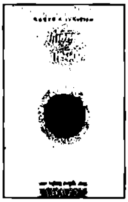

ছোটদের মহানবী (সা)

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

৫৭০ খ্রীঃ ১২ই রবিউল আউয়ালের প্রথম প্রভাতে পূর্ণ চাঁদের মাধুরী দীপ্ত সূর্যের মহিমা নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা) দুনিয়ায় এলেন। আরবে এলো নতুন সূর্য, নতুন চাঁদ, মরুভূমির হাওয়ায় হাওয়ায় প্রতিটি বালুকণায় নিরস খেজুর পাতায় নতুন করে স্পন্দন হতে লাগলো। আবে যমযম উথলে উঠলো, নিখিল বিশ্বের আলোকিত প্রভাতে ধ্বনিত হলো এক মহিমাময় নাম– হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

এই চির সুন্দর চির পবিত্র মহানবীকে (সা) পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'সিরাজুম মুনিরা' উজ্জ্বল চাঁদ, 'সামসুদ দোহা' নবুয়তের সূর্যের মত দীপ্ত, 'মরু ভাস্কর' আর আল্লাহ তাঁকে সমগ্র জাতির জন্য 'রাহ্মাতুল্লিল আলামীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আজ আমরা মহানবীকে (সা) ছোটদের মহানবী (সা) হিসাবে আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। মানবজাতির পথ নির্দেশক বা পথ প্রদর্শক হিসাবে। আর সকল নবী রাসূলের মাঝে প্রিয়নবী ছিলেন সুন্দরতম আদর্শের পরিপূর্ণ ও অনুপম নমুনা।

আল্লাহর রাসূল ছোটদের সকলকেই আপন করে নিয়েছেন। তাই মহানবীকে (সা) ছোট ছোট সোনামণিরাও ভালবাসতো প্রাণ দিয়ে। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় একদিন মহানবী (সা) বাহির থেকে নিজ বাড়িতে এলেন এবং দেখলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) তার সমবয়সী বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলা করছেন। ছোট ছোট বালিকাদের দেখে মহানবী (সা) খুবই খুশি হলেন। মহানবী (সা)-কে দেখে সকলেই দৌড়ে চলে গেলেন। এদৃশ্য দেখে মহানবী (সা) সেখানে দাঁড়ালেন এবং আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, সবাই চলে গেলেন কেন? আয়েশা বললেন, আপনাকে দেখে ওরা চলে গেলেন। আল্লাহর হাবীব বললেন, তাদেরকে ডাকো। আয়েশা তাদেরকে ডাকলেন এবং মহানবী (সা) তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহের সুরে পুনরায় খেলাধুলা করতে বললেন। রাসূলের (সা) কথায় সকলেই মুগ্ধ হলো।

www.pathagar.com

একদিন মহানবী (সা) ঈদের নামায আদায় করে সকলের সাথে কুলাকুলি করে তাদের খোঁজ-খবর নেন। সকল মুসল্লিরা যখন বিদায় নেন তখন মহানবী (সা) লক্ষ্য করলেন, ঈদগাহে একটি ছোট্ট ছেলে বসে বসে কাঁদছে। মহানবী (সা) ছেলেটির কাছে গেলেন এবং কোলে নিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি বললো, আপনার কাছে আমার মনের দুঃখ বলে লাভ নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি ঐ মহানবী (সা) এর জন্য যিনি ইয়াতিমের দুঃখ বুঝবেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা বললে লাভ হবে। আল্লাহর রাসূল (সা) ইয়াতিমের কথা শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকলেন না। দাঁড়ানো থেকে বসে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে বললেন, তুমি যার সাথে দেখা করতে এসেছো, আমিই সেই মক্কার ইয়াতিম মুহাম্মাদ (সা)। সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলো। ছেলেটি হাউমাউ করে কেঁদে বললো, আমার বাবা ইন্তিকাল করেছেন, আমার মা অভাবের তাড়নায় অন্য একটি লোককে বিবাহ করেছে। আমার মা আমাকে আদর করুক ঐ লোকটি তা মোটেই চায় না। আমাকে এবং আমার মাকে মারতো। তাই আমার মা বললেন, বাবারে তোর দুঃখ ইয়াতিম মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। তাই আমি বসে আছি আজকে মহানবীর (সা) এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। মহানবী (সা) ছেলেটির সব কথা শুনে আদর করে বাড়ি নিয়ে হযরত আয়েশাকে বললেন, আয়েশা (রা) দেখ পবিত্র ঈদের দিনে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য একটি ছেলে উপহার দিয়েছেন। মহানবী (সা) এমনি করে অসংখ্য ইয়াতিম অনাথ মিসকিনদেরকে সহায়তা করতেন।

হযরত জায়েদ বিন হারিস (রা) যখন বালক ছিলেন, তখন থেকে জায়েদ মহানবী (সা)-এর স্নেহ মমতায় বড় হতে থাকেন। বেশ কিছুদিন পরে, জায়েদের পিতা ও চাচা তাকে ফিরিয়ে নিতে আসেন। আল্লাহর রাসূল তখন জায়েদেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, জায়েদ তুমি কি এদেরকে চেন? জায়েদ বললেন, হাঁ উনি আমার আব্বা, আর উনি আমার চাচা। রাসূল (সা) বললেন, তোমাকে তোমার আব্বা ও চাচা নিতে এসেছেন, তুমি ইচ্ছে করলে তাদের সাথে যেতে পার, আবার ইচ্ছে করলে থাকতেও পার। তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো। জায়েদের পিতা ও চাচা নগদ অর্থ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জায়েদ আল্লাহর রাসূলের (সা) সান্নিধ্য সাহচার্য পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন না। জায়েদ যখন বললেন, আব্বা ও চাচার কাছে থাকার চেয়ে রাসূলের সঙ্গে থাকা তার পছন্দ। তখন রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন যে, আজ থেকে পরবর্তী কাল পর্যন্ত জায়েদ পরিচিত হবে "জায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ" নামে– অর্থাৎ মুহাম্মাদের (সা) পুত্র।

জায়েদের প্রতি মহানবীর (সা) এর আদর স্নেহের কারণেই তিনি পিতা অভিভাবক ও স্বাধীনতার চেয়ে আল্লাহর রাসূল (সা)-কে অধিক ভালবাসতেন। রাসূলের জীবনব্যাপী জায়েদ অত্যন্ত প্রিয় সঙ্গী হিসাবে তার সঙ্গে থেকেছেন। পরবর্তীতে জায়েদের পুত্রও রাসূলের (সা) স্নেহভাজন হয়েছিলেন। মহানবীর (সা) কন্যা ফাতিমার (রা) দৌহিত্র হাসান

www.pathagar.com

ও হুসাইন ও ইসামাকে আল্লাহর রাসূল (সা) উরুতে বাহুতে কাঁধে নিয়ে খেলা-ধুলা করতেন। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে ভীষণ ভালবাসতেন।

হযরত আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত, দশ বছর বয়সে তার মা রাসূলের (সা) হাতে তুলে দেন রাসূল (সা)কে খেদমতের জন্য। রাসূল (সা) তার আন্তরিকতার প্রশংসা করলেন। আদর ও স্নেহ মায়ামমতা দিয়ে গ্রহণ করলেন। রাসূলের (সা) খেদমতে দশটি বছর কাটালেন। তারপর মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত আনাসের (রা) বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই দীর্ঘ সময়কালে রাসূল (সা) কখনো কোন ধরনের মেজাজ দেখাননি, কোন ধরণের অভিযোগও করেননি।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) যখনই কোন বৈঠকে বসতেন, কিছু সাহাবী তাঁর চার পাশে বসতেন। তাদের মধ্যে একজনের একটি ছোট বালক ছিল। ঐ শিশুটি রাসূলের (সা) কাছে আসতো পেছন দিক থেকে, কিন্তু রাসূল (সা) ছেলেটিকে তার সামনে বসাতেন। শিশুটি মারা গেল এবং তার আব্বা মনের দুঃখে কয়েকদিন রাসূলের (সা) বৈঠকে উপস্থিত হননি। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন কি হয়েছে, লোকটি আসলো না কেন? লোকজন বললো সম্ভবত তার ছোট্ট শিশুটি মারা গেছে এইজন্য লোকটি আসছে না। রাসূল (সা) তার বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর বাচ্চাটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন তার শিশুটির মৃত্যুর খবর জানলেন রাসূল (সা) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, "আমাকে বলুন আপনি কোনটি চান? আপনি কি চান যে, শিশুটি জীবিত থাকুক অথবা আপনার আগে চলে গিয়ে শিশুটি আপনার জন্য বেহেস্তের দরজা খুলুক, আপনি যখন ওখানে পৌছান সে যেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানায়?"

সে বললো ইয়া রাসূল (সা) "আমি এটাই চাই যে, সে প্রথমে জান্নাতে যাক এবং আমার জন্য দরজা খুলুক।" রাসূল (সা) বললেন, আপনার জীবিতকালে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে এবং সে আপনার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করবে। (হাদীস, আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)

একদিন, আরবের এক বীর আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তিতে লড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তার মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কোন লোকই তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। আজ যদি রাসূলের (সা) সাথে কুস্তিতে তাঁকে পরাজিত করতে পারি তবে আমার জীবন ধন্য ও স্বার্থক হবে এবং সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হবো। আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে ব্যক্ত করলেন সে তার অভিপ্রায়। আল্লাহর রাসূল রাজি হয়ে গেলেন এবং তারিখ নির্ধারণ করলেন। রাসূল (সা) কুস্তিতে বিজয়ী হলেন। আবার শুরু হলো আবার বিজয়ী হলেন, তৃতীয়বারেও আল্লাহর রাসূল বিজয় লাভ করলেন তখন ঐ বীর বুঝতে পারলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) সাধারণ কোন মানুষ নন। তিনি আসলেই আল্লাহর রাসূল (সা)। তিনি সাথে সাথেই কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সা) যখনই শিশুকে দেখতেন, তখনই শিশুটিকে সালাম, আদর স্নেহ দিতেন। তাঁর এই শিশুসুলভ আচরণে বহু অভিভাবকরাও রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে আসতেন এবং ঈমান গ্রহণ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। একদিন রাসূল (সা) তাঁর নাতী হাসান (রা)-কে চুমু দিচ্ছিলেন, এই মুহূর্তে অন্য একজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। উনি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন,

"হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনি আপনার নাতিকে চুমু খাচ্ছেন। কিন্তু আমার দশটি ছেলে রয়েছে আমি তো কাউকে চুমু খাই না। রাসূল (সা) উত্তর দিলেন। "যে ব্যক্তি দয়ালু নয়, আল্লাহ যেন তাকে দয়া করেন।" (সহীহ মুসলিম)

আমাদের উচিত, আল্লাহর রাসূল (সা) যেভাবে ছোট্ট শিশুদেরকে আদর করতেন, ভালবাসতেন সেভাবে আমরাও যেন আল্লাহর রাসূল (সা)-এর আদর্শে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটানো। তবেই রাসূললের (সা) এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে রাসূলের (সা) আদর্শ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিন। ◆

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও সাড়া জাগানো ইসলামী বই।

০১। কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
০২। আলকুরআন কথা বলে
০৩। ইসলামের আলোকে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
০৪। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
০৫। ইসলামে নারী বলায় প্রচলিত ভুল
০৬। রাসূল (সা) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
০৭। কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ নূরানী ভান্ডার
০৮। হাদিয়াতুল মুসাল্লিন
০৯। আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০। নবী রাসূলদের অলৌকিক [illegible]
১১। তাফসীরুল কুরআন (সূরা ফাতিহা ও বাকারা)
১২। তাফসীরুল কুরআন (আমপারা) [illegible]
১৩। কুরআন ও হাদীসের আলোকে [illegible]
১৪। প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী [illegible]
১৫। মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬। কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭। আলকুরআনের আলোকে আলোকিত বিশ্বনবী (সা)

www.pathagar.com

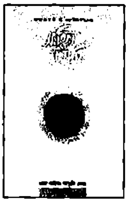

আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা)

জাকারিয়া খান সৌরভ

বছর ঘুরে আবারও এসেছে মাহে রবিউল আউয়াল। এ মাসটি আরবী মাসসমূহের অন্যতম একটি মাস। ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের এ মাসের ১২ তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় পৃথিবীতে তাশরীফ আনেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান যমীনের কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। আবার ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এক দিকে রাসূল (সা)-এর জন্মের কারণে এ মাসটি আনন্দের, অপর দিকে তাঁর ইন্তেকালের কারণে এ মাসটি আবার বেদনারও বটে। বিশ্বের দিকে দিকে মুসলিম জনগোষ্ঠী মাহে রবিউল আউয়াল মাসকে বিভিন্নভাবে উদযাপন করে আসছে। কেউ এ মাসে সিম্পোজিয়াম ও সেমিনার করে রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরছে। কেউ বা আয়োজন করছে সীরাত মাহফিল বা মীলাদ মাহফিলের। কেউ আবার জিকিরের আয়োজন করে রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি প্রকাশের চেষ্টা করছে। আবার কেউ কেউ ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এ মাসটির উদযাপন করছে। বর্তমানে এ মাসে অনুষ্ঠানদি নিয়ে আবার কোন কোন স্থানে বিতর্ক করতেও দেখা যায়। কেউ বলছে সীরাতুন্নবী (সা), আবার কেউ বলছে মীলাদুন্নবী (সা)। এ নিয়ে বিতর্ক আবার কোন কোন স্থানে সংঘর্ষেরও সৃষ্টি করেছে। তাই নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা পেশ করছি।

সীরাতুন্নবী (সা) : সীরাতুন শব্দটি আরবী। এটি আরবী সারা ইয়াসীর শব্দের

www.pathagar.com

ক্রিয়ামূল। যার অর্থ : সুন্নাহ, তারীকাহ, অবস্থা, আকৃতি, রওয়ানা হওয়া, মাহজাব ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় সীরাত বলতে হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর জীবনের সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহসহ তাঁর পুরো জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনাকেই বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফাতহুল কাদির এর বর্ণনা হলো বিশেষ করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও রীতিনীতির বর্ণনাই হলো সীরাত। Dictionary of Islam এ আছে Siyar means a historical work on the life of Mohammad (Sm) or any of his companions.

মীলাদুন্নবী (সা) : মীলাদ শব্দটি আরবী। এটি আরবী বুলিদা থেকে নির্গত। যার অর্থ জন্মবৃত্তান্ত। রাসূল (সা)এর জন্ম সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকে মীলাদ বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে মিলাদের এরচেয়ে বেশি কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মীলাদুন্নবী শব্দটি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যা কেবল রাসূল (সা)এর জন্মকে বুঝায়। আর সীরাতুন্নবী (সা) শব্দটি ব্যাপক, যা রাসূল (সা)এর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত গোটাজীবনকালকে বুঝায়। অতএব মীলাদুন্নবী না বলে সীরাতুন্নবী (সা) বলাই শ্রেয়। কারণ নবী করীমের (সা) বাস্তব জীবনীতেই রয়েছে মানব জাতির জন্য আদর্শ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন "লাক্বাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ" অর্থাৎ রাসূল (সা)এর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (সা) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? পুরো কুরআনই হলো রাসূল (সা)এর চরিত্র। মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে পরিচালনা করবে রাসূল (সা) তার বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন স্বীয় জিন্দিগীতে। একদা রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি কেন পৃথিবীতে আগমন করছেন? তিনি জওয়াবে বলেছিলেন, মানবজাতির চারিত্রক সংশোধন ও পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য। আল্লাহ বলেন, তিনি সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল (সা)কে সত্য দীনসহ এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, এ পৃথিবী থেকে সমস্ত বাতিল মতাদর্শকে উৎখাত করে তিনি একমাত্র দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। রাসূল (সা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে দীর্ঘ তের বছর তাঁর সুমহান আদর্শ দিয়ে মানুষকে দীনের দাওয়াত দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোক তৈরি করেন। এবং পরে তাদেরকে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কাফিরদেরকে পরাজিত করে ইসলামের শ্রেষ্টত্বের প্রমাণ দেন। সে সময় আরব সাম্রাজ্যে নেমে এসেছিল শান্তি, মানুষ ভুলে গিয়েছিল হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, হত্যাসহ তাবৎ পাপ কাজ। সেদিন এমন অবস্থা কায়েম হয়েছিল যে, একটি যুবতী নারী রাতের অন্ধকারে সানআ থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে একা ভ্রমণ করতে পারতো। কেউ তার গতি রোধ করার সাহস করতো না। আজকে মানুষে মানুষে চলছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, খুন-খারাবী, মানুষের জানমালের নেই কোন নিরাপত্তা। তার এক মাত্র কারণ আমরা রাসূল (সা)এর আদর্শ থেকে আজ অনেক দূরে সরেগেছি। রাসূল (সা)এর নাম শুনলে আমরা হাতে মুখে চুমু খাই। মিলাদের আয়োজন করে মিষ্টি খাই। নিজেদেরকে আশেকে রাসূল হিসেবে পরিচয় দেই। অথচ তিনি যে মিশন নিয়ে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা ভুলে যাই। যার কারণে সারা বিশ্বের মুসলমানেরা আজ লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত। সুতরাং শান্তি পেতে হলে রাসূল (সা)এর আদর্শের বিকল্প নেই। তাঁর আনীত জীবনবিধান প্রতিষ্ঠাই মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। অতএব আমাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা ও পোশাক-পরিচ্ছেদসহ সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সা) এর আদর্শের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। ◆

www.pathagar.com

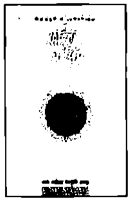

৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী - ২০০৪

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

ইসলামী শিল্পকলার সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যে ভরপুর ইসলামী লিপিকলা বা ক্যালিগ্রাফি ইসলামী স্থাপত্য ও কারুশিল্পেই শুধু নয়, বিশ্ব শিল্পরীতিতেও অসামান্য অবদান রেখেছে। মানুষ বা প্রাণীর চিত্র অঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। সে কারণে মুসলমানদের মূর্তি অঙ্কন বিরোধী কাজে লিপিকলা বিপুল গুরুত্ব লাভ করেছে। লিপিকলার উন্মেষে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আয়াতটি হচেছ ঃ আবৃত্তি করো সেই মহান আল্লাহর নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক অর্থাৎ এক বিন্দু রক্ত থেকে। আবৃত্তি করো তার নামে যিনি পরম দয়ালু যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কলমের ব্যবহার, আর দান করেছেন সেই জ্ঞান, যা ছিল মানুষের অজানা (সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১-৫) লিপিকলায় আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব আরোপ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, সুন্দর হস্তাক্ষর সত্যকে স্বচছ করে তোলে।

মুসলিম শিল্পকলার মধ্যে লিপিকলা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক পরিমার্জিত ও সুষমামন্ডিত। আরবদের পূর্বে প্রাচীন মিশর ব্যাবিলন, চীন ও জাপানে হস্তলিপিশিল্পের উন্মেষ হলেও গতিময়তা লাপিত্য ছন্দ, যুলনিত ভঙ্গি ও ব্যাপকতায় আরবি ও ফার্সী লিপিকলা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রেখাঙ্কন শিল্প এমন এক সম্মোহনী শক্তির অধিকারী ছিল যে রাজা-বাদশাহ যেমন তথাকথিত দাশ বংশের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ এবং মুঘল সম্রাট আওরঙ্গযেব থেকে শুরু করে অতি নগন্য লিপিকার পর্যন্ত সকল স্তরের অনুরাগীদের মোহাচ্ছন্ন করেই রাখত না বরং তাদের মধ্যে লিপি কলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতাও হত। প্রাক ইসলামী যুগের গীতিকাব্য 'মুয়াল্লাকা' সোন-ালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে কাবা ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। একারণে সেগুলোকে বলা হত

www.pathagar.com

Seven Golden Odes. একজন প্রাচীন আরব কবি বলেন, "আমি শিয়াদের নিকট থেকে এমন নির্বোধের মত ফিরছিলাম যে আমার আঁকাবাঁকা পায়ের রেখা বালুতে লাম আলিফ শব্দ সৃষ্টি করেছিল।

লিপিকলা তূলত সাবলীল ছন্দায়িত গীতিধর্মী সৌকর্য ও লাপিত্য প্রকাশকারী সুন্দর হস্ত লিপি। ইসলামে এই লিপিকলার উন্মেষ হয় পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধকরণে। এ কারণে ইসলামী লিপিকলা একটি পবিত্র শিল্পকলা যার প্রতিটি আরবি হরফ খোদা প্রদত্ত এবং আধ্যাত্মিকতায় সমুজ্জ্বল। পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুতের মাধ্যমে এই লিপিশৈলী ব্যাপকতা লাভ করে এবং সমস্ত মদিনা, কুফা, দামেস্ক, বাগদাদ এবং বসরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ লিপিকলার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এ এসঙ্গে আর্থার উপহাম পোপ বলেন, "কুরআন হচ্ছে মুসলমানদের জীবন ধারা এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। সমাজের সর্বশেষ ও অলঙ্ঘনীয় বাণী সম্বলিত ও জীবনের সৎকাজের পাথেয় হিসেবে স্বীকৃত কুরআন স্বভাবত মানুষের চিরন্তন শৈল্পিক চাতুর্যের বিকাশের একটি প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো লিপিকারেরা এমন অসামান্য দক্ষতা জ্ঞান ও ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ব নকশাবলী দ্বারা অলংকৃত করেন যে, সেগুলো আজ পর্যন্ত বিমূর্ত শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বোত্তম কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত।

ইসলামী লিপিকলার উন্মেষ ও বিকাশে বিভিন্ন রীতিশৈলী বা স্টাইলের অবদান রয়েছে। ইসলামী লিপিকলার বুনিয়াদ স্থাপিত হয় আরবি হরফের উপর। আরবি লিপির প্রাচীন রীতি ছিল কুফী যা ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী কুফা থেকে নামকরণ করা হয়েছে। এই নগরী প্রতিষ্ঠার একশত বছর পূর্বে কুফী লিপির প্রথম প্রচলন হয়। প্রাচীনতম আরবি দলিল-দস্তাবেজ শিলালিপি, কুরআন শরীফ ও মুদ্রায় এর ব্যবহার দেখা যায়। এই লিপির প্রচলন ছিল প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী। এই কৌণিক লিপিশৈলীর কৃত্রিমতা, শ্রীহীনতা ও জটিলতা থেকে অব্যহতি লাভের জন্য লিপিকারকগণ সাধারণত সখী নামে পরিচিত হরফত বা স্বরচিহ্ন বিশিষ্ট ও অধিকতর সুস্পষ্ট এক নূতন বক্রাকার লিপির প্রবর্তন করেন। ইবন মাকলা কর্তৃক প্রবর্তীত নাসখ খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বক্রাকার নসখীর উৎকর্ষ সাধিত করেন ইবন যাওয়াব। পরবর্তী যুগে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম লিপিকলার যে সমস্ত রীতির উদ্ভব হয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুলস, মুহাক্কাক, রায়হানী, রিকা, তাউফী, তাউস, তালিক, নাসতালিক, জুলফ-ই-আরস, গুবার, দিওয়ানী গুলযার, লারজা, সিকাস্তা ও তুঘরা। নাস তালিক মুসলিম লিপিকলার সার্বোৎকৃষ্ট শৈলী যা ফার্সী লিপিকারেদের প্রচেষ্টায় এক অসাধারণ সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ রূপ লাভ করে। এই রীতির উৎকর্ষতায়

www.pathagar.com

বিশেষ অবদান রাখেন পারস্যের মীর আলী আল সুলতান ও মীর ইমাদ আল হোসেনী এবং মুঘল ভারতের আব্দুর রহিম খান-ই-খানান। সুলতানী আমলে বাংলায় নির্মিত অসংখ্য মসজিদের শিলালিপিতে তুর্ঘা রীতির ব্যবহার দেখা যায়। অটোমান সুলতানদের স্বাক্ষর ও তুঘরা রীতিতে প্রদত্ত হত। কুণ্ডলাকৃতি নব বধূব চুলের বেনীর সাথে জুলফ-ই-আরুস-এর তুলনা করা হয়েছে। গুবার রীতির নামকরণ হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতি উড়ন্ত বালুকণা থেকে এবং তুরস্কের প্রখ্যাত শিল্পী হাফিজও সমান (মৃত্যু ১৬৯৮) গুবার লিপিশৈলীতে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। এই রীতিতে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হচ্ছেন, কাশিম গুবারী আবদ আল জাওয়াদ এবং ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ ৭৭,৯৩৪ শব্দ বিশিষ্ট পবিত্র কুরআন একটি ডিমের খোলস বা খোসার উপর লিপিবদ্ধ করা হয়।

পাশ্চাত্য শিল্পকলায় ইসলামী লিপিকলার প্রভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্যের আল কাবিক নকশায় কুফী রীতি ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। এর প্রতিফলন দেখা যাবে ইতালী, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের গির্জা ও সমাধির অঙ্গসজ্জায়। এমন কি ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্সের গির্জার সুউচ্চ ফটক কালিমা দ্বারা শোভিত। স্পেনের মার্শিয়ার খ্রিস্টান রাজা ওফ্ফাব স্বর্ণমুদ্রায় কালিমা খোদিত আছে।

ট্রাডিশনাল মুসলিম লিপিকলা চর্চার পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশের সৃজনশীল আধুনিক শিল্পী ডিজাইনরগণ আরবি হরফের কদর বুঝে এবং এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করে বিভিন্ন রীতিতে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন উপকরণে মুসলিম শিল্পকলার চর্চা করেছেন– এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পথিকৃত ছিলেন পাকিস্তানের সাদেকাইন নাকভী (জন্ম ১৯৩০ মৃত্যু ঃ ১৯৮৭)। উত্তর ভারতের এক লিপিকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি মুসলিম লিপিকলার উৎকর্ষ সাধন করে আধুনিক বিমূর্ত রীতিতে কুফী, নাসখ, তুঘরা ও নাসতালিকের চর্চা করেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গোড়ার দিকে ক্যালিগ্রাফি চিত্রকর্ম তেমন প্রাধান্য না পেলেও ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক চিত্রকর্মের ধারায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলাদেশের শিল্পীরা ৭০ দশকের শেষের দিক থেকে লিপিকলা চর্চা করতে থাকেন। এ সমস্ত প্রথিতযশা শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুর্তাজা বশীর, আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, আব্দুস সাত্তার, সবিহ-উল-আলম, রেজাউল করীম, বশীরউল্লাহ, ইব্রাহিম মন্ডল, সাইফুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম আমিন, আরিফুর রহমান, মোঃ শহীদুল্লাহ এফ বারী, মাহবুব মুর্শিদ, মুহম্মদ আব্দুর রহিম, মুবাশ্বির মজুমদার, রফিক উল্লাহ গাজ্জালী, হা-মিম কেফায়েতুল্লাহ, ফেরদৌস আরা আহমদ, মোঃ মনিরুজ্জামান, নিসার উদ্দীন জামিল প্রমুখ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিল্পকলার আন্দোলনের পথিকৃত হিসেবে চিহ্নিত জয়নুল, সুলতান, কামরুল, সফিউদ্দীন, আনওয়ারুল হকের উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় সারিতে স্বীয় শৈল্পিক স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল যে সমস্ত শিল্পী অবস্থান করছেন তারা হচ্ছেন মোঃ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মুর্তাজা বশীর, আব্দুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী ও রশীদ চৌধুরী। এদের মধ্যে বিমুর্ত ছবি ও ক্যালিগ্রাফি রীতিতে ছবি অঙ্কন করে যিনি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন মুর্তাজা বশীর। পূর্বের মত এখানেও ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সপ্তম প্রদর্শনীতে তার ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং দেখা যাবে। মুর্তজা বশীর তার পূর্বের ফিগারেটিভ পেইন্টিং থেকে নিজেকে মুক্ত করে ১৯৭৯ সালে অনেক কষ্টে জ্যোতি বা 'নূর' বা The Light শিরোনামে একটি ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী করে চমক লাগিয়ে দেন। যথার্থ ভাবেই তিনি এর নাম দেন কালেমা তৈয়্যেবা। তিনি এই চিত্রকার্য ধর্মীয় মোটিফ, যেমন জায়নামাজ, তসবি ব্যবহার করেন। এই প্রদর্শনী ছিল রেখা ও রঙ-এর মহামেলা। যাতে একক অথবা যুক্তভাবে আরবি হরফগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলের শিল্পোত্তীর্ণ এ্যাবস্ট্রাকশনে তিনি যে নৈপূণ্য দেখিয়েছেন তা বর্ণনাতীত। প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পী হিসেবে আবু তাহের রঙ ও রেখার ভারসাম্য ও গাণিত্যে তারা বিমূর্ত ধারার ক্যালিগ্রাফিগুলোতে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছেন। গভীর মমত্ববোধ, গীতিময়তা, ছন্দ ও সৌকর্য দিয়ে আরবি হরফের লালনে প্রবীণশিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক শিল্পকলা চর্চায় ক্যালিগ্রাফির জনপ্রিয়তা অর্জনে অন্যান্যদের সাথে আব্দুস সাত্তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি শৈল্পিক স্বকীয়তা বজায় রেখে আরবি ও বাংলা হরফের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাবলীল প্রয়োগে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি কাঠ খোদাই, এক্রিলিক, জল রঙ ও এচিং এর ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে একটি নূতন মাত্রা সংযোগ করেছেন। ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তার শিল্পকর্মে গতানুগতিক বা ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক রীতি ও কৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনের সৃজনশীল শিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে সবিহ-উল- আলমের নাম ভাস্কর হয়ে থাকবে। তার অঙ্কিত আল্লাহর যে ক্যালিগ্রাফি স্কেচ প্রদর্শিত হয়েছে তাতে ত্রি- মাত্রিক ধারা (Three dimensional) লক্ষ্য করা যায়।

ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং-এ সিকাসতা রীতি ব্যবহার করে মীর মুহাম্মদ রেজাউল করীম অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তার শিল্পকর্ম ইলুশেন সৃষ্টি করলেও তার ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো পড়া যায়। ক্যালিগ্রাফি চর্চায় যে বাংলাদেশী শিল্পী অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন তিনি হচ্ছেন সাইফুল ইসলাম। ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি এ ধরনের শিল্প চর্চা করে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন উপস্থাপন করেন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তার ক্যালিগ্রাফির চর্চা একজন নিবোদিতপ্রাণ শিল্পীর সাফল্যকে ইঙ্গিত করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরেক দিকপাল হচ্ছেন ইব্রাহীম মন্ডল। বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া পরপর সাতটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন মোটেও সম্ভব ছিল না। সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে ট্রাডিশনাল রীতিতে নাম নাসখ, সুলস ও সিকাসতার বহুল প্রয়োগে আল্লাহ শব্দটির বাংলা ও আরবি তে ইলুশেণ সৃষ্টি করা যাবে না। নাসখ ও দিওয়ানী রীতির সংমিশ্রণে রঙ ও রেখার অপূর্ব বিন্যাসে শহীদুল্লাহ এফ বারী আরবি শব্দাবলী, বিসমিল্লাহ আর রহমান আর রহিমের ব্যবহারে এক নিবিড় ও অবিশ্বাস্য আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টি করেন। হস্তলিপিশিল্পে রিয়াদ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বারীর শিল্পীজীবন উজ্জ্বল সম্ভাবন-াময়। ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হিসেবে আরিফুর রহমান কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আরবি লিপির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এ ধরনের কাজে চমক থাকলেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডিজিটাল পেইন্টিং-এ আলিফের চমৎকার বিন্যাস আকর্ষণীয় হলেও জল, তেল, এক্রেলিক-এর মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চর্চা অধিকতর সৃজনশীলতার সৃষ্টি করবে। বয়সে নবীন হলেও শিল্পী হিসেবে মুহম্মদ আব্দুর রহিম তার ক্যালিগ্রাফি চর্চায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। তার শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম ব্যাপক। তিনি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত তুঘবারীতির শিলালিপি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এর উৎকর্ষতায় নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রঙ, রেখা, পটপ্রেক্ষিতে আরা বেসক ব্যবহার করে। তিনি তার ক্যালিগ্রাফিতে মোহজালের সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া সিরামিক, মার্বেল, কাঠ ও ধাতুর ব্যবহারে তিনি বহু মসজিদের অলঙ্করনে অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এগুলো তার আধ্যাত্মিক মানসিকতার পরিচায়ক।

আমিনুল ইসলাম আমিন নামে একজন তরুণ নিবেদিতপ্রাণ ক্যালিগ্রাফার তার বলিষ্ঠ রেখা, উজ্জ্বল রঙ ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি দিয়ে আরবি হরফগুলোর অপূর্ব উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি সুরা ফাতেহা, সুরা আলাক ও কালিমাকে অপূর্ব আরবি মেকরে সংমিশ্রণে প্রকাশ করেছেন। যা দর্শকদের সহজেই আকর্ষণ করে। মাহবুব মুর্শিদ জল ও তেল রঙ এর মাধ্যমে ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফির চর্চা করেছেন। শিল্পী খন্দকার মনিরুজ্জামান মার্বেলে কালিমা তৈয়েবা খোদাই করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। রফিক উল্লাহ গাজালী মূলত গ্রাফিক ডিজাইনার হলেও তার সৃজনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার ক্যালিগ্রাফিতে। তিনি-সুলস, নাশতালিক ও তুঘরার সংমিশ্রণে আসমাউল হুসনা বা মহান আল্লাহর পবিত্র নাম বা গুনাবলীর কম্পিউটার বা ডিজিটালের মাধ্যমে কম্পোজিশন করেন। এতে বাণিজ্যিক মনোভাব প্রকাশ পেলেও সত্য সুন্দরের প্রকাশ ঘটিয়ে মোহনীয় রূপ দেখা যায়। নবীন ক্যালিগ্রাফার হিসেবে মুবাশ্বির মজুমদার আরবি অক্ষর আলিফকে কম্পিউটারে বর্ণাঢ্য রঙ ও রেখার মাধুর্যে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। মূলত গ্রাফিক ডিজাইনার হলেও তার তেলরঙ্গ এর কম্পোজিশন বিসমিল্লাহ দর্শকদের আকর্ষণ

www.pathagar.com

করে। ফেরদৌস আরা আহমেদ এক ব্যতিক্রম ধর্মী শিল্পী যিনি দেশীয় রঙ বিশেষকরে মেহদী ব্যবহার করে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন। নকশী কাঁথার পটভূমিতে কালিমা এবং জামদানী ও আরাবের নকশার সমন্বয়ে সূরা ফাতিহা মেহদী রঙে অঙ্কন করে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে মুসলিম লিপিকলার চর্চার এক নতুন জোয়ার লক্ষ্য করা যায়। প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অনুপ্রেরণায় অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের আরবি লিপির উৎকর্ষতায় নিজেদের উৎসর্গ করতে দেখা যায়। এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নিসার উদ্দীন জামিল যার জল রঙে কুফী রীতিতে মসজিদের পটভূমিতে এক ঐন্দ্রজালিক ক্যালিগ্রাফি লক্ষ্য করা যায়। বর্ণাঢ্য রঙ্গের ব্যবহারে শৈল্পিক ভারসাম্য ব্যহৃত হয়নি। অপর যে প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফারের নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন হা-মীম কেফায়েতুল্লাহ। তার নামটিই যেন কুরআনের এক সূরার আয়াত। এই শিল্পী বিমূর্ত রীতিতে আরবি শব্দ আল্লাহকে বিভিন্ন ফর্ম ও রঙে এমনভাবে গোলাকার ভঙ্গিমায় বিন্যাস করেছেন যেন মনে হবে ক্যানভাসে বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। ক্যালিগ্রাফিতে অন্যান্য যে সমস্ত তরুণ শিল্পী অংশ গ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবু দারদা, মোঃ নাঈম, আমিরুল হক, শামিলা কাদের, আবদুল্লাহ ও মুহিউদ্দিন মাসুম বিল্লাহ, ফজলে বারী মামুন, হাসান মোর্শেদ। ক্যানভাস ছাড়াও ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পে ক্যালিগ্রাফি প্রতিফলিত হয়েছে। ভাস্কর রাসা মুহাম্মদ শব্দটির একটি ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যে রূপ দেন। মূল্যবান ক্যালিগ্রাফিতে শামীম সিকদার খ্যাতি অর্জন করেন। এয়ারপোর্ট রোডের একটি দেয়ালে তাঁর এ ধরনের কাজ পথচারীদের আকৃষ্ট করে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের তথা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আধুনিক ক্যালিগ্রাফি চর্চার মূল উৎস পবিত্র কুরআনের বাণী। তুলনামূলক ভাবে বাংলাদেশের আধুনিক ক্যালিগ্রাফির চর্চা গত তিন দশকে উৎকর্ষতার এক উচ্চ মানে পৌছেছে বলা যায়। এ সমস্ত শিল্পকর্মের অবমূল্যায়নের কোন অবকাশ নেই। বরঞ্চ এগুলো ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। ◆

www.pathagar.com

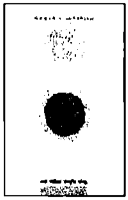

মে ২০০৩ - এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে যে সংগঠনটি তাদের গঠনমূলক কর্মসূচি ও তৎপরতার মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে তার নাম ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এবং কবি আসাদ বিন হাফিজ এর নেতৃত্বে রয়েছে একঝাঁক প্রাণউচ্ছল কর্মীবাহিনী। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন সুধী মহলের জন্য তুলে ধরা হলো।

১। সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারক ২০০৩

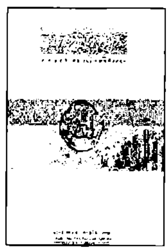

আশির দশকের অন্যতম কবি মোশাররফ হোসেন খান-এর সম্পাদনায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও **"সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারক ২০০৩ "** প্রকাশ করা হয়। মুবাশ্বির মজুমদারের চমৎকার প্রচ্ছদে এ স্মারকে লিখেছেন দেশের খ্যাতিমান কবি-সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ। স্মারকের মূল্য ৫০/= টাকা। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও বিশাল কলেবরের এ স্মারকটি সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল।

২। ৪২ শিল্পীর অংশগ্রহণে ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশের ৪২জন বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিগত ১৪ জুন ২০০৩ শনিবার বিকেল ৫টায় জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক শিল্পী ডঃ আব্দুস সাত্তার এর

www.pathagar.com

প্রধান অতিথি তৎকালীন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব এম শামসুল ইসলাম এর সাথে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব এম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব আহমেদ নজির। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হাবিবা খাতুন। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শিল্পী সবিহ্-উল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী কমিটির আহ্বায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ক্যালিগ্রাফি কমিটির সচিব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

দর্শকদের ভীড়ে কানায় কানায় পূর্ণ হলে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম বলেন, ক্যালিগ্রাফি একটি সুন্দর শিল্প যা আমাদের নবী এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ক্যালিগ্রাফি আত্মার প্রতিচ্ছবি এবং

প্রধান অতিথিকে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ প্রচার প্রসারের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন, শিল্প কর্ম হচ্ছে সৃষ্টিশীল শিল্পীর শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পীর কৃতিত্ব তুরে ধরতে হবে। আজকের প্রদর্শনী আমাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হবে, কারণ এটা আমাদের ধর্ম ও কুরআনের সাথে সম্পর্কিত।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব আহমদ নাজির বলেন, আগামী বাজেটে ক্যালিগ্রাফির উপর একটি বাজেট রাখবো। বিশেষ অতিথি ডঃ হাবিবা খাতুন বলেন, আজকের আয়োজন অভিভূত হওয়ার মত বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে এ শিল্প শান্তির বার্তা বিশেষ। শিল্পী মর্তুজা বশীরসহ ৪২জন শিল্পীর ক্যালিওগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী চলে ১৪জুন থেকে ২৪জুন পর্যন্ত। প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক দর্শক এ প্রদর্শনী উপভোগ করেন। প্রিন্ট এবং মিডিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার পায়।

৩। ৭ দিন ব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা) বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনী

সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭দিন ব্যাপী ১ম সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিগত ১৮জুন বুধবার ২০০৩ বিকেল ৫টায় জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এর সাথে অন্যান্য মেহমানবৃন্দ

ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান জনাব শাহ আব্দুল হান্নান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উপদেষ্টা জনাব ডাঃ রিদওয়ান উল্লাহ শাহিদী, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব মকবুল আহমদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর

www.pathagar.com

ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রন্থ প্রদর্শনী কমিটির আহ্বায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বলেন, সুন্দর ও সুশীল সমাজ বলতে যা বুঝায় আমরা তা পাইনি। তা পেতে হলে আমাদেরকে রাসূল (সা)কে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। কারণ এই উন্নয়নের প্রযুক্তি খারাপ লোকদের হাতে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে রাসূল (সা)কে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। সভাপতির বক্তৃতায় জনাব শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, প্রত্যেকের উচিত নতুন প্রজন্মের কাছে রাসূলের (সা) সীরাত গ্রন্থ পড়তে দেওয়া। এই সীরাত গ্রন্থ স্মরণীকা বের করা এবং যে সমস্ত গ্রন্থ আউট অব প্রিন্টেড তা প্রিন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ বলেন, প্রদর্শনী মানে আত্ম প্রদর্শনী। তিনি আরো বলেন, দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, যুদ্ধে জিততে হলে লিখনীর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে জয় করতে হবে।

আলোচ্য প্রদর্শনী চলে ১৮জুন থেকে ২৪জুন পর্যন্ত । প্রচুর সংখ্যক দর্শক প্রতিদিন এ প্রদর্শনী উপভোগ করেন।

৪। ২য় হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যা

২২জুন ২০০৩ ঢাসাস কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে রাজধানীর একটি হোটেলে ২য় হামদ, না'ত কবিতা সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান।

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান এর সাথে (বাম থেকে) কবি হাসান আলীম, কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি রুহুল আমীন খান ও কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

হামদ না'ত কবিতা সন্ধ্যায় উপস্থিত কবিদের একাংশ

নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কবিতা সন্ধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহমুদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, হামদ-নাত কবিতা সন্ধ্যা ২০০৩ এর আহবায়ক কবি হাসান আলীম। ধন্যবাদ জানান, কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান বলেন, কবি হওয়া সহজ নয়। এই কাজটি যারা করেন, তাদেরকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য তিনি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানান।

কবি আল মাহমুদ বলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ বড় ধরনের পবিরবর্তন এসেছে। কবিতায় ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। নবীর কথা বলা হচ্ছে। রাসূলের ওপর তরুণরা যেভাবে লিখছেন– তাতে আমরা নিঃসন্দেহে আশাবাদী হতে পারি।

কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীর সব ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও রাসূল (সা)কে নিয়ে হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হচ্ছে। সত্যি কথাটি এই যে, বাংলা ভাষার একক যে মানুষটিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কবিতায় স্তর রচনা করা হয়েছে, তিনি আমাদের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা)।

অনুষ্ঠানে ষাট জনেরও বেশি কবি রাসূল (সা) এর শানে কবিতা পড়েন। এদের মধ্যে রয়েছেন, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী, কবি মুশাররফ করিম, কবি রুহুল আমিন খান, কবি আবু সালেহ, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি সাজজাদ হোসাইন খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

www.pathagar.com

৫। কবি গোলাম মোহাম্মদ-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়ার মাহফিল

ইসলামই এদেশের কবি সাহিত্যিকদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কবি গোলাম মোহম্মাদও তার সাহিত্যকর্মে যে মননশীলতার ছাপ রেখে গিয়েছেন তার আশ্রয়স্থলও ছিল পবিত্র ইসলাম। সঙ্গত কারণেই তিনি তার সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তার মহান কারুকাজের সন্ধান করে গেছেন। কবি গোলাম মোহাম্মদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভা ও দোয়ার

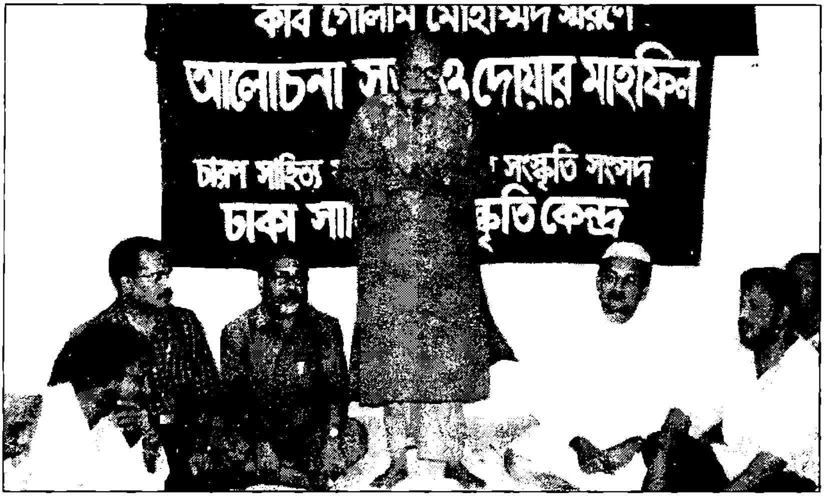

দোয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ আলোচনা রাখছেন

মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে দেশের প্রধানতম কবি আল মাহমুদ উল্লিখিত মত প্রকাশ করেন। বিগত ২১ আগস্ট, ২০০৩ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ও বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গবেষক মোহাম্মাদ আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, কবি সোলায়মান আহসান প্রমুখ। মরহুম কবির জীবন ও সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিকের মূল্যায়ন করে অন্যান্যের মাঝে আলোচনায় অংশ নেন, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি মুকুল চৌধুরী, মহানগর সংস্কৃতি সংসদ সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, চারণ সাহিত্য সংসদ সভাপতি তৌহিদুর রহমান প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় কবি গোলাম মোহাম্মদের পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও সুধী মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

৬। সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা ও ইফতার মাহফিল ২০০৩

ঢাসাস কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিগত ১৯ নভেম্বর রাজধানীর ছায়াসুনিবিড় রমনা রেস্তোঁরায় আয়োজন করা হয় **সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজানের ভূমিকা** বিষয়ক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল। এতে প্রধান মেহমান ছিলেন ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম.পি।

এই প্রথম কোন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভদিক। আশা জাগিয়ানা ঘটনা। তাই ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র পরিবারের সবার মাঝে ছিল উদ্দীপনা কর্মচাঞ্চল্য এবং অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জোর প্রস্তুতি। এই অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক কবি, সাহিত্যিক,

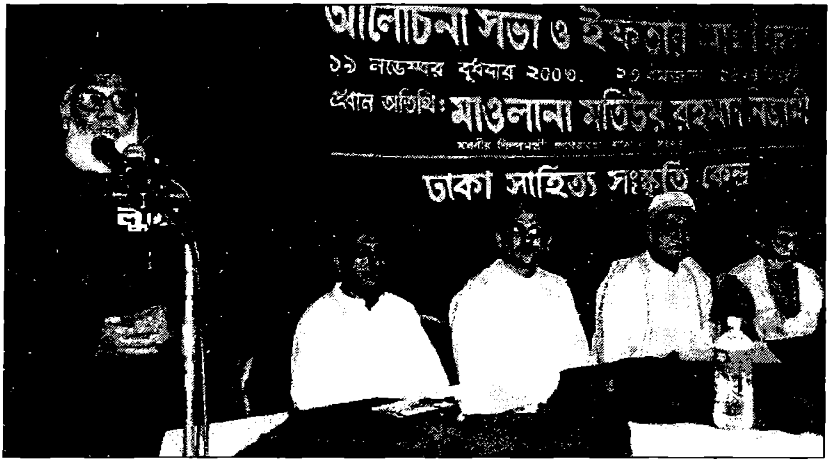

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সাংবাদিক ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরুর কালচার আমাদের এখানে নেই বললেই চলে। কিন্তু কেন্দ্রের অনুষ্ঠান যথাসময়ে বিকেল ৪টায় শুরু হয় প্রখ্যাত ক্বারী আবুল হোসাইন সাহেবের তেলাওয়াতের মাধ্যমে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজের উপস্থাপনায় একে একে আলোচনায় অংশ নেন, কেন্দ্রের সাবেক সভাপতি হাসান আব্দুল কাইউম সেলিম, বাংলা একাডেমির পরিচালক মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ডঃ আব্দুল হক, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ, নগর জামায়াতের সেক্রেটারি জনাব মোঃ রফিকুল

www.pathagar.com

ইসলাম খান, মহানগর আমীর জনাব মমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী, বি এন পি'র তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জনাব রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, বি এন পি স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ড. এ গণি ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ।

প্রধান মেহমান তার ২৫মিনিট এর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় যা বলেছেন, তা সত্যিই অশ্রুত পূর্ব। তিনি বলেন, মানুষের পশুসত্তা ও মানবিক সত্তার মধ্যে, মানবিক সত্তা বা বিবেকই হচ্ছে মূল। তা না হলে পশু ও মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের মানবিক মুল্যবোধের বিকাশ ঘটানো। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নামে এখন যা কিছু হচ্ছে তা মানুষের পশু শক্তিকেই উজ্জীবিত করছে।

শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, সিয়াম মানুষকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অভ্যস্ত করার অহিভিত্তিক বিধান। বিশ্বাসীদের আচার-আচরণ এবং অবিশ্বাসীদের আচরণ কখনই এক হয়না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের দেখা যাচ্ছে

জনাব নিজামী আরো উল্লেখ করেন, সংস্কৃতি তা-ই, যা মানুষ হৃদয় ও মগজে লালন করে থাকে। যদিও বর্তমানে একশ্রেণীর সংস্কৃতি সেবীরা লারেলাপ্পা মার্কা গান বাজনাকেই সংস্কৃতি বলছেন। ইসলামের মত উজ্জ্বল ও উন্নততর সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয় সংস্কৃতিতে প্রলুব্ধ হওয়া খুবই দুঃখজনক।

অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পিনপতন নীরবতায় জনাব নিজামী বলেন, বিশ্বাসী হলে প্রগতির চর্চা বন্ধ হয়ে যায় বলে যারা মনে করেন, তারা ভুল করছেন। প্রধান মেহমানের সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ নিঃসন্দেহে তাদের না পাওয়া, না বুঝা বিষয়ের খোরাক পেয়েছেন। যা তাদেরকে আগামী দিনের পথ চলতে উৎসাহ যোগাবে।

www.pathagar.com

রমনার সুন্দর পরিবেশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই মিলন মেলায় আরো যে সব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, মহামান্য প্রেসিডেন্ট এর প্রেস সেক্রেটারি জনাব আবু জাফর, বিশিষ্ট অভিনেতা কলামিষ্ট জনাব ওবায়দুল হক সরকার, চিত্র নায়ক মিঠুন, আইএফআইসি এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব এম আজিজুল হক, জাসাস সেক্রেটারি বাবুল আহমেদ, বিশিষ্ট কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি আবদুল হাই শিকদার, বাংলাদেশ বেতারের এআরডি জনাব আব্দুল হক, বিশিষ্ট ব্যাংকার সৈয়দ মুহাম্মদ ফারুক হোসেন, কিশোরকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক জনাব আব্দুল্লাহ আল আরিফ প্রমুখ।

এছাড়াও ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্বশীল, টীম সদস্য এবং ইউনিট সভাপতিবৃন্দ এই মনোজ্ঞ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। মূলত এই অনুষ্ঠানটি ছিল কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়িত সফল আয়োজনের মধ্যে অন্যতম। যা ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

৭। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার ৩২বছর পার হলেও আমরা প্রতিনিয়তই হাজারও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে যাচ্ছি। তবে এই ষড়যন্ত্র যতই ব্যাপক হোক না কেন। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ওপার বাংলায় বসে যারা দুই বাংলাকে এক করার দুঃস্বপ্ন দেখছে তাদের সে আশা কোন দিনই সফল হবে না। আমরা ছিলাম আমরা আছি, আমরা চিরকালই স্বাধীন থাকবো। মিটে যাবো না ইনশাআল্লাহ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিগত ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৩ সোমবার হামদর্দ মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মহানগর সংস্কৃতি সংসদ ও পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান উল্লেখিত মন্তব্য করেন।

দেশের অন্যতম কবি আল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত গীতিকার কবি মতিউর রহমান মল্লিক, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি, টিভি ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারি বিশিষ্ট কবি আসাদ বিন হাফিজ এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব মাহবুবুল হক।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সংবাদ পাঠক আবৃত্তিকার মহানগর সংস্কৃতি সংসদ এর সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ-এর সভাপতি কিশোরকণ্ঠের সহ-সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা কবি হিসেবে

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান

বলতে চাই, আমরা সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। দয়া করে আমাদের স্বাধীনতা দান করা হয়নি। তাই পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই ওপারে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে সমাবেশ করে যারা দুই বাংলা একাকার করছে তাদের এই দুরভিসন্ধি বাংলার বীর জনতা কোন দিনই বাস্তবায়িত হতে দেবে না।

আলোচনা পর্ব শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ স্বরচিত কবিতা পাঠ আবৃত্তি এবং সংগীতানুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী নুসরাত জাহান খুলুদ, গোলাম নবী পান্না, মোঃ শরিফুল ইসলাম, আব্দুল লতিফ, এসএম শামীমুল হক, সালাহউদ্দিন সুমন, নুর-ই আউয়াল ও মতিউর রহমান মল্লিক।

আবৃত্তি করেন শিশুশিল্পী আজমীরা আঞ্জুম রাফা। তালহা বিন মুস্তাফা, এহতেশামুল হক ও ছোট্ট মণি সাবাহ।

স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল, কবি আব্দুল কুদ্দুস ফরীদি, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি জাকির আবু জাফর, কবি ওমর বিশ্বাস, কবি মুর্শিদ-উল-আলম, কবি কাজী রহিম শাহরিয়ার, কবি বুলবুল আক্তার, কবি মঈন মুরসালিন, কবি সাইদুর রহমান সাদেকী, কবি হাসান রাউফুন, কবি সিরাজ মোহাম্মদ, কবি শাহ ওয়ালী ফরহাদ, কবি সালাম ফারুক, কবি জিতু রায়হান, কবি সিকদার মুস্তফা, কবি মতিউর রহমান মিয়া, কবি ফাতেমা বিনতে আলী ও কবি মোহম্মাদ আশরাফুল।

কানায় কানায় পূর্ণ মিলনায়তনে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের গান, কবিতায় আর সুর মূর্চ্ছনায় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল অনিন্দ্য সুন্দর।

www.pathagar.com

৮। সুন্দরবনে সাংস্কৃতিক সফর

ঢাসাস কেন্দ্রের অনেক দিনের পরিকল্পনা ছিল সুন্দরবনে যাবার। অবশেষে ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরে সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ কেন্দ্রের অধিকাংশ জনশক্তি স্বপরিবারে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঢাকা

থেকে বাসযোগে খুলনা। খুলনা থেকে পর্যটনের লঞ্চ যোগে কটকা হিরন পয়েন্ট ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করা হয়। ইনসানিয়াত পর্যটন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নিয়ে যায়। ভ্রমণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা জলসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হরিণের খোঁজে জঙ্গলে ঘোরা ইত্যাকার কর্মসূচিতে সবাই মুগ্ধ হয়ে অংশ নেন। সাথে সাথে ডিভিও ক্যামেরার শুটিং চলে। ফেরার পথে মংলা থেকে বাগেরহাট হযরত খানজাহান আলীর (রহ্) মাজার এবং ষাটগম্বুজ মসজিদও দেখা হয়।

মোট কথা সুন্দর বনের এ সফর সবার হৃদয়ে আজীবন মনে রাখার মত অনেক দৃশ্যপট ছবি এঁকে যাবে।

৯। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ শনিবার বিকেল ৪টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ চত্বরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র এক আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট গবেষক জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান

www.pathagar.com

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জনাব রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব আব্দুর রহিম।

বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬নং ওয়ার্ড কমিশনার খন্দকার আব্দুর রব।
প্রধান অতিথি জনাব রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী বলেন, একুশের চেতনায় আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি হরতালের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি বাদ দিয়ে গঠনমূলক ভুমিকার মাধ্যমে দেশ গঠনের আহ্বান জানান।
রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইমেলার পাশাপাশি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র এর এই মহৎ আয়োজন সত্যিই মহান। বিশেষ অতিথি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, ভাষার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হয়েছে, একইভাবে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য আমাদের সম্পদ সর্বোপরি দেশকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সজাগ হতে হবে। তিনি ভাষা শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।
সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, হাজার বছর ধরে এই ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তিনি বলেন প্রতিদিন আমাদের বাংলা লিখতে হবে, আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও মান মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্ত দিতে হবে। তিনি সবাইকে লেখক

www.pathagar.com

ও পাঠক হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারি বিশিষ্ট কবি আসাদ বিন হাফিজ। সবশেষে সাইমুম, মহানগর, অনুপম ও উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।
এছাড়া এক ঝাঁক কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

১০। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

'৭১ এর মার্চের শেষে জাতি সঠিক নেতৃত্ব পায়নি। ফলে জাতি সাময়িকভাবে হলেও বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিধান্বিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে কেউ মুক্তিযোদ্ধা আর কেউ শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছিল। এই বিভাজন ও বিভক্তির জন্য দায়ী ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কারণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এককভাবে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। কোন নির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল না। তারপরও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, পরবর্তীতে আবারও জাতির মধ্যে বিভাজন ঘটিয়েছেন তথাকথিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা দলপতিরা। যে বিভাজনের ধারা রাজনীতি থেকে শুরু করে সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

বিগত ২৩ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত বক্তাবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত বইমেলা মঞ্চে বিকেল ৪টায় এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কবি আল মাহমুদ, সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এর পরিচালক জনাব আহমেদ মূসা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাহবুবুল হক, বিশিষ্ট

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ও কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক জনাব হাসান আব্দুল কাইয়ুম সেলিম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার সংবাদপাঠক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম তাই আপনারা আজ স্বাধীনতা ভোগ করছেন। ইতিহাস বলে, উপমহাদেশের এই এলাকার মাটি স্বাধীনতা চায় বলে আজ আমরা স্বাধীন। তিনি আরো বলেন, যদি কোন জাতির স্বাধীনতা না থাকে তাহলে তাদের কিছুই থাকে না।

বিশেষ অতিথি জনাব আহমেদ মূসা বলেন, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তার বিনিময়ে পেয়েছি ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব মাহবুবুল হক বলেন, জাতিকে বিভাজন না করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। চিত্রনায়ক শেখ আবুল কাশেম মিঠুন বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতদের যুদ্ধ। কবি আসাদ বিন হাফিজ বলেন, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। একটি জাতিকে

সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর-এর নেতৃত্বে মহানগর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা

যদি নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তাহলে সে জাতি আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বলেন, পৃথিবীর দিকে দিকে আজকে স্বাধীনতা হরণের যে ঘৃণ্য তৎপরতা চলছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বকীয় সংস্কৃতি, গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসের চর্চা প্রয়োজন। স্বাগত বক্তব্যে হাসান আব্দুল কাইয়ুম সেলিম বলেন, এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের শপথ নিতে হবে দেশকে আকাশ ও শির্ক সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার। সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বাদ মাগরিব কবিতা পাঠের আসর ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। কবি হাসান আলীম-এর পরিচালনায় কবিতা পাঠে অংশ নেন, কবি আমিন আল আসাদ, কবি আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী, কবি নূর-ই আউয়াল, কবি নাসির হেলাল ও কবি হাসান আলীমসহ

www.pathagar.com

নবীন-প্রবীণ কবিবৃন্দ। কবিতা পাঠ শেষে নাট্যকার আহসান হাবীব খানের উপস্থাপনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে দেশাত্মবোধক গান, কৌতুক, আবৃত্তি, একক অভিনয়, একক ও কোরাস গান পরিবেশিত হয়। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর মোস্তাগীছুর রহমান, সোহেল ও চয়ন, উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠীর আব্দুর রউফ, অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ এর স্বজন জহির ও আব্দুল গনি বিদ্বান এবং মহানগর শিল্পী গোষ্ঠীর শামিমুল হক, আমিনুল ইসলাম, সালাহউদ্দিনও মোঃ শামসুজ্জামান সাংস্কৃতিক পর্বে মজাদার সব বিষয় উপস্থাপন করেন। তাছাড়া কোরাস ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। শত শত দর্শক শ্রোতা সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই পরিবেশনা প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে এই ব্যতিক্রমী সুযোগ করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। কেননা জাতীয় মসজিদ ক্যাম্পাসে এ রকম উন্মুক্ত আয়োজন বিরল। এতে করে মাসাধিককালব্যাপী ইসলামী বই মেলার আয়োজনে ভিন্ন ব্যঞ্জনা ফিরে আসবে।

১১. পহেলা এপ্রিল গ্রানাডা ট্রাজেডি দিবস পালন

১লা এপ্রিল গ্রানাডা ট্রাজেডি দিবস পালন উপলক্ষে বিগত ১লা এপ্রিল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেইট থেকে এক বিশাল শোক র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশে গ্রানাডা ট্রাজেডির ইতিহাস তুলে ধরে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি বিশিষ্ট টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব শিল্পী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। অন্যান্যের মধ্যে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক জনাব মাহবুবুল হক, এ টি এন বাংলা ইসলামী অনুষ্ঠানের পরিচালক জনাব আরকান উল্লাহ হারুনী, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি সাংবাদিক জনাব শাহীন হাসনাত।

জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর তার বক্তব্যে বলেন, ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল ২০০৪ খ্রিস্টানরা যেভাবে মুসলমানদেরকে বোকা বানিয়ে নির্বিচারে হত্যা করেছিল আজও তারা ইহুদি শক্তির সহায়তায় তেমনিভাবে মুসলমানদের হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ রোডম্যাপ ও শান্তি আলোচনার ছদ্মাবরণে বোকা বানানোর অশুভ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, মুসলমানরা যখন শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পদে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তখনই খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। যার নেতৃত্ব দেয় রাজা ফার্ডিনেন্ড ও রানী ইসাবেলা। কিন্তু সামনা-সামনি তাদের মুকাবেলা করতে সাহস এবং শক্তি কোনটাই খ্রিস্টানদের না থাকায় তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয় এবং সমঝোতার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

কেন্দ্রের কর্মী ও শিশুদের বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালির একাংশ

মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায় হাজার হাজার মুসলমান নর-নারী শিশু-কিশোর। যা ছিল বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং ভয়াবহ মানবতা বিরোধী কাজ। তারা আরো বলেন, খ্রিস্টানদের সেই ষড়যন্ত্র এবং নৃশংসতা আজও বন্ধ হয়নি, পটপরিবর্তন হয়েছে মাত্র। বর্তমান বিশ্বের ইহুদি, খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্মিলিত শক্তি মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তারা নানান ছলচাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে।

বক্তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই তিন শক্তির পরিচালিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্ব মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তারা ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ওপর হামলাকে এরই ধারাবাহিকতা বলে উল্লেখ করেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্ব মুসলিম ও মানবতার শত্রু শ্যারন ও বুশের বিরুদ্ধে শ্লোগান সম্বলিত নানান পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার বহন করে। সাথে সাথে গ্রানাডা ট্রাজেডির ইতিহাস নির্ভর হাজার হাজার লিফলেটও বিতরণ করে। ব্যতিক্রমধর্মী এ র‍্যালি নগরবাসীকে নতুন করে ইতিহাস সচেতন করতে উদ্দীপ্ত করবে বলে আশা করি।

www.pathagar.com

১২. বাংলা বর্ষবরণ ১৪১১ এর অনুষ্ঠান

মে মাসে যেহেতু রবিউল আউয়াল, সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি থাকে তাই এবার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান রমনায় না করে 'বাসাস' এর (কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে) করার সিদ্ধান্ত হয়। নির্ধারিত সময় সকালে ১০টায় আগেই অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন কেন্দ্রের সভাপতিসহ অনেকে। ইলিশ খিচুড়ির প্রস্তুতিতে পূর্ব থেকে ব্যস্ত ছিলেন চারণ-এর সভাপতি তৌহিদুর রহমান এর নেতৃত্বে বিল্লাল, আব্দুর রহিম ও শওকত ভাইরা। এরই মধ্যে একে একে কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, আবৃত্তিকার, সংবাদ পাঠক ও সংগঠকদের পদচারণায় ভরে ওঠে 'বাসাস' এর কবি গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তন।

কবি আব্দুর রহিম খান এর তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় কবিতা ও ছড়া পাঠে অংশ নেন কবি হাসান আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী, কবি মাহফুজ চৌধুরী, কবি মুর্শিদ-উল-আলম, কবি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি জাকির আবু জাফর ও কবি আলতাফ হোসাইন রানা।

নজরুল সঙ্গীত, হামদ, দেশাত্মবোধক, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি ও নববর্ষের গান পরিবেশন করেন, শিল্পী মশিউর রাহমান, শিল্পী গোলাম মওলা, শিল্পী নূর-ই-আউয়াল, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, হোসাইন আল জাওয়াদ, শিল্পী মোঃ শহীদুল্লাহ, এইচ এম বরকতুল্লাহ, শিল্পী মো: সালাহউদ্দীন, শিল্পী সাহাবুর রহমান ফারুক, শিল্পী যিয়াদ এবং শিল্পী এস এম শামীমুল হক।

মজার মজার কৌতুক ও চুটকি পরিবেশন করেন মোঃ তৌহিদুর রহমান, ফয়সাল আহমদ, ওমর বিশ্বাস, জাকারিয়া মণ্ডল ও শাহজাহান কবির সাজু। গল্প পাঠে অংশ নেন নিজাম সিদ্দিকী। নাটক পাঠ করেন হাসান আখতার। শ্রুতি নাটিকা– বিবৃতি প্রদান ছাউনি থেকে পাঠ করেন- নাট্যকার আহসান হাবিব খান ও আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন জনাব সিদ্দিক জামাল, জনাব হাসান আব্দুল কাইয়ুম সেলিম, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। বক্তাবৃন্দ পেছনের সকল গ্লানি মুছে নতুন আঙ্গিকে নিজেদেরকে তৈরি করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে বাংলাবর্ষ বরণ উপযাপনের নামে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল ও সংগঠন যে সব অনুষ্ঠান করছে তাতে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটছেনা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং মাসব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা) অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়নে সবাইকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

সবশেষে পরিবেশন করা হয় আকর্ষণীয় ইলিশ খিচুড়ি। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

www.pathagar.com

আয়োজিত বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটি এবারে রমনায় না হলেও এখানে ছিল বোশেখের প্রাণখোলা উল্লাস আর নতুন করে শপথের দীপ্ত উদ্দীপনা।

১৩. ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ ক্লাস

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি আন্দোলনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতিক কেন্দ্র পুরোধা প্রতিষ্ঠান। তরুণদের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে কেন্দ্র নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এতে ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন দিকের উপর ক্লাস নেন শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ্ উল-আলম, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী এবং শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল প্রমুখ।

১৪. ছড়াপত্র

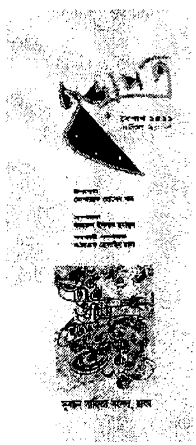

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সুবচন সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ছড়াপত্র'। ২১টি ছড়ার সমন্বয়ে প্রকাশিত ছড়াপত্রটি দারুণ ঝকঝকে এবং পরিচ্ছন্ন। কামরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত ছড়া পত্রটির দাম মাত্র পাঁচ টাকা।

এই ছিল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের গত বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড। এ ছাড়াও নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, নাটক ইত্যাদি লেখালেখি চলছে। কার্টুন, ক্যালিগ্রাফি আঁকা, পত্রিকা প্রকাশ, সাময়িকী সম্পাদনা, প্রকাশনা উৎসব, রেডিও টিভিতে অনুষ্ঠান করা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি কার্যক্রম চলছে নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক। আল্লাহ্ রাব্বুল আলা'মীন আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে কবুল করুন। আমিন।

১৫. ছড়া-কবিতা পাঠের আসর ও প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের 'পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে খ্যাতিমান কবি নূর-ই আউয়াল ও কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদীর কবিতার বই সপত্রয়ী ও নন্দিত সুন্দর এর প্রকাশনা উৎসব ও ছড়া কবিতা পাঠের আসর ১৭ অক্টোবর ২০০৩ শুক্রবার বিকেল ৪টায় ৩৩ তোপখানা রোডস্থ মেহরবা প্লাজার ৫ম তলায় নিউজ ব্যাংক হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের খ্যাতিমান নজরুল-ফররুখ গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথিবৃন্দ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল হক, এডভোকেট এ কে এম বদরোদ্দাজা, নাট্যকার শাহজাহান আলী, এডভোকেট মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট এ জেড এম মহিউদ্দীন, কবি হাসান

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন নজরুল-ফররুখ গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ

আলীম, ছড়াকার মানসুর মুজাম্মিল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার সভাপতি ও কিশোরকণ্ঠ পত্রিকার সহসম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। কবি নূর-ই আউয়াল ও কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাজী রহিম শাহরিয়ার ও হুমায়ুন কবীর সবুজ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন– আমি যতটুকু জানি বর্তমান সময়ে তারা খুব ভালো লিখছেন। আমি তাদের জন্য যারা এ আয়জন করেছে তাদের সাদুবাদ জানাই। কবিতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে যেভাবে নূর ই আউয়াল এনেছেন তা সত্যিকারার্থে প্রশংসার দাবীদার। আর আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী তার কবিতায় দেশপ্রেম,আল্লাহ-রাসূল (স) এর ভালোবাসা, প্রকৃতির ভালোবাসা চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন।

ছড়া-কবিতা পাঠে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে গোলাম নবী পান্না,ফাতিমা বিনতে আলী, নূর-ই-আউয়াল, আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী, সাইফুল্লাহ সাদী, আব্দুল মান্নান সন্দ্বীপী, কামাল হোসাইন, বেলাল হোসাইন, ইব্রাহীম সমির, এস এম কামরুজ্জামান, হাসান আলীম, কাজী রহিম শাহরিয়ার, শরিফ সিরাজী, আমিন আল আসাদ, ওমর আল ফারুকী, এম এ সালাম, মাহফুজা রুমা, লিলি পারভীন, নার্গিস চমন, হাতেমা হাফিজ, নঈম মুরসালিন, ফাতেমা বিনতে আলী, জুলিয়া আবেদীন, জামিল আহমদ, শামসুল করিম খুকুন, জাকির ইবনে সোলাইমান প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৬. ছড়াকার নূরুজ্জামান ফিরোজের 'বোমবাস্টিং' ছড়া গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও ছড়া কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের 'পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার উদ্যোগে খ্যাতিমান ছড়াকার, নূরুজ্জামান ফিরোজের ছড়ার বই 'বোমবাস্টিং' এর প্রকাশনা উৎসব

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব বরকত উল্লাহ বুলু

ও ছড়া কবিতা পাঠের আসর গত ২৭ জুন ২০০৩ শুক্রবার বিকেল ৪টায় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি জনাব বরকত উল্লাহ্ বুলু। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন দেশের প্রখ্যাত কবি আল মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছড়াকার আবু সালেহ, মতিউর রহমান মল্লিক, আবদুল হাই শিকদার, মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর, এ্যাড: এ কে এম বদরুদ্দোজা, আসাদ বিন হাফিজ, মহিউদ্দিন আকবর প্রমূখ। পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ শাখার সভাপতি ও কিশোরকণ্ঠ পত্রিকার সহসম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রকাশনা উৎসবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি হাসান আলীম।

এছাড়াও নবীন প্রবীণ কবি ও ছড়াকারগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরে সন্ধা ৭টায় এক মনোজ্ঞ ছড়া কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। ছড়া পাঠে অংশ নেন, মান-সুর মুজাম্মিল, সাঈদ আহমেদ, আতিক হেলাল, কাজী রহিম শাহরিয়ার, গোলাম নবী পান্না, আরিফ নজরুল প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৭. 'বকুল ফুলের গন্ধে ভরা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ও ছড়া কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত

১৪ আগস্ট ২০০৩, ৩৩ তোপখানা রোডস্থ মেহেরবা প্লাজার ৫ম তলায় নিউজ ব্যাংক হলে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পল্টন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে বিশিষ্ট ছড়াকার আমিন আল আসাদের সম্প্রতি প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ 'বকুল ফুলের গন্ধে ভরা'-এর

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

প্রকাশনা উৎসব ও ছড়া পাঠের আসর মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাসুদ মজুমদার, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, ড. আবদুল ওয়াহিদ ও সুলতানা রিজিয়া। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহিউদ্দিন আকবর, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছড়াকার মানসুর মুজাম্মিল এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ছড়াকার নূরুজ্জামান ফিরোজ ও কাজী রহিম শাহরিয়ার।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন– যারা দেশ, মাটি মাতৃকা ও আদর্শের জন্য লড়াই করে তারা অমর। জাতি তাদেরকে চিরকাল শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। আমিন আল আসাদ সে ধরনের একজন লেখক যার ভেতরটা সব সময় মানুষের জন্য নড়ে ওঠে। প্রধান বক্তা কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, ছড়া যুগ যুগ ধরে মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। ছড়া লিখে খনা যেমন বিখ্যাত হয়ে আছে তেমনি আমাদেরকেও কালজয়ী ছড়া উপহার দিতে হবে।

ঝালছড়া সন্ধ্যায় যারা লেখা পাঠ করেন তাদের মধ্যে গোলাম নবী পান্না, তরিকুল ইসলাম, সালেম সুলেরী, মাসউদুল কাদির, ফয়জুল্লাহ আমান, জালাল উদ্দিন নলুয়া, ফাতিমা বিনতে আলী, নূর-ই-আউয়াল, আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী, কবি লিলি হক, রকীবুল ইসলাম, মোজাম্মেল প্রধান, ওয়াসীম হক, সাইফুল্লাহ সাদী প্রমুখ। ◆

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Bank Investment (Loan) facilities available....

Apartment for Sale at Dhanmondi and Kallyanpur
Well planned & most attractive location

KEARI Manor (Lake Facinq Corner Plot)
At plot # 45, Road # 12/A
Dhanmondi R/A, Dhaka
2850 & 2890 sft.

KEARI Buruj
At Kallyanpur, Dhaka
Size : 805, 1025 & 1135 stf.

Please Contact :

KEARI Limited

Corporate Office :
KEARI Plaza, 83 Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka.
Tel : 8125881, 8156296-7, 8159687, 8158569
0189-207176, 0189-296225, 0189-211456
Fax : 88-02-9135459

Chittagong Office :
KEARI Elysium, Ground Floor, College Road
Tel : 031-624183, E-mail : keari@accesstel.net

www.pathagar.com

কোরআন বুঝার কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোরআন গবেষক
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ-এর
বিরামহীন সাধনার ফসল

কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর তাফসীর

ফী যিলালিল কোরআন (২২ খন্ডে সমাপ্ত)

মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী-এর

তাফসীরে ওসমানী (৭ খন্ডে সমাপ্ত)

আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই-এর

আসান তাফসীর

কোরআনের অভিধান (বাংলা ও ইরেজী)

কোরআনের ইতিহাস, মোজেযা, বিষয়সূচীর সমন্বয়ে রচিত

কোরআনের সাথে পথ চলা

হজ্জ ও ওমরার সুখপাঠ্য সফরনামা

লাব্বায়ক আল্লাহুমা লাব্বায়ক

বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগীতায় প্রথম পুরস্কার বিজয়ী খ্যাতিমান প্রবাসী লেখিকা
খাদিজা আখতার রেজায়ী অনুদিত ও সম্পাদিত

আর রাহীকুল মাখতূম

রসূল (স.) এর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য ছবি 'দি ম্যাসেজ' এর কাহিনীর বাংলা রূপান্তর

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

রসূল (সা.) ব্যক্তি জীবনের এক অমূল্য সংগ্রহ

তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর

একটি ব্যতিক্রমধর্মী দোয়ার বই

শোন শোন ইয়া এলাহী আমার মোনাজাত

আল্লাহ তায়ালার নামে নিবেদিত একগুচ্ছ কবিতা

শুধু তোমাকে চাই

নারী জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচী

মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাইয়েদ ওমর তেলমেসানীর

শহীদ মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব

ইনশাল্লাহ অচিরেই আসছে ঃ

হাজার বছর ধরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তাফসীর ইবনে কাছীর, মণীষীদের কোরআন গবেষণা, তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন ভিত্তিক বই, তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের সূচীপত্র, তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে বর্ণিত ইহুদী জাতির ইতিহাস, মূল আয়াত ও অনুবাদসহ, কোরআনের হালাল হারাম, মূল আয়াত ও অনুবাদ সহ কোরআনের আদেশ নিষেধ, মূল আয়াত ও অনুবাদ সহ কোরআনের ঘটনাবলী, মূল আয়াত ও অনুবাদসহ কোরআনের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি, মূল আয়াত ও অনুবাদসহ আল কোরআন মোমেনদের হেদায়াত ও নিরাময়, মূল আয়াত ও বর্ণিত করিয়া গুনাহ। নাট্য গ্রন্থ জান্নাতের মানচিত্র, গল্পের বই দর্পনে আপন ছায়া। ইসলামী ভাবধারার ওপর নির্মিত বহু অডিও ভিডিও সিডি ভিসিডি। আসছে আমাদের প্রথম নিবেদন; স্বনামধন্য কবি ও গীতিকার মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর আল্লাহ তায়লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানের এ্যালবাম শুধু তোমাকে চাই। এছাড়াও রয়েছে আলা কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টারের নিয়মিত গবেষণা মাসিক আল বাছায়ের। প্রতি মাসেই আমাদের কিছু নতুন সামগ্রী বাজারে আসছে, সর্বশেষ ক্যাটালগের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ-

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বাংলাদেশ সেন্টার

বাংলাদেশ সেন্টার ঃ বাড়ী ১৬, রোড ৭, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা-১২১২ ফোন ঃ ৯৮৯৩৬১৪, ৯৩৩৯৬১৫ ফ্যাক্স ঃ ৯৮৯৩৬১২
প্রধান কার্যালয় ঃ ১১৮ হিউবার্ট গ্রোভ, লন্ডন এস ডব্লিও ৯ ৯ পিডি, ইউ কে ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৭৪১৮
E-mail: info@alquranacademylondon.com. visit our website www.alquranacademylondon.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের কয়েকটি পরিকল্প

পেনশন বীমা

দেন মোহর বীমা

এক কিস্তি বীমা

চার কিস্তি বীমা

শিশু নিরাপত্তা বীমা

তিন কিস্তি বীমা

মেয়াদী বীমা

হজ্জ বীমা

আমাদের ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্প

সার্বজনীন বীমা প্রকল্প

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার

হেড অফিস : ১৩, কারওয়ান বাজার, টি, কে, ভবন (১৪তলা) ঢাকা-১২১৫
ফোন : পিএবিএক্স : ৮১৫০১২৭-৩১, ৮১৩০৬১০, ৮১৩০৬২০, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৩০৬১১

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বিকামালিহী

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনিরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুতকণা-স্ফুলিংগে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিননুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল-ফারুকের-হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

ফর্‌রুখ্ আহ্‌মদ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত